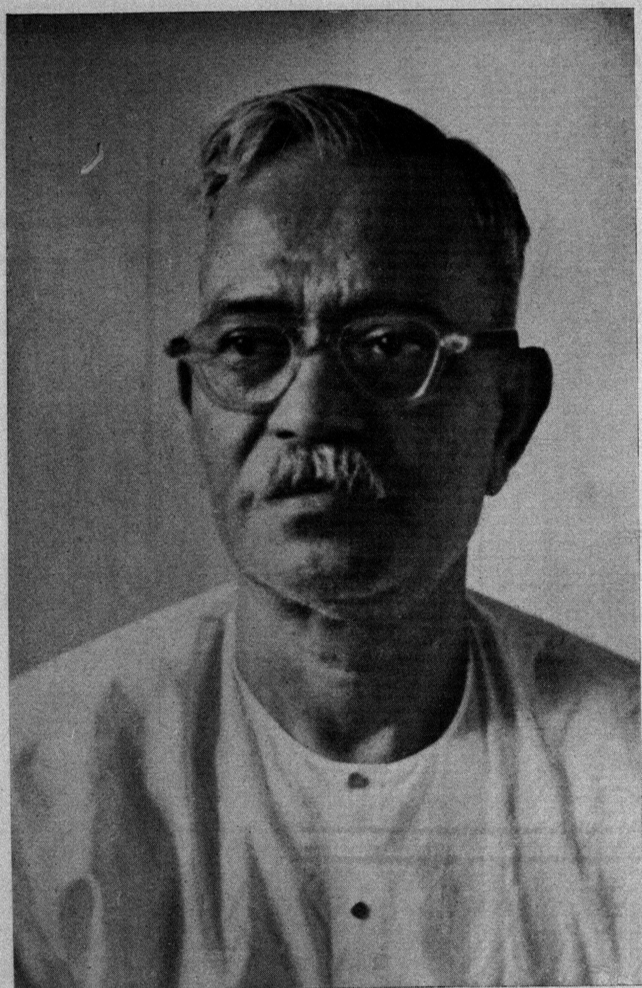


যুগপরিক্রমা

(প্রথম খণ্ড)

শ্রীনরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত
এম, এ, এল্ এল, ডি

ফার্মা, কে, এল, মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-১২

প্রকাশক : সেনগুপ্ত ট্রাষ্ট
২২।২৬, মনোহরপুকুর রোড
কলিকাতা-২৯

শ্রীনরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত
জন্ম ১৮ই বৈশাখ, ১২৯৮

প্রথম সংস্করণ ১৩৬৬।১৯৫৯

মুদ্রক : শ্রীফণিভূষণ রায়
প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন প্রাইভেট লিমিটেড
৫২।৩, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

ভূমিকা

পিতৃদেব শ্রীনরেশ চন্দ্রের কর্মজীবনে যাঁহারা তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রায় কেহই আজ নাই। তাঁহার সহকর্মীরা কেহ নাই, কেহ আছেন; কোথায় কে আছেন তাহা জানিতে পারি নাই। সুতরাং পিতৃদেবের বিস্তৃত কর্মজীবনের একটা সম্বদ্ধ ইতিহাস রচনা দুঃসাধ্য।

নরেশ চন্দ্র বেহিসাবী লোক। কবে তিনি কি করিয়াছেন তার একটা তালিকা প্রস্তুত করার প্রয়োজন বোধ হয় তিনি কখনও করেন নাই। কর্মের প্রবল উত্তেজনা তাঁহাকে সবলে টানিয়া লইয়া গিয়াছে; শুধু যৌবনে নয়, প্রৌঢ় বয়সেও। তাহারই আকর্ষণে তিনি নিয়ত ছুটিয়াছেন, মাতিয়াছেন। এমন লোকের খতিয়ান পঞ্জী লইয়া বসিবার অবকাশ মেলে না।

আজ লোকে জানে নরেশ চন্দ্র ঔপন্যাসিক, ব্যবহার তাঁহার পেশা। আমরা তাঁহার পুত্রকন্যারাও তাঁহাকে সামান্যই জানি। কিন্তু যেটুকু জানি তাহাতে বুঝি যে তাঁহার সাহিত্যচর্চ্চা, তাঁহার পাণ্ডিত্য, তাঁহার সবকিছুর মূলে একটি উচ্ছল প্রাণ যার আগ্রহ কিছুতেই নিবৃত্ত করা যায় না। মানুষ যাহা কিছু করিয়াছে, যাহা কিছু করিতে চায়, তার সবটাই তাঁহার জ্ঞান গোচরে আনিতে হইবে। তিনি বুঝিবেন, সকল কর্মপ্রচেষ্টায় যোগ দিবেন, শ্রম দিয়া, বুদ্ধি দিয়া, বিত্ত দিয়া সার্থক করিয়া তুলিবেন। তিনি নিজে প্রযুক্ত হইবেন, অন্যকে উদ্বুদ্ধ করিবেন, দেশ বিদেশের প্রাচীন ও বর্ত্তমান ইতিহাস ঘাঁটিয়া পথ প্রদর্শন করিবেন, অবরোধ খণ্ডন করিবেন, বিপথের মুখ রুদ্ধ করিবেন।

নরেশ চন্দ্রের লেখায় অলঙ্কার বাহুল্য নাই। প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য যেখানে স্বচ্ছন্দে গড়িয়া উঠিয়াছে সেখানে আছে, নচেৎ সযত্নে ভাষা মাজিয়া-ঘষিয়া সৌখীন পাঠকের মনোরঞ্জন করিবার প্রয়াসের চিহ্ন তাঁহার রচনায় কোথাও নাই। তাঁহার উপন্যাসে আখ্যান বস্তুর প্রাধান্য, প্রবন্ধও বিষয় প্রধান। মানুষকে, সমাজকে, এই কথাগুলি বলা আবশ্যক, এই মুহূর্ত্তেই, অন্তরের এই অনুভূতিই তাঁহাকে আগাইয়া লইয়া

গিয়াছে। সাহিত্যকে তিনি কোনোদিনই শখের সামগ্রী বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। তাঁহার পাণ্ডিত্য কখনও শুষ্কপত্রের স্তূপে পর্য্যবসিত হইতে পারে নাই। সব কিছুর মধ্যেই তিনি এই জীবনের পূর্ণ বিকাশের উপাদান খুঁজিয়াছেন, পাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এ ভূমিকা সমালোচনা নয়। পিতৃদেবের বহুমুখী রচনাবলীর মূল্যনির্ণয় করা আমাদের ক্ষমতার বহির্ভূত। আমরা মনস্থ করিয়াছিলাম ১৮ই বৈশাখ পিতৃদেবের অশীতিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁহার বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিব। সবকটি প্রবন্ধ একত্র করা সম্ভব হয় নাই। যাহা পাইয়াছি তাহা কালানুক্রমিক সাজাইতে গিয়া দেখিয়াছি গত পঞ্চাশ বৎসরে বঙ্গসমাজের যে বিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তার মূল সমস্যাগুলি, যার কিছু নিষ্পন্ন হইয়াছে, কোনোগুলির নিরাকরণ আজও হইয়া উঠে নাই—তার প্রায় সবগুলির সহিতই নরেশ চন্দ্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকিয়াছেন; থাকিয়া তার সমাধানের সুষ্ঠু উপায় নির্ণয়ে সচেষ্ট হইয়াছেন। এই সংকলনের ভিতর শুধু পিতৃদেবের বিচিত্র কর্ম্মময় জীবনের একটা দিক এবং মানব জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টিকোণ আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত হইল তাহাই নহে, বাংলা দেশের একটা যুগের সমাজ-জীবনের নানাদিকের বিবর্ত্তনের একটা চিত্র ফুটিয়া উঠিতেছে।

তাই এই প্রবন্ধ-সংগ্রহ শুধু পারিবারিক উৎসবের উপকরণ-রূপে ব্যবহার না করিয়া বাঙালী পাঠকসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতেছি।

প্রথম খণ্ডে প্রধানতঃ সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইল। ভবিষ্যতে রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্ম ও দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে। পিতৃদেবের ইচ্ছা ছিল পুরাতন প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রণের পূর্ব্বে কিছু পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিবেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাহা সম্ভব হয় নাই।

নির্ম্মল সেনগুপ্ত

সুচীপত্র

॥ আত্মকথা ॥

আপনারা আমার কাছে যে সব কথা জানতে চাচ্ছেন তার যথাযথ উত্তর দিতে গেলে আমাকে প্রায় সত্তর বছরের বিস্তারিত ইতিহাস এবং বর্তমান জগতের ব্যাপক আলোচনা ক'রতে হয়। সেটা সময় সাপেক্ষ। তা ছাড়া আমি স্মৃতিশক্তির প্রখরতার জন্য প্রসিদ্ধ নই। জীবনের অনেক কথাই আমার মনের তলায় এমন ক'রে লুকিয়ে যায় যে তাকে টেনে বের ক'রতে গেলে ডুবুরীর মত পরিশ্রম ক'রতে হয়। আপনাদের কৌতুহল আমি তাই সম্পূর্ণ তৃপ্ত ক'রতে পারবো না।

শৈশবের কথা জানতে চেয়েছেন। আমি যদি একজন মহাপুরুষ হ'তাম তবে শৈশবের ছু'চারটে ঘটনায় বেশ ক'রে রঙ্ চড়িয়ে আমার স্তাবকের দল তা থেকে একটা দৈবাদেশের সূচনা ক'রতে পারতেন।

ধরুন, আমার জন্ম হ'য়েছিল বগুড়ায় মাতুলালয়ে। বাবা তখন মালদহে। আমি তাঁর পঞ্চম সন্তান এবং তৃতীয় পুত্র, তবু আমার জন্মের সময় তিনি সেখান থেকে ছুটী নিয়ে আমাকে দেখতে এলেন। সে আসা আজকের দিনের আসা নয়। তখন মালদহে কিম্বা বগুড়ায় রেল ছিল না। তিনপাহাড়ী ষ্টেশনে এসে রেল ধ'রে ঘুরে ফিরে আসতে হ'ত সুলতানপুর, আধুনিক সান্তাহার। সেখান থেকে দীর্ঘ কয় ঘণ্টায় গরুর গাড়ী ক'রে বগুড়া আসা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তাতে আবার তিনি ট্রেণ ফেল ক'রলেন। অনেক দরবার করে ফার্ষ্ট ক্লাশের ভাড়া দিয়ে একটা মালগাড়ীতে চেপে এলেন। এতখানি যে তিনি পঞ্চম

সন্তানের জন্য ক'রলেন তাতে আমি যে ক্ষণজন্মা সেইটা সূচনা করে। এমন কথা ভক্তেরা বলতে পারতেন।

আর একটা ব্যাপারও একটু ছাঁটিয়ে বাড়িয়ে ফলাও ক'রে বর্ণনা করা যেত। যথা, আমি শৈশবেই বাঘ শীকার ক'রেছিলাম। সম্পূর্ণ অহিংস ভাবে। মালদহ থেকে হাতী চ'ড়ে গৌড়ের জঙ্গলে গিয়েছিলাম বাঘ শীকারে এবং অক্ষত দেহে বাড়ী ফিরে এসেছিলাম। সহজ কথা! শ্রীকৃষ্ণের কালীয়দমনের সামিল।—তখন আমার বয়স বছর খানেক, এবং আমি গিয়েছিলাম হাওদার উপর আমার ভগ্নিপতির কোলে চড়ে এবং বাঘের দেখা পাওয়া যায়নি, এইকটা কথা চেপে গেলেই হত।

কিন্তু আমি মহাপুরুষ নই, ছক্কা পাঞ্জার ধার ধারিনা, নিতান্ত ছুকুড়ি সাতের খেলোয়াড়। তাই আমার শৈশবে এমন বিশেষ কিছুই ঘটেনি যা থেকে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আমার বড় দুই ভাই পর পর আমার পাঁচ বছর হ'তে না হ'তে মারা যান, তারপর আমি রইলাম সবে ধন নীলমণি। তার ওপর আবার বহরমপুর এসে ম্যালেরিয়া ধরলো, পিলে দেখা দিল। এই ব্যারামেই আমার দুই ভাই মারা যান, তাই বাবা মা ভয়ানক ভড়কে গেলেন। কাজেই আমি নিছক আদর আহ্লাদে মানুষ হতে লাগলাম। তার পর মা মারা গেলেন দশ বছর না হতেই। তারপর আর আমার শাসন হবার কোনও সম্ভাবনাই রইলো না। সবাই ভাবতো শুধু ছেলে বাঁচলেই হয়, তাই কোনও ত্রুটি বা দোষ নিয়ে কেউ কিছু ব'লতেন না। আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে যে জীবনে কোনও দিন বাবার কাছে বা মার কাছে মার খাইনি, আর জীবনে গোনা

দুইদিন শুধু বাবার কাছে শক্ত বকুনি খেয়েছি। আর সে বকুনি খেয়েছি সম্পূর্ণ বিনা দোষে।

এ অবস্থায় আহ্লাদে গোপাল হয়ে আমার গোল্লায় যাবারই ষোল আনা সম্ভাবনা ছিল। লেখা পড়ায় যে আমি ভাল হব একথা অনেক দিন পর্য্যন্ত বাবাও বিশ্বাস করতে সাহসী হন নি বরং হবে না কিছু, একথাই অনেকে ব'লতেন।

তাই শৈশবের কোন ঘটনা আমার জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার ক'রেছে তা'বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। মোটের উপর স্রোতের মুখে কুটোর মত ভাসতে ভাসতে আমার জীবন পরিণতি লাভ ক'রেছে আগাগোড়া। তবে দুটো জিনিষ হয়তো আমার জীবন ও চরিত্র গঠনে সহায়তা ক'রেছে। বাবার সঙ্গে আমি বাঙ্গালা বিহারের বহুস্থানে গিয়ে বহুবিধ অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। আর আমার বাবা ছিলেন পরিশ্রমী, ন্যায়নিষ্ঠ ও চরিত্রবান্।

তবু, আমার জীবনের গোড়ার দিকেই মনে কেমন ক'রে যেন গ'ড়ে উঠেছিল নানারকম উদ্ভট উচ্চাকাঙ্ক্ষা। যখন প্রথম শ্রেণীতে পড়ি তখনই আমি জীবনের একটা প্রোগ্রাম লিখে ফেলেছিলাম, লূতাতন্তুর মত স্বপ্নের জাল। সব ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে আমার সেই খাতার মতই কোথায় মিলিয়ে গেছে। সে প্রোগ্রামের মধ্যে ছিল সাহিত্যে শীর্ষস্থান পাবার প্রস্তাব, বিজ্ঞানে চরম উৎকর্ষ লাভ, দেশের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা অর্জন, শিল্পোন্নতি, পৃথিবী ভ্রমণ—ইত্যাদি কত কিছু। শুধু ছিলনা নোবেল প্রাইজ, কেননা তখনও সেটা হয়নি। বেশ মনে আছে, তখনই সঙ্কল্প ছিল, গভর্ণমেণ্টের চাকরী ক'রবো না ও বেশী পয়সা উপার্জন ক'রবো না। এ সবের কোনও কিছুই হয়নি জীবনে। গভর্ণমেণ্টের

চাকরী, শিক্ষকতা হ'লেও, ক'রেছি কিছুদিন। বেশী উপার্জন না করবার সঙ্কল্প বরাবর থাকলেও অর্থ উপার্জনেই জীবনে যা' কিছু সফলতা লাভ ক'রেছি।

তবে ছিন্ন বিচ্ছিন্নভাবে সব কিছুই চেষ্টা ক'রেছি সারা জীবন ভোর ; একটা ছেড়ে আর একটা ধ'রেছি, বেশ খানিকটা সফলতা গোড়ায় গোড়ায় পেয়েছি ব'লে মনে হ'য়েছে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত, আমার চেষ্টায় সফলতা লাভ হয়নি কিছুতেই।

এম এ পরীক্ষার পরই আমার সামনে সমস্যা এলো, অতঃকিম্? বাবা তখন ডেপুটীগিরী থেকে পেনসন নিচ্ছেন। তিনি স্থিরই ক'রেছিলেন আমাকে ডেপুটী ক'রে ছাড়বেন। তখনও ডেপুটীর কাজটা ছিল সম্মান ও অর্থোপার্জনের দিক থেকে ভারতীয়দের পক্ষে প্রায় সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। তা' ছাড়া আমার এক মুরুব্বী আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে বঙ্কিমচন্দ্র, নবীন সেন প্রভৃতি ডেপুটীরাই সাহিত্য সৃষ্টির দিক থেকে সার্থক কাজ ক'রেছিলেন।

আমি কিন্তু একেবারে বেঁকে ব'সলাম, ডেপুটী আমি হব না। প্রশ্ন হ'ল, তবে ক'রবো কি? মনে যেটা ছিল সেটা ব'লতে সাহস হ'ল না। মনে ছিল প্রফেসারী ক'রবো। কিন্তু সেকালে এদেশে থেকে গভর্ণমেণ্ট কলেজে প্রফেসারী ক'রলেই দেড়শো টাকায় আরম্ভ ক'রে শেষ জীবন পর্য্যন্ত রোজগারের সীমা ছিল ৫০০৲ থেকে ৬০০৲। আর প্রাইভেট কলেজে পঁচাত্তরএ আরম্ভ ক'রে দুশো থেকে তিনশো। আমার পক্ষে তাই যথেষ্ট, কিন্তু বুঝলাম, বাবাকে তাতে বোঝান যাবে না। তাই অনেক ভেবে চিন্তে বল্লাম, হাইকোর্টে ওকালতি ক'রবো। মতলব ছিল এই যে ওকালতীতে নাম লিখিয়ে তারপর ক'রবো প্রফেসারী কী

আর কিছু—ক'রবো দেশের কাজ। বাবা অপ্রসন্নচিত্তে হাল ছাড়লেন। হাইকোর্টের উকিলই শেষ পর্য্যন্ত হ'লাম। কিন্তু অদৃষ্টের উপহাস! যেটা একটা লোক দেখান উপলক্ষ ক'রবো ভেবেছিলাম, সেইটাই হ'য়ে দাঁড়াল চরম কথা। এখন আমি উকীলই, তার বেশী বা বাইরে বড় কিছুই নই।

তবে ঠোকর মেরেছি সব নৈবেদ্যেই।

পলিটিক্সে যোগ দেবার জোর ডাক এল আমার, যখন বাঙ্গলা ভাঙবার উদ্যোগ ক'রলেন লর্ড কার্জন। তার আগে আমি পৃথ্বীশ রায় সম্পাদিত Indian Worldএ অনেক প্রবন্ধ লিখতাম। আর তাতে, আশ্চর্য্যের বিষয়. আমার নামটা ছড়িয়ে প'ড়েছিল শুধু ভারতে নয়, বিলেতেও। সেকালে W. T. Stead সম্পাদিত Review of Reviewsএ প্রায় সংখ্যায়ই আমার কোন না কোনও লেখার চুম্বক বের হ'ত। আর সেই লেখার সূত্রেই আমার বোম্বাই, মাদ্রাজ, এলাহাবাদের বহু গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে এবং ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে পরিচয় হ'য়েছিল। এটা আমার সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সাফল্য।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাবার প্রথম উদ্যোগে আমাকে পাঠান হ'ল পূর্ব-বাংলার কতক জায়গায়। কতকগুলো সভা ক'রলাম—আমার কাজে তখনকার নায়ক. আশুতোষ চৌধুরীর (ব্যারিষ্টার পরে জজ) নজর প'ড়ে গেল। তারপর থেকে স্রোতে ভেসে চ'ললাম। "বেঙ্গলী" কাগজে চিঠির পর চিঠি লিখতে লাগলাম। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রভৃতির উৎসাহ পেলাম। ছাত্র নেতা ব'লে লোকে মানতো আমায়। তারপয় বের হ'ল Risley-circular তাতে ছাত্রদের পলিটিক্সে যোগদান করা বন্ধ করবার চেষ্টা হ'য়েছিল।

ছাত্রেরা তখন সারা বাঙলাময় হৈ হৈ ক'রে আন্দোলন চালাচ্ছে। গোলদীঘিতে ও পান্তীর মাঠে প্রায় রোজ মিটিং হ'চ্ছে, তাতে প্রধানতঃ ছিল ছাত্রেরা, আর উৎসাহদাতা ছিলেন বহু নায়ক। Risley Circular বের হবার পর একদিন গোলদীঘির এক সভায় ৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একটা পথ দেখালেন, Anti-Circular-Society নামে একটা ছাত্র প্রতিষ্ঠান ক'রে আন্দোলন চালাবার। হ'ল সে সোসাইটি, তাতে আমাকে করা হ'ল সভাপতি। একরকম ঠেলে ঠুলে আমাকে এই সম্মান দেওয়া হ'ল।

Anti-Circular-Society বঙ্গভঙ্গ ও বয়কট আন্দোলনে যে সুমহৎ অংশ গ্রহণ করেছিল তার জন্য সেকালে সবাই অকুণ্ঠিত ভাবে তার সুখ্যাতি ক'রেছেন, তার সভাপতি হিসেবে আমি বহুস্থানে এক আধটুকু সম্মান পেয়েছিলাম। কিন্তু সে কাজ আমি করিনি, ক'রেছিলেন ৺শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু ও তাঁর সহচরেরা। তার জন্য আমি এক ফোঁটা বাহাদুরীও দাবী ক'রতে পারি না।

তখন আমি ছিলাম গভর্ণমেণ্ট রিসার্চ্চ স্কলার। প্রেসিডেন্সি কলেজের সে সময়কার থার্ড ইয়ারের ছাত্রদের উদ্যোগে একখানা Students Magazine বেরিয়েছিল। তার উদ্যোগীদের মধ্যে অনেকে পরকালে নাম ক'রেছেন, যথা ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ভূতপূর্ব জজ যোগেন্দ্র মজুমদার, অবিনাশ মজুমদার, কো-অপারেটিভ কর্মী ৺সুকুমার চ্যাটার্জী প্রভৃতি। আমি অনুরুদ্ধ হ'য়ে তাতে এক প্রবন্ধ লিখেছিলাম, Muslims in Bengal, তাতে গভর্ণমেণ্টের ভেদ-নীতির তীব্র সমালোচনা ছিল। সরকারী শিক্ষা দপ্তরে তা' নিয়ে হৈ-চৈ প'ড়ে গেল—আমাকে rusticate করবার অপূর্ব প্রস্তাব ক'রলেন ডাঃ পেডলার। আমার কিছু হ'ল না, তবে

কাগজ খানা উঠে গেল, সে সংখ্যার কাগজগুলো বাজেয়াপ্ত হ'ল। সে বৎসরের শেষে আমি স্কলারসিপ renew ক'রবার আবেদন ক'রলাম না আর।

তারপর বারাণসীর কংগ্রেস। সেখানে আমি বেশ একটু প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রেছিলাম। আমার সঙ্গে আলাপ হ'য়েছিল অনেকের, তিলক, লাজপৎরায় ও খাপার্দ্দে তার মধ্যে ছিলেন। আর সেই খানেই সূত্রপাত হ'ল আমার সঙ্গে গোখলের প্রীতি সম্বন্ধের। বাঙলার নেতাদের সবাই আমাকে বিশেষ সমাদর ক'রতেন এবং আমাকে দিয়ে অনেক আশা ক'রতেন।

তারপর ক'লকাতা কংগ্রেসের পর কংগ্রেসের মধ্যে ফাট ধ'রলো, নরম ও গরম দলের বিরোধ নিয়ে। নাগপুরে কংগ্রেস হবার কথা ছিল, গরম দল থেকে প্রস্তাব হ'ল তিলক মহোদয়কে সভাপতি করবার। কলকাতার থেকে এসম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনে যে সভা হয় তাতে আমি সেই প্রস্তাব সমর্থন ক'রেছিলাম। নরম দল তাতে আমাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। এই বিরোধ থেকে শেষে নাগপুরে কংগ্রেস করা বন্ধ হ'ল ও সুরাটে হওয়া স্থির হ'ল—রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি ক'রে।

সুরাট বোম্বাই প্রদেশে, কাজেই সেখানে তিলক সভাপতি হতে পারেন না। গরম দল তখন প্রথমে লাজপৎরায়কে সভাপতি করবার প্রস্তাব ক'রলেন। তিনি অস্বীকার ক'রতে, অরবিন্দ ঘোষকে নিয়ে তারা দল বাঁধলেন।

সুরাটে যে ধ্বংস লীলা হ'ল তার সম্বন্ধে ইদানীং একাধিক বিবৃতি বের হ'য়েছে। আমি যা' দেখেছি সে কথা লেখবার জায়গা এখানে নয়। তবে একথা ব'লতে আমি বাধ্য যে সে সব

বিবরণের ভিতর মিথ্যার প্রচুর মিশ্রণ দ্বারা একটা বিশেষ দলের দোষ ঢেকে অপর দলকে দোষী করবার চেষ্টা হ'য়েছে।

সুরাট কংগ্রেস ভাঙবার পর নরম দল নূতন ক'রে কংগ্রেসকে পত্তন ক'রবার জন্য একটা কনভেনশন ক'রলেন, আমিও তার সভ্য ছিলাম। তাতে কংগ্রেসের একটা সুনির্দিষ্ট constitution করার প্রস্তাব হয়। এর আগে কংগ্রেসের কোনও ধরা বাঁধা constitution ছিল না। গোখলে সুরাটে বিচার করবার জন্য একটা খসড়া ক'রেছিলেন, তাতে প্রথমেই একটা ক্রীড লেখা হ'য়েছিল, তাতে বোধ হয় ছিল বৃটিশ শাসনাধীনে স্বাধীনতাটা "goal" তাতে আমরা কয়েকজন আপত্তি ক'রেছিলাম। সেটা বাদ দিয়ে এখন constitution এর খসড়া করবার ভার প'ড়লো বিভিন্ন প্রাদেশিক কমিটির উপর—সেই সব খসড়া এলাহাবাদের কনভেনশনে বিচার হবার কথা। বাঙলার কমিটির প্রথম খসড়া করি আমি, সেটা রদ বদল ক'রে স্থূলতঃ সেইটাই গ্রহণ করলেন বাঙ্গলার কমিটি। এলাহাবাদে যে constitution গৃহীত হ'য়েছিল সেটা প্রধানতঃ বাঙলার খসড়ার উপরই প্রতিষ্ঠিত। সেই constitutionকেই ভিত্তি ক'রে অনেক বদলে, হ'য়েছে আজকের কংগ্রেসের constitution.

অনেকদিন পরে গোখলে যখন ভারত পরিষদে প্রাথমিক শিক্ষা বিল উপস্থিত করেন তখন বাঙলা দেশে সুরেন্দ্র নাথের নেতৃত্বে তার বিরুদ্ধতা ক'রে "বেঙ্গলী" কাগজে অনেক লেখা হয়। সে সময়ে প্রথমে "বেঙ্গলী"তে পরে Indian Daily News পত্রে গোখলের বিল আমি প্রবলভাবে সমর্থন করি। বিরোধী দলের আপত্তি ছিল বিলের নূতন কর ধার্য্যের প্রস্তাবে। আমি প্রথমে একক এই আপত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করি। পরে

ক্রমে বিলের সপক্ষে অনেকের সহায়তা পাই। তারপর আমার অনুরোধে গোখলে স্বয়ং এসে সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধতাকে শান্ত করেন। সেই উপলক্ষে সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার গুরুতর মতভেদ হ'য়েছিল।

পরে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লর্ড হার্ডিং একটা প্রস্তাব করেন যে ঢাকায় একটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। তখনি সুরেন্দ্রনাথ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি সম্মিলিত ভাবে সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। এবারও আমি একক তাঁদের বিরুদ্ধে তর্ক ক'রে ঢাকায় teaching and residential university স্থাপনের কথা তুলি।

কিছুদিন পর আমি ঢাকা ল' কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যালের পদ নিয়ে কলিকাতা পরিত্যাগ করি। তখন আমি আমাদের পলিটিক্সের সফলতা সম্বন্ধে হতাশ হ'য়ে ভেবেছিলাম, যে আমার দ্বারা আমার কোনও স্বপ্ন সফল করা হবে না। শিক্ষক হ'য়ে আমি ছাত্রদের আমার আদর্শ শিক্ষা দিলে, হয় তো আমি যা পারলাম না তারা তা' সফল ক'রতে পারবে এমনি একটা ভরসা ছিল। তখন ভরসা পেয়েছিলাম যে দুই বৎসরের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে। আশা ছিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'লে আমি একটি আদর্শ teaching and residential university স্থাপনে সহায়তা ক'রতে পারবো। ইউনিভারসিটি গড়তে সহায়তা করবার সুযোগ পরে পেয়েছিলাম কিন্তু সে আদর্শ-ইউনিভারসিটির স্বপ্ন তখনই লুপ্ত হ'য়ে গেছে।

দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের পর সে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'ল। কিন্তু তার আগে মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন আইন পাশ হওয়ায় যে অবস্থা হ'ল তাতে পরিকল্পিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাজামুড়ো কাটা

গেল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দরুণ বছর বছর ভারত গভর্ণমেণ্ট পাঁচলক্ষ টাকা দিয়ে পঞ্চান্ন লক্ষ টাকার যে ফণ্ড প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের হাতে জমিয়েছিলেন নূতন বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট প্রভাসচন্দ্র মিত্রের মন্ত্রীত্বকালে সে টাকা আত্মসাৎ ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়কে বার্ষিক পাঁচলক্ষ টাকা মাত্র দানের বরাদ্দ ক'রলেন। ফলে আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা চুরমার ক'রে একটা বড় গোছের মামুলী কলেজ করা ছাড়া গত্যন্তর রইলো না। শুধু তাই নয়, ক্রমে দেখা গেল যে লর্ড হার্ডিং যে সব বাড়ী নির্ব্বিবাদে ঢাকা universityর সম্পত্তি বলে বলেছিলেন, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট, অর্থাৎ প্রভাস চন্দ্র মিত্র সেগুলিও নূতন আইনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তি বলে দাবী করলেন এবং এতদূর গেলেন যে তার খাজনা ধার্য্য করবার প্রস্তাব চলতে লাগল। সৌভাগ্যক্রমে তখন আমি universityর চাকরী করি। আমার গুরুতর আপত্তিতে সে প্রস্তাব খুব বেশীদূর অগ্রসর হোল না। একটা মাঝামাঝি ব্যবস্থা হোল। আশুতোষ মুখার্জ্জী তখন কলকাতার Vice Chancellor. তিনি Hartog কে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তোমরা বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টকে বিবাদী করে সেই পঞ্চান্ন লক্ষ টাকা দাবী করে নালিশ কর। আমাকে সে কথা আশুবাবু পরে বলেছিলেন। তখন জানতাম না। জানলেও কিছু করতে পারতাম না। আশুবাবু Civil Procedure Codeএর ৮০ ধারার দিকে চোখ বুঁজেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু অবস্থা এই ছিল যে নালিশ করতে গেলেই ভারত গভর্ণমেণ্টকে নোটিশ দিতে হোত। তখন তাঁরা এসে তাঁদের আশ্রিত বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের পেছনে এসে দাঁড়াতেন। ফল যা হোল তাই হোত।

হতাশ হ'য়ে তার কিছুদিন পর আবার ওকালতীতে ফিরে এলাম ১৯২৪ সালে।

যে আট বছর ঢাকায় ছিলাম তার মধ্যে ছোটখাট অনেক চেষ্টা ক'রেছিলাম, বিশেষতঃ ঢাকার কুটির শিল্পের উন্নতির চেষ্টা। সব চেষ্টাই আংশিক সফলতার আশ্বাস দিয়ে শেষে হাওয়া হ'য়ে গেল। সমাজ সেবার জন্য আমার আমলে জগন্নাথ হলের ছেলেরা যে অপূর্ব উৎসাহের সঙ্গে একটা মহৎ কাজ আরম্ভ ক'রেছিল, আমি আসবার পর তাও লোপ পেয়ে গেল।

এখানে ফিরে এসেও কিছুদিন দেশ সেবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু দেশের লোকের আমাকে দিয়ে কোনও প্রয়োজন তখন ছিল না। তাই কিছুই ক'রতে পারিনি। তখন পলিটিক্সের হাওয়া ফিরে গেছে। গান্ধীজী ও দেশবন্ধুর যুগ সুরু হয়েছে। তাঁদের দলের কাছে আমি অপাংক্তেয়।

বঙ্গ বিভাগের আগেই আমি Indian Worldএ এক প্রবন্ধে লিখেছিলাম যে বাঙ্গালার নদনদীগুলিকে নিয়মিত ক'রে দেশের স্বাস্থ্য এবং কৃষির স্থায়ী উন্নতির ব্যবস্থা করা উচিত। কেউ সে কথা কানে তোলেনি। তারপর কাউন্সিলে থাকতে এ বিষয়ে একাধিক বক্তৃতা ক'রেছিলাম এবং বলেছিলাম যে বাংলাদেশে River Physics Laboratory স্থাপন করা উচিত। একজন সভ্য River Physics কথাটা শুনে হেসেছিলেন, বলেছিলেন, সে আবার কী? এতদিনে ভারতে ব্যাপক ভাবে সে চেষ্টার সূত্রপাত হ'য়েছে। কিন্তু সে আমার চেষ্টায় হয়নি।

১৯১১ সালে আমি প্রথম প্রস্তাব করি জমিদারী প্রথা বিলোপের। তারপর এ সম্বন্ধে অনেক লিখেছি। একথা কানে তুলেছিলেন কেবল জমিদারেরা। তাই তাঁদের বিরুদ্ধতায় আমি

দুইবার কাউন্সিলে প্রবেশপ্রার্থী হ'য়ে পরাজিত হ'য়েছি। আজ সর্বদেশে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের হিড়িক লেগে গেছে। কিন্তু সে সম্বন্ধে আমার যে পরিকল্পনা ছিল তেমনটি কোথাও হয়নি।

বাঙ্গলার কৃষি সম্পদ পাটের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য আমি ১৯৩০ সন থেকে চেষ্টা ক'রেছিলাম। সে চেষ্টা তার প্রায় দশ বৎসর পর অন্য লোকের চেষ্টায় আরম্ভ হ'য়েছিল। কিন্তু সফলতাটা স্থায়ী হয় নি, আর বাঙ্গলার অঙ্গভঙ্গ হ'য়ে সেটা এখন প্রায় নিষ্ফল হতে ব'সেছে। এমন অনেক কিছু হ'য়েছে।

আমার সাহিত্য চেষ্টার কথা আপনারা জিজ্ঞাসা ক'রেছেন। সে সম্বন্ধে বেশী কিছু বলবো না, কেন না সেটা এখন ইতিহাসের লুপ্ত অতীতের একটা পরিচ্ছেদ। গোটা কয়েক কথা ব'লবো।

সাহিত্য গগনের একটা জ্যোতিষ্ক হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা হ'য়েছিল আমার শৈশবেই। ১০।১১ বৎসর বয়স থেকে অনেক কিছু লিখেছি। সৌভাগ্যের বিষয় আমার শৈশবের সে চেষ্টার চিহ্ন মাত্র নেই। থাকলে তা নিয়ে আপনারা আমাকে লজ্জা দিতে পারতেন।

অনেক দিন পরে ১৯১৯ সালে আমি আমার প্রথম বই ছাপাই। তার পর প্রায় ষাট খানা বই লিখেছি।

সাহিত্যাকাশের তারকা আমি হইনি, কিন্তু হাউই হ'য়েছিলাম। এটা আমার জীবনের একটা সাধারণ নিয়ম। আমার প্রত্যেক চেষ্টাই প্রথমে বেশ সাড়া জাগায়। কিন্তু শেষে সে সাড়া বিলুপ্ত হয়ে যায় হাউইয়ের আগুনের মত।

একদিন আমার লেখা নিয়ে একদিকে রব উঠেছিল আমি যুগ-প্রবর্ত্তক, আর একদিকে আমি একটা সমাজ-ধ্বংসী দৈত্য বলে রাশি রাশি গালাগালি বর্ষিত হ'য়েছিল। আজ সবাই নীরব, আমার হাউইয়ের আগুন নিভে গেছে। ভেবেছিলাম চুকে গেছে

সব। কিন্তু এখন দেখছি আমার একজন অতি নিন্দুক, প্রবীন বয়সে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখতে গিয়ে আমার সম্বন্ধে তাঁর গ্লানিকর আচরণকে বেশ একটু জৌলুষ দেবার চেষ্টা ক'রেছেন। সত্যি কথা আজও স্বীকার করেন নি যে তিনি আমাকে অযথা নীচভাবে এবং মিথ্যা গালাগালি ক'রেছিলেন। তিনি লিখেছেন যে তা নিয়ে আমি উকিলের চিঠি দিয়েছিলাম। উকিলের চিঠি আমি দিই নি, তাঁকেও কিছু লিখি নি। তিনি আসল সত্যটা প্রকাশ করেন নি। কিন্তু সে পুরান কাসুন্দী ঘাঁটতে চাই নে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার বিরোধের কথা আপনারা জিজ্ঞাসা ক'রেছেন। তাঁর সঙ্গে বিরোধ আমার কখনও হয় নি। আমি শুধু তাঁর সাহিত্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধের আলোচনায় ভিন্ন মত প্রকাশ ক'রেছিলাম। তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে আমার নিবিড় সম্পর্ক কখনও হয় নি, তবে এককালে তিনি আমার লেখার অনুরাগী ছিলেন। আমি চিরদিনই তাঁর ভক্ত এবং আমার যা কিছু সাহিত্য চেষ্টা তার প্রধান উৎস যে তাঁর সাহিত্য এ কথা আমি চিরদিনই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার ক'রেছি।* কিন্তু দুঃখের বিষয় রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে এক নিবিড় স্তাবক দলের দ্বারা বেষ্টিত থাকতেন। তাঁরা সবাই আমার বন্ধু ছিলেন না। তাঁদের উত্তেজনায় তাঁর মনে একটা বিরুদ্ধতা এসেছিল। কিন্তু এ বিষয়ে আমার লিখিত পত্রের উত্তরে তিনি আমাকে যে শেষ পত্র লিখেছিলেন তাতে স্পষ্ট দেখা যায় যে তিনি মনে কোনও ক্ষোভ রাখেন নি।

তাই, এতদিন পর সেই পরমগুরুর বিরুদ্ধতা নিয়ে কোনও আলোচনা ক'রতে আমি চাই না।

* আনন্দ মন্দির—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

কল্লোল গোষ্ঠীর সঙ্গে আমার মতবিরোধের কথা জিজ্ঞাসা ক'রেছেন দেখে বিস্মিত হ'লাম। আমি কল্লোলের নিয়মিত পাঠক ছিলাম না, কাজেই তাঁদের কাগজে আমার মতামত ঘটিত কোনও কথা বাহির হওয়ার সম্বন্ধে আমি জানি না। "কল্লোল" বা তথাকথিত কল্লোল গোষ্ঠীর কোনও লেখা সম্বন্ধে আমি আলোচনা করেছি বলে মনে পড়ে না। তাঁদের সঙ্গে যে আমার কোন বিষয়ে মতবিরোধ হয়েছে তাও আমি এই প্রথম শুনলাম। পক্ষান্তরে আমার স্মরণ হয় যে "কল্লোল" সম্পাদক ৺দীনেশ রঞ্জন দাস আমার কাছে একাধিক বার লেখা চেয়েছিলেন, তখন আমি যে তাঁদের দলের বিরোধী এমন ইঙ্গিত তিনি কখনও দেন নি।

প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম সভাপতি আমি ছিলাম। শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার আমাকে টেনে নিয়েছিলেন। সে সম্পর্কে যে সম্মেলন হয় তাতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে আমি যে বক্তৃতা ক'রেছিলাম তা থেকেই—এ সম্বন্ধে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর পাবেন। তাতে আমি ব'লেছিলাম যে এক হিসেবে যে লেখা progressive নয়, শুধু গতানুগতিক, তা সাহিত্য নয় এবং সাহিত্য মাত্রেই প্রগতিশীল ; তবু progressive literature ব'লতে বিশেষ ক'রে আমরা বুঝি সেই সাহিত্য যাতে মানুষকে স্বাধীনতা ও স্বাধীন চিন্তার দিকে অগ্রসর ক'রে দেয়। সেই অর্থেই আমি সে সভায় যোগ দিয়েছিলাম। পরে সে সংঘে প্রগতি সাহিত্যের যে বিশেষ সঙ্কীর্ণ রূপ দেওয়া হয় তার জন্য আমি দায়ী নই।

একদল সাহিত্যিক প্রগতি মানে বোঝেন শুধু মার্কস্‌বাদ। যা কিছু মার্কস্ বা লেনিনের প্রতিধ্বনি তাই তাঁদের মতে প্রগতি সাহিত্য। আমার বিবেচনায় এঁরা প্রগতিবাদী নন, শুধু স্থিতিবাদী।

ওঁ [illegible] –

বিনয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদনমিদং

আপনার কাছ থেকে যে চিঠিখানি আজ আমার হাতে এসে পৌঁছল সেটিতে আমার বিশেষ [illegible] ছিল এই কথাটি আমি অনুভব করেছি। কোথাও বেদনার কারণ ঘটিয়ে রেখে দিয়েছি এ কথা মনে করতে অত্যন্ত অশান্তি বোধ করি — এইজন্য আপনার চিঠিখানি পেয়ে বিশেষ সান্ত্বনা বোধ করেছি। আমি

আপনার এরকম চিঠি লেখা সহজ নয়, খুব অল্প লোকেই পারে। পরমেশ্বরকে আঘাত করতে গিয়ে আমরা যে অহংকারকে জাগিয়ে তুলি আমরা কবি আমাদের দুর্বলের সম্বন্ধে সেইটে সম্পূর্ণ কেটে গেছে। ইতি ২২ জুন ১৯২৮

শুভার্থী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মার্কস্ লেনিন যা' বলে গেছেন তাই শেষ কথা, নাস্ত্যৎ পরন্তরং কিঞ্চিৎ, একথা যাঁরা বলেন তাঁরা গোঁড়া মুসলমান বা হিন্দু বা গোঁড়া খৃষ্টানের চেয়ে বেশী প্রগতিবাদী নন, বরং তারা অতীতবাদী। স্বাধীন চিন্তা বা ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা যারা ক্ষুন্ন ক'রতে চায় "অথরিটি দিয়ে" তারা গুরুবাদী—প্রগতিবাদী কিছুতেই নয়।

কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনে আমার অংশ সম্বন্ধে আপনারা প্রশ্ন ক'রেছেন। স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে socialistic outlook বাংলা দেশে হয়তো আমিই সর্বাগ্রে প্রবর্ত্তন করেছিলাম। আর কেউ আগে তা ক'রে থাকলেও আমার তা জানা নেই। কিন্তু ১৯২০ সালের পর বোধ হয় একদল এই মত নিয়ে সংঘবদ্ধ হবার চেষ্টা করেন। তার মধ্যে ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম ও মুজাফর আহমদ। তাঁরা আমাকে, অতুল গুপ্তকে আরও অনেক লোককে নিয়ে দল গঠন করেন এবং প্রথমে নজরুলের "লাঙল" ও পরে মুজঃফর আহম্মদ সম্পাদিত "গণবানী" কাগজ প্রতিষ্ঠা করেন। আমি ছিলাম এঁদের প্রথম সভাপতি, অতুল গুপ্ত ছিলেন সহকারী সভাপতি।

তারপর মীরাট ষড়যন্ত্রের মামলা হ'য়ে এ দলের* অস্তিত্ব লোপ পায়।

তারপর ১৯৩০ সালের পর কাউন্সিলে একটা তথাকথিত প্রজাপার্টি হয়, সেটা ক্রমে হয়ে গেল নাজিমুদ্দীনের মন্ত্রীদলের ধামা ধরা। তার বাহিরে একটা কৃষক প্রজা দল ছিল, মৌলানা আক্রাম খাঁ ছিলেন তার সম্পাদক। তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। ময়মনসিংহে এই দলের যে সভা হয় তাতে সভাপতি নিয়ে আক্রাম খাঁর সঙ্গে মতবিরোধ হয় ফলতঃ তিনি দল ত্যাগ করেন। ফজলুল হক হলেন সভাপতি। ১৯৩৫ সনের প্রথম

* Peasants and Workers' Party

নির্বাচনের প্রাক্কালে ঢাকায় আর একটা সম্মেলন হয়, তাতেও ফজলুল হককে আমরা সভাপতি নির্বাচিত ক'রেছিলাম। ১৯৩৫ সালের নির্বাচনে এই দল মুসলিম লীগকে পরাজিত ক'রে সংখ্যাধিক্যে নির্বাচিত হন। কিন্তু তার পর এঁরা মুসলীম লীগের সঙ্গে মিতালী করে যে সব কাজ করেন তাতে আমি তাঁদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করি, এবং সেই থেকে আমি সম্পূর্ণভাবে পলিটিক্স থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করি।

দেশের ও জগতের পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমার মত জিজ্ঞাসা ক'রেছেন। অল্প কথায় এর উত্তর দেওয়া যায় না। ভারতের বা জগতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি আশাবাদী নই। মনে হয় ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকার। তৃতীয় মহাযুদ্ধ আসন্ন কিনা, হবে কি হবে না এ সম্বন্ধে কোনও মতামত আমার নেই। তবে ডালেস ও ম্যাককার্থি একদিকে আর ভিসিনস্কী মলোটভ প্রভৃতি আর একদিকে যে রকম ক্ষণে অক্ষণে বিষোদ্গার ক'রছেন তাতে যে কোনও সময়ে একটা বিস্ফোরণ হ'য়ে পৃথিবী ধ্বংস হ'তে পারে। আবার সেই ভয়ে ভয়ে হয়তো কিছু নাও হতে পারে।

বলা বাহুল্য এটা শান্তির পথ নয়। বিশ্বে শান্তি স্থাপন করতে হ'লে যা সব ক'রতে হবে তাতে এই বিশ্বব্যাপী সন্দেহ ও গালিগালাজের আবহাওয়া সর্ব্বাগ্রে দূর করতে হবে, আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কে বিধিবদ্ধ আইনের অধিকার মানতে হবে। গালাগালি ক'রবো না প্রথমে এই সম্বন্ধে একমত হ'লে, পরে সব কথাই আলোচনা হ'তে পারে। ধীরভাবে আলোচনা করলে live and let live নীতি মনেপ্রাণে অনুশীলন ক'রলে বিরোধের কোনও অবসরই থাকে না।

মধ্যবিত্ত—বৈশাখ, ১৩৬১—সম্পাদকের প্রশ্নোত্তরে লিখিত

॥ সত্যনিষ্ঠা ॥

(ঢাকা ছাত্রসমাজে কথিত)

সত্য কহিও মিথ্যা কহিও না, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় ভাগ হইতে রামায়ণ, মহাভারত, মনু, বিষ্ণু প্রভৃতি সকল নীতিগ্রন্থে এই কথা বার বার উপদিষ্ট হইয়াছে।

"অশ্বমেধ সহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়াধৃতম্,

তুলয়িত্বা তু পশ্যামি সত্যমেবাতিরিচ্যতে।"

ইত্যাদি রূপক, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কারের সাহায্যে সত্যনিষ্ঠার গৌরব জগতে ঘোষিত হইয়াছে। এত পুরাতন এবং জীর্ণ এই কথা, যে ইহার পুনরাবৃত্তি নিতান্ত অরুচিকর মনে হইতে পারে।

কিন্তু এত পুরাতন হইলেও এই সত্যনিষ্ঠার প্রকৃতস্বরূপ সকলে ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে কি? আমরা সকলেই কি বুকে হাত দিয়া বলিতে পারি যে আমরা প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ, সত্য আমাদের কাছে যত কিছু দাবী করে সব আমরা তাহাকে দিতে পারিতেছি?

এমন লোক হয়ত আছে যে কখনও মিথ্যা কথা বলে নাই, কিন্তু তাই বলিয়াই কি তাহাকে সত্যনিষ্ঠ বলিতে হইবে? সত্যনিষ্ঠা কি এমন একটা বস্তু যাহা কেবল মিথ্যা কথা হইতে নিবৃত্ত হইলেই লাভ করা যায়? সত্যনিষ্ঠা তামসিক গুণ নয়, সাত্ত্বিক ও রাজসিক। ইহার ধর্ম্ম জড়তা নয়, প্রকাশ ও প্রবৃত্তি। এই কথাটা আমরা সব সময়ে মনে রাখি না বলিয়াই অনেক সময় সত্যনিষ্ঠার গৌরব অন্যায়রূপে আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করি। যদি আমরা কর্ম্মী না হই, সত্যকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য

অসত্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে অগ্রসর না হই, যদি কেবল মিথ্যা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আমাদিগের অন্তরের সবগুলি দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকি তবে আমরা হয়ত মিথ্যার প্রবেশ নিবারণ করিতে পারি—কিন্তু সত্যকেও সেই সঙ্গে বিমুখ করিয়া দেশান্তরে পাঠাইয়া দিই।

সত্যনিষ্ঠা একটি "cloistered virtue" নয়, বন্ধঘরে ইহার দম আটকাইয়া যায়, খোলা হাওয়ায়, জীবন সংগ্রামের ঠিক মাঝখানে ইহার প্রতিষ্ঠা, সেইখানেই ইহার পরিণতি।

যদি তুমি সত্যনিষ্ঠ হও—সত্যের প্রতি যদি তোমার একান্ত প্রীতি থাকে, তবে তুমি চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিতে কিছুতেই পারিবে না তোমাকে উঠিতে হইবে, কাজে অগ্রসর হইতে হইবে, অসত্যের সঙ্গে প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে।

কারণ সত্যের ধর্ম্ম বিদ্রোহ—মাথা পাতিয়া কোনও কথা মানিয়া লওয়া সত্যনিষ্ঠের স্বভাব নয়। নিজের মনের ভিতর যে কষ্টিপাথর আছে, সব কথা, সব আচার, সব অনুষ্ঠান তার কাছে যাচাই করিয়া তবে তাহা গ্রহণ করিবে। পরীক্ষায় যাহা না উত্তীর্ণ হইবে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে—তাহাকে জীবন হইতে, জীবনের চারিপাশ হইতে দূর করিতে হইবে।

অথচ চাহিয়া দেখ জীবনের চারিদিকে অন্ততঃ বার আনা কথা লোকে বিনাবিচারেই মানিয়া লইতেছে। তুমি যে সমাজের ভিতর, যে সংস্কারের ভিতর জন্মিয়াছ তাহা তোমার স্বাধীনতাকে চারিদিকে খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছে। তুমি যদি প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ হও তবে তোমার এই সংস্কারের সঙ্গে, সমাজ-বিধির সঙ্গে হয়ত পদে পদে যুদ্ধ করিতে হইবে। তুমি যদি সত্যের তীব্র প্রদীপ

হাতে ধরিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হও, তবে দেখিতে পাইবে চারিদিকে কত মিথ্যা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সত্য আজ পদানত, মিথ্যা জয়ী ;—জীবনের বেশীর ভাগ কথা, বেশীর ভাগ কাজ মিথ্যার সেবায় ব্যয়িত হইতেছে। তুমি কি চুপ করিয়া মাথা পাতিয়া সে মিথ্যার শাসন স্বীকার করিয়া লইবে না সত্যের ধ্বজা ধরিয়া সর্ব্বস্ব পণ করিয়া মিথ্যার সহিত সংগ্রামে অগ্রসর হইবে ?

আমাদের এ পৃথিবী এক অদ্ভুত স্থান। এ জগতে কেহ সত্যকে ষোল আনা মানিয়া চলে না। সত্য বল, ধর্ম্ম বল, ন্যায় বল, মুখে মুখে সকলে ইহাদের গৌরব গান করে—অথচ জীবনের ভিতর—নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য কলাপের ভিতর এ সব বড় বড় কথার বড় একটা স্থান নাই। ব্যবসায়ীর একটা কারবারের বিষয়ে, গৃহস্থের একটা বৈষয়িক ব্যাপারে তুমি যদি পরামর্শ দিতে যাও—লাভালাভের হিসাব খতাইয়া তুমি যত কথা বল সব কথা সে মনোযোগের সহিত শুনিবে, কিন্তু তুমি যদি বল, "হউক তোমার লোকসান, তুমি সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইও না," তবে সে যদি খুব বিজ্ঞ হয় ত মুচকিয়া হাসিবে, যদি সে বিদ্রূপপ্রিয় হয় তবে বলিবে —"ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির আর কি!" কিম্বা বলিবে "বাপু হে সংসারে অত সত্য দেখিতে গেলে চলে না, ধর্ম্মের পথে চলিতে হয় ত সংসার ছাড়" ইত্যাদি। চারিদিকে চোখ মেলিয়া চাহিলে, দেখা যায় সত্য ও জীবনের মধ্যে একটা চিরস্থায়ী বিরোধ রহিয়া গিয়াছে। তাই পৃথিবীর পনের আনা লোক মুখে বলে ধর্ম্মের কথা আর জীবনের ভিতর সে ধর্ম্মকে প্রবেশ করিতে দেয় না। লোকে ধর্ম্মকে মন্দিরের গণ্ডীর মধ্যে বন্দী করিয়া জীবন নিয়মিত করে কেবল নিছক লাভক্ষতির হিসাব অনুসারে। ধর্ম্মকে জীবনের

ভিতর গ্রহণ করিতে না পারিয়া আমরা সত্যের কাছে চিরদিন দেনদার থাকিয়া যাইতেছি। এটা আমরা একটা স্বতঃসিদ্ধের মধ্যে ধরিয়া লইয়াছি যে খাঁটি ধর্ম্মের পথ ধরিয়া থাকিলে জীবন-যাত্রায় আর সবার অনেক পিছনে পড়িয়া থাকিতে হইবে—এবং ধর্ম্ম অবশ্য মৌখিক হিসাবে সবার বড় হইলেও সাংসারিক হিসাবে সফলতাটাই জীবনের—চরম উদ্দেশ্য।

সমস্ত সমাজ এবং সমস্ত জগৎ যখন এই নিয়ম মানিয়া চলিতেছে তখন যে প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ তাহার পদে পদে সমাজের সঙ্গে যুদ্ধ করা ছাড়া উপায় নাই। আমি যাহা ধর্ম্ম, যাহা ন্যায়, যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছি, জীবনের প্রত্যেক কার্য্যটি তাহা-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে না পারিলে আমি সত্যভ্রষ্ট হইব, অথচ সে পথে চলিতে গেলে জগতের সঙ্গে নিরন্তর বিরোধ হইবেই।

সত্যনিষ্ঠ যে, তাহাকে কাজেই কর্ম্মবীর হইতে হইবে, সত্য জানিলে হইবে না, তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, জীবনে তাহাকে আয়ত্ত করিতে হইবে। নহিলে সত্যলাভ বা সত্যরক্ষা হইবে না।

বাস্তবের সঙ্গে ন্যায় ও ধর্ম্মের বিরোধের কথাটা এত স্পষ্ট হইলেও এ বিষয়ে আমরা সত্য কথা বলিতে সব চেয়ে কুণ্ঠিত। ধর্ম্মের পথ হইতে যে যত দূরে সরিয়া থাকে সেই মুখে তত বেশী ধর্ম্মের গৌরব ঘোষণা করে—আর যদি কেহ ধর্ম্মের মানদণ্ডে জীবনের পরিমাপ করিয়া তাহার দোষ ত্রুটি দেখাইয়া দেয় তবে সে সকলের কাছে নিন্দনীয় হয়।

এই বিরোধের মূল কারণগুলি অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই যে দোষটা যে ষোল আনা বিষয়ী জগতের তাহা নহে। অনেক সময় দেখা যায় যে এই বিরোধের মূল কারণ আর কিছুই নয়,

আমরা সব সময় সত্য বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে খাঁটি সত্য কথা বলি না। জিনিসটাকে আমরা সিংহাসনে চড়াইয়া তফাৎ করিয়া রাখিয়াছি তাহার কারণ এই যে বাস্তবিকই যাহাকে আমরা ধর্ম্ম বলি সেটা জীবনের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না।

(২)

ধর্ম্মনীতিরও সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। অথচ ধর্ম্মনীতিকে আমরা নিত্য ও সনাতন জ্ঞান করিয়া তাহার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করি না। জীবনে যেটাকে সত্য বলিয়া অনুভব করিয়াছি আমাদের অন্বয়াগত ধর্ম্ম-নিয়মের সঙ্গে তাহার বিরোধ দেখিতে পাই। সেখানে আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি না যে পূর্ব্বের নিয়ম মিথ্যা। কাজেই সে নিয়মকে সিংহাসনে চড়াইয়া ফুল চন্দন দিয়া পূজা করি, আর তার সম্মুখে একটা পর্দ্দা টানিয়া তাহার আড়ালে নূতন-পাওয়া সত্যকে লইয়া ঘর করি। সনাতন ধর্ম্ম-নিয়মের সঙ্গে আমাদের এই রকম লুকোচুরি চিরকাল চলিয়া আসিতেছে।

সমাজ যেমন চলিতেছে ধর্ম্ম ও নীতির বিধানও তাহার সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং সেগুলির উপযুক্ত পরিবর্ত্তন বা সংস্কার না করিলে তাহা জীবনের শাস্ত্র হইতে পারে না। এই সত্য যদি আমরা স্বীকার না করি—প্রচলিত বিশ্বাস যেখানে অসত্য বা অসম্পূর্ণ বলিয়া জানি সেখানে যদি তাহাকে আমরা অসত্য বা অসম্পূর্ণ বলিতে সাহসী না হই তবে আমাদের সত্যনিষ্ঠার স্পর্দ্ধা অসত্যের পরাকাষ্ঠা হইবে।

সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে এ কথা অনেকে এখন অসঙ্কুচিত চিত্তে স্বীকার করিবেন। প্রাচীন যে সকল সমাজ-ব্যবস্থা এতদিন

আমাদের ভিতর ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে এবং যাহা অস্বীকার করা অধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তাহা যে অনেক সময় অপরিবর্ত্তনীয় ধর্ম্মের পদবী লাভ করিতে পারে না, তাহা যে অসম্পূর্ণ, হীনাঙ্গ ও পরিবর্ত্তনযোগ্য,—এ কথাও অনেকে স্বীকার করিবেন। কিন্তু প্রচলিত সমাজ-নীতি যাহাকে Bernard Shaw বলেন conventional morality তাহার সম্বন্ধে এ কথা স্বীকার করিতে অনেকে কুণ্ঠিত হইবেন।

কিন্তু চক্ষু বুজিয়া থাকিলে ত সত্য মিথ্যা হইয়া যাইবে না। মামুলি নৈতিক নিয়মগুলি যে সব সময় নিখুঁত সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া চলে না এ কথা অস্বীকার করা অসম্ভব। এ কথা সত্য কিনা তাহা একখানা শিশুপাঠ্য নীতিগ্রন্থ হাতে লইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। তাহাতে যে সকল নীতির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে সেগুলির বেশীর ভাগ কি বাস্তব জীবনে আমরা copy book maxims বলিয়া উড়াইয়া দিই না? আর জীবনে যে সব সত্য আমরা উপলব্ধি করিয়াছি তাহার ওজনে তৌল করিলে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে সেগুলি সত্য সত্যই আংশিক সত্য বা অল্প সত্যের অতিশয়োক্তি।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধর পিতামাতার প্রতি ভক্তি। নীতিগ্রন্থে ইহার যে সকল উপদেশ আছে তাহা সম্পূর্ণরূপে মানিয়া লওয়া চলে না। শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃভক্তি বা ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তি নীতিগ্রন্থে বেশ সুশোভন, কিন্তু বাস্তব জীবনে তাহার বাস্তবিকই কোনও স্থান নাই। আমাদের এ কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে পিতামাতার প্রতি একান্ত ভক্তি একটা absolute duty নহে। ইহা ভাল, কিন্তু সব সময় ভাল নহে; যেমন ব্রজেশ্বরের পিতার আজ্ঞায় পত্নীত্যাগ ব্যাপারটা যে খুব ভাল কাজ এ কথা আমরা বুকে হাত

দিয়া বলিতে পারি না। যে উৎকট পিতৃভক্তি মানুষের মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করিয়া দেয়, তাহাকে অপর পাঁচটি কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট করে, যাহা তাহার জীবনের সম্পূর্ণতা লাভে বাধা দেয়—সে পিতৃভক্তি যে ভাল নয় এ কথা আমরা বাস্তবজীবনে শত শত কার্য্যে নিত্য দেখাইতেছি, কিন্তু এ কথা মুখ ফুটিয়া বলিলে লোকের কাছে নিন্দাভাজন হইতে হয়।

আর একটা দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। এই সত্যকথা বলা সম্বন্ধেই আমরা সকল সময়ে ঠিক সত্য কথা বলি না। সকল স্থানে ও সকল অবস্থায়ই যে সত্য কথা বলিতেই হইবে ইহা ধর্ম্ম নহে—এ কথা আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মুক্তকণ্ঠে বলিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। অথচ আমাদের copy book নীতি অনুসারে পরিহাসচ্ছলেও মিথ্যা কথা বলা বড় দোষ। কিন্তু শিশুর মঙ্গলের জন্য শিশুকে মিথ্যা স্তোক-বাক্যে ভুলান, তাহাকে ভাত খাওয়াইবার জন্য নানা অসম্ভব প্রতিশ্রুতি দেওয়া আমরা নিত্যই অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

তাহা ছাড়া আরও এমন অনেক দৃষ্টান্তের বলে দেখান যাইতে পারে যে কোন কোন স্থলে মুখের সত্য জীবনের সত্যের বিরোধী হইয়া উঠে।

সুতরাং সত্য বলিতে হইবে এ কথাটা সকল সময় সকল অবস্থায় নিখুঁত সত্য নহে ;—সত্য কথা বলিতে হইলে এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে।

সমাজের পরিণতির ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে সর্ব্বত্রই কোনও একটা নিয়ম যখন প্রথম বিধিবদ্ধ হয়—তা সে নিয়ম ধর্ম্মেরই হউক আর সমাজেরই হউক, আইনেরই হউক আর নীতিরই হউক—প্রথমে সে নিয়ম খুব ব্যাপক ভাবে

রচনা করা হয়, পরে ক্রমে ক্রমে তাহার পরিধি সঙ্কীর্ণ করিয়া তাহাকে জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইতে হয়। নিয়মটা যে অতিব্যাপক এ সত্য কালক্রমে অভিজ্ঞতা হইতে লাভ করা যায়। এমনি করিয়া প্রত্যেক নিয়ম সঙ্কুচিত হইয়া ক্রমশঃ অধিক সত্য হইয়া উঠে। যেখানে অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মকে এই ভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া না লওয়া হয় সেইখানেই ক্রমে নিয়ম অসত্য হইয়া দাঁড়ায় এবং বাস্তব জীবন ও নৈতিক জীবনে বিরোধ বাধিয়া উঠে।

যে প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ তাহাকে একদিকে যেমন ধর্ম্মের সঙ্গে জীবনকে সঙ্গত করিতে হইবে, তেমনি অপরদিকে ধর্ম্ম বা নীতির যে নিয়ম সত্যবিরোধী বা সত্যাতিরিক্ত তাহাকে অসত্য বলিয়া প্রকাশ করিতে সাহসী হইতে হইবে। যে সত্যনিষ্ঠ সে কোনও কথা মানিয়া লইবে না; কোনও কথা সত্য বলিয়া মানিবার পূর্ব্বে তাহার মন ও বুদ্ধির নিকট তাহা যাচাই করিয়া লইবে। কোনও আচার বা অনুষ্ঠান বা বিধি যত কেন প্রাচীন হউক না, তাহা যদি তোমার নিজের চিত্তের নিকট, সম্যক সশ্রদ্ধ অনুসন্ধানের পর সত্য বলিয়া প্রতিভাত না হয় তবে তুমি তাহা গ্রহণ করিবে না। ইহাই সত্যনিষ্ঠের প্রথম সঙ্কল্প। যদি তুমি কোন কথা সত্য বলিয়া জানিয়া থাক তবে তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবে না, তাহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকিবে—ইহাই ঐকান্তিক সত্যনিষ্ঠার পরিচয়। তুমি যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছ তাহাই তোমার কাছে একমাত্র সত্য, অন্য কেহ তাহাকে অসত্য বলিয়াছে বলিয়াই, তুমি নিজের সত্যকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। কারণ এ কথা আজ আর অস্বীকার করা চলে না যে, সত্য মূলে এক ও নিত্য হউক বা না হউক সত্যের প্রকাশ বহু। দুইটি পরস্পরবিরোধী কথা একই রূপ সত্য হইতে পারে।

আজ যাহা সত্য বলিয়া পরিগণিত, আজকার দিনে, আজকার সমুদয় পারিপার্শ্বিক অবস্থার হিসাবে তাহাই সত্য; তাহাকে সত্য বলিয়া জানিয়াই কার্য্য করিতে হইবে। তুমি যাহাকে সত্য বলিয়া স্থির জানিয়াছ তাহা লইয়াই তোমাকে কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে, পরমুখাপেক্ষী হইয়া পরের প্রসাদে সত্য লাভ করিয়া কখনও প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ হইতে পারিবে না। হইতে পারে যে আজ তুমি যাহাকে সত্য বলিয়া জানিতেছ, কাল যখন মনের উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিবে তখন তাহাকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে না। কিন্তু তাহাতে বিচলিত হইলে চলিবে না। সত্য কালের সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতেছে, পরিণত হইতেছে; তুমি যদি একবারে চিরন্তন এবং নিত্য সত্যের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাক তবে তোমার সে সত্য লাভ হইবে না। অপ্রমত্ত চিত্তে মার্জ্জিত বুদ্ধি ও ঐকান্তিক সত্যনিষ্ঠা লইয়া অনুসন্ধানে যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছ তাহাকে আশ্রয় করিয়া তাহার দ্বারা তোমার জীবনকে পরিচালিত করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে তোমার সত্যই একমাত্র অভ্রান্ত ও শেষ সত্য নহে। যে তোমার দলে নয়, তোমার মত যাহার মত নহে, সেও তোমারই মত সত্যনিষ্ঠ ও সত্যসেবক হইতে পারে। কেননা সত্য নানারূপ; নানা যুগে ও একই যুগে নানা ভাবে নানা লোকের কাছে আবির্ভূত হয়। আমি যাহা সত্য বলিয়া পাইয়াছি, তাহার দ্বারা আমার জীবনকে নিয়মিত করিতে হইবে এ কথা অবশ্য সত্য। কিন্তু তাহার বিরোধী বা আপাত-বিরোধী যাহা কিছু তাহাই যে মিথ্যা, সত্যের সেবা করিতে হইলে যে তাহাকেই পাতিত করা আবশ্যক এ কথা সত্য নহে।

সবুজ পত্র—৩য় বর্ষ, একাদশ সংখ্যা—ফাল্গুন, ১৩২৩

॥ দেশের সেবা ॥

মানুষ যে বাঁচিয়া আছে সে হিংসার জোরে নহে প্রেমের জোরে। মানুষ বাঁচিয়া থাকে, বাড়িয়া উঠে বড় বড় কাজ করে—সে সবই প্রীতির বলে। Struggle for existence বা জীবন-সংগ্রাম নহে, mutual aid বা পরস্পরের সাহায্যই সমাজের ভিত্তি ও সমাজের উন্নতির মূল ও নিয়ামক। এই mutual aid বা পরস্পরের সাহায্যের কথাটাই টলষ্টয় তাঁহার এক উপন্যাসে মর্ত্ত্যপ্রবাসী এক স্বর্গীয় দূতের মুখে বলাইয়াছেন,—

"All men live, not by the care they take of themselves, but by the love that there is in men. I have learned that it only seems to men that they live by the care they take of themselves ; but in truth they live only by love."

অর্থাৎ মানুষ আপনার প্রতি যত্ন করে বলিয়া বাঁচে এমন নয়, মানুষের মধ্যে যে প্রেম আছে তাহারই জন্য মানুষ বাঁচে। আমি দেখিয়া শুনিয়া জানিয়াছি যে মানুষ মনে করে সে আপনাকে আপনি যে যত্ন করে তাহারই জন্য সে বাঁচে ; কিন্তু বাস্তবিক তাহারা বাঁচে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রেমের জন্য।

এই সত্যই বর্ত্তমানযুগের সমাজতত্ত্বের প্রধান আবিষ্কার। এই প্রীতি, যাহা মানুষকে মানুষের সঙ্গে বাঁধিয়া তাহাকে উন্নতির পথে লইতেছে তাহা মানবসমাজের আদিযুগে কেবল অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাহার পর যুগে যুগে ইহা প্রবৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ বৃহত্তর সমাজে প্রসারিত হইয়াছে। দেশ-প্রীতি এই বিশ্বব্যাপী প্রীতির একটি পরিণতি ও

পরিচয় মাত্র। আদিযুগে যাহা অপরিসর ছিল, আজ তাহা সর্ব্বব্যাপী; আদিযুগে যাহা পরিবার বা আত্মীয়ে আবদ্ধ ছিল, আজ তাহা দেশব্যাপী; আর সেই দেশ যাহা সেকালে ছিল একটি অপেক্ষাকৃত ছোট স্থান, আজ তাহা ক্রমে বাড়িয়া চলিয়া একএক বিরাট ভূখণ্ডে পর্য্যবসিত হইয়াছে। শতবর্ষ পূর্ব্বে যাহারা ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী, আজ তাহারা এক লক্ষ্য লইয়া একসাথে চলিয়াছে; শতবর্ষ পূর্ব্বে যাহারা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া হিংসা করিয়া লোকক্ষয় করিয়াছে, আজ তাহাদের মধ্যে পরমপ্রীতি, আজ তাহারা পরম বন্ধু। পূর্ব্বে যাহা ছিল বিদেশ, আজ তাহা স্বদেশ; পূর্ব্বে যাহারা ছিল দেশের শত্রু, আজ তাহারা স্বদেশবাসী।

মানবের প্রেমের যে পরিসর, দেশই কি চিরদিন তাহার সীমা থাকিবে? দেশ যতই বাড়িয়া যাক না কেন সে সীমাবদ্ধ, মানুষের ভালবাসিবার শক্তি কিন্তু অসীম। এখনি দেখিতে পাইতেছি যে সে ভালবাসা ভূগোলের সকল সীমা লঙ্ঘন করিয়া মানুষকে বাঁধিতেছে, দেশের গণ্ডী ছাড়াইয়া গিয়া মানুষের প্রীতি বৃহত্তর সমাজ অন্বেষণ করিতেছে। এই অন্বেষণের পরিণতি কোথায় সে বিষয়ে কি কোনও সন্দেহ আছে? সমুদয় মানবসমাজে যে এই প্রীতি ছড়াইয়া পড়িবে, দেশ জাতি প্রভৃতি ক্ষুদ্র সমাজ যে সেই প্রকাণ্ড প্রীতির বন্যায় ভাসিয়া যাইবে, সমুদয় মানবজাতি যে এক মহাদেশ ও এক মহাসমাজ হইয়া গড়িয়া উঠিবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। যেমন আগে ছিল নিজের পরিবার, নিজের কুল-গণ-জাতি, তেমনি আজ দেশ আমাদের প্রীতির পরিণতির পথে দাঁড়াইবার একটি সাময়িক স্থান মাত্র। এ স্থান ছাড়িতে হইবে, আরও আগে চলিতে হইবে, অনেক পথ এখনো সম্মুখে আছে—এখনি ডাক উঠিয়াছে, উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত,

প্রাপ্যবরান্নিবোধত—এ পথের সেই সীমা, সেই শ্রেষ্ঠ পরিণতি সমগ্র মানবে প্রীতি ; ভূগোল অবহেলা করিয়া, নদী পর্ব্বত সাগর মহাসাগরের সীমা লঙ্ঘন করিয়া যে সমাজ, তাহাতে আপনাকে পাইতে হইবে, দেশাত্মবোধ অতিক্রম করিয়া ভগবানের অপূর্ব্ব-বিধানে আমাদের সেই মহাদেশে সেই মহাসমাজে আত্মবোধ জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে।

সেদিন এখনো আসে নাই, সে পরিণতি এখনো সুদূরে। এখনো আমরা দেশাত্মবোধকেই সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারি নাই। এত বড় সমাজকে এখনও আপনার সহিত সম্পূর্ণ এক করিয়া দেখিতে পারি না। তাহা না করিতে পারিলে জগতের সহিত আপনাকে এক করিয়া দেখিতে এবং সেই জ্ঞান লইয়া জীবনকে নিয়মিত করিতে কেমন করিয়া পারিব ? মুখে কথাটা বলা সহজ যে, সকল মানুষ আমার ভাই, সমস্ত জগৎ আমার সমাজ ; কিন্তু সেই বুদ্ধি মনের ভিতর কার্য্যকরীরূপে জাগ্রত করা ঠিক তেমনি কঠিন। মুখের বড় কথা অনেক সময় ছোটখাট কর্ত্তব্য করিতে আলস্যের উপর গিলটি চড়ান মাত্র। আমি আমার পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য করিতে পারি না, হয়তো তাহার কারণ আলস্য বা প্রকৃত প্রীতির অভাব বা তেমনি আর কিছু। কিন্তু আমি যদি খুব বুদ্ধিমান হই তবে লোকের কাছে দেখাইতে হইবে যে আমার অপকার্য্যের হেতু অতি মহৎ। যদি আমার মনে বিবেক কিছু উপদ্রব করে তবে তাহার চোখেও ধূলা দিতে হইবে। ইহা করিতে হইলে বড় কথা দিয়া আমার নীচ কাজকে ঢাকা দেওয়াই প্রকৃষ্ট এবং সহজ উপায়। ভাইয়ের অসুখে সেবা করিব না, ভয়ে কিম্বা অনুরাগের অভাবে, কিন্তু লোকের কাছে নন্দলালের মত বলিতে হইবে

"ভাইয়ের জন্য প্রাণটা যদি বা দি
তা না হয় দিলাম, কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কি ?"

দেশের সেবার নাম করিয়া অনেকে এমন ছোটখাট কর্ত্তব্যের হাত হইতে রেহাই পাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন—কেবল পরকে বুঝাইবার জন্য নয়, হয়তো নিজেকেও সেইরূপ বুঝাইয়া থাকেন। তেমনি দেশের কাজ করিতে যাহারা নারাজ, দেশের প্রতি সে প্রীতি যাহাদের নাই, তাহারাও অনেক সময় দেশকে ফাঁকি দিবার জন্য মানব-সমাজের একত্বের দোহাই দিয়া থাকেন। জীবনে আমরা নিজের মনকে নানা স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া অনেক সৎকার্য্য হইতে বিরত হইয়া থাকি—দেশের সেবায় বিরত থাকিয়া অনেক সময় অনেকের মনকে প্রবোধ দিবার উপায়স্বরূপ হয় মানব সমাজের একত্ব।

ইহা যে কেবল অন্যায় তাহা নহে, ইহা অসত্য। দেশের সেবার সঙ্গে মানবসমাজের একত্ববোধের প্রকৃত কোনও বিরোধ নাই। তোমার প্রীতির পরিসর যতই হউক না কেন, তোমার কার্য্যের ক্ষেত্র সর্ব্বদাই সীমাবদ্ধ। তোমার সেবার ক্ষেত্র তোমার সমাজ; তোমার চারিপাশে যে-সকল লোক আছে, যাহাদের সঙ্গে তোমার নিত্য ব্যবহার তাহাদের প্রতি কর্ত্তব্য তোমার যত বড় আদর্শই হউক না তাহার একটা অত্যাজ্য অঙ্গ। তোমার আদর্শ যত বড় হইবে সে কর্ত্তব্য তত মহৎ হইবে, তাহার অর্থ তত গভীর হইবে, তাহা পালনের গৌরব তত বৃদ্ধি পাইবে। দেশ এমন একটা সমাজ যাহার ভিতর তোমার কর্ত্তব্যের খুব বেশী ভাগ আবদ্ধ থাকিবেই। মানবসমাজের হিত যদি তোমার লক্ষ্য হয়, তবে সে হিতসাধন সম্বন্ধে তোমার আদর্শ যাহাই হউক, সে আদর্শ কার্য্যতঃ আয়ত্ত করিতে হইবে প্রধানতঃ তোমার দেশবাসীকে

দিয়া। সুতরাং তুমি দেশপ্রেমিকের আদর্শ উত্তীর্ণ হইয়া থাকিলেও দেশের সেবা ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। দেশের সেবার সাধারণ যে আদর্শ তাহার সহিত তোমার বিরোধ থাকিতে পারে, দশ জনে যে কাজ দেশের মঙ্গলের জন্য কর্ত্তব্য বিবেচনা করে তুমি তোমার উন্নত আদর্শ লইয়া হয়তো তাহাকে অকরণীয় বিবেচনা করিতে পার, কিন্তু যদি তোমার আদর্শ কেবল মুখের কথা না হয় তবে তোমাকে তোমার আদর্শ ও বিবেচনা অনুসারে দেশবাসীর সেবা করিতেই হইবে।

বাঙ্গলার যুবকসম্প্রদায়ের মধ্যে দেশসেবার একটা প্রকৃত প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। এই সাধু আকাঙ্ক্ষা যেরূপ বিস্তৃত ও যেরূপ গভীর ভাবে ছাত্র ও যুবকসমাজে দেখা যায় তাহাতে ইহা যদি সুপথে ও সদ্বিবেচনার সহিত পরিচালিত হয় তবে ইহা হইতে পরম সুফল লাভ হইবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। দেশের সেবা করিতে হইবে, কিন্তু কোন্ পথে যাইব, কোন্ কাজ করিব, কি সাধনা করিব, এ কথা সকলে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না, আর যাহারা কাজ করিতে আসিয়াছে তাহাদের অনেক সময় এসব কথা খুব ভাবিয়া দেখিয়া কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিয়া লওয়ার সময়ও হয় না। কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া কর্ত্তব্যের একটা সুনির্দ্দিষ্ট নকসা করিয়া লইলে কাজের অনেকটা সুবিধা হয়, শক্তির অপচয় অনেকটা কমিয়া যায়।

এমন একদিন ছিল যখন দেশের সেবা বলিতে প্রধানতঃ লোকে বুঝিত দেশের জন্য যুদ্ধ করা। দেশের জন্য যুদ্ধে প্রাণদান করার যে গৌরব ছিল তাহার প্রধান কারণ এই যে যখন এ আদর্শ গঠিত হয় তখন যুদ্ধ করাটাই দেশের সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজন ছিল। যখন ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে নিরন্তর যুদ্ধ হইত তখন দেশের আত্ম

রক্ষাই প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল এবং দেশের রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে যে অগ্রসর হইত সেই ধন্য বিবেচিত হইত। আজ সেদিন নাই। যদিও এখন ইউরোপে দারুণ লোকক্ষয়কর মহাসমর চলিতেছে তথাপি এ কথা অংসশয়ে বলা যাইতে পারে যে আজকালকার সমাজে যুদ্ধটা একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার নহে এবং দেশের হিতকামীরা যুদ্ধ বিগ্রহ অপেক্ষা অপরাপর হিতকর বিষয়েই অধিক চিন্তা করিয়া থাকেন। কাজেই যুদ্ধের গৌরব এখনো যথেষ্ট থাকিলেও অনেকটা সখের হইয়া আসিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে যুদ্ধ এখনো জগৎ হইতে লোপ পায় নাই, এখনো সকল দেশেরই আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন আছে। যতদিন এ প্রয়োজন আছে ততদিন আমাদেরও দেশের জন্য যুদ্ধ করা গৌরবের বস্তু থাকিবে, এবং প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত থাকা দেশসেবা বলিয়া পরিগণিত হইতে বাধ্য। কিন্তু ইহা দেশের সেবার একটি উপায় মাত্র, তাহার কেবলমাত্র উপায় নহে। পরিণতির সহিত মানব-সমাজ ক্রমশঃই অধিক জটিল হইয়া উঠিয়াছে, সমাজের ক্রিয়া বহুমুখী হইয়াছে, সেবার ক্ষেত্রও বহু পরিমাণে বিস্তৃত ও বহুদ্বারক হইয়াছে। দেশসেবার সেই নানা পন্থার মধ্যে দেশের জন্য যুদ্ধ করা একটি মাত্র পথ।

এই কথাটি সকল সময় আমাদের মনে থাকে না যে দেশের সেবার নানা পন্থা আছে। সমাজের যত প্রকারের প্রয়োজন আছে ঠিক ততপ্রকার সেবার উপায় আছে। সে প্রয়োজন বৃহৎ হউক, ক্ষুদ্র হউক, সেই প্রয়োজন পূরণ করা দেশের সেবা বলিয়া পরিগণিত হইবে। এমন কি, এক হিসাবে ইহাও বলা যাইতে পারে যে মানুষ মাত্রেই দেশের সেবক। সমাজের সেবা দেশের সেবাই জীবন। প্রত্যেক মানুষের জীবন বিশ্লেষণ

করিলে দেখা যাইবে যে প্রত্যেকেই জীবনের বেশী ভাগ সমাজের সেবায় ব্যয় করে। মানুষ ঠিক নিজের জন্য খুব সামান্য কাজই করে, বেশীর ভাগ কাজ করে অপরের জন্য। অতি দীন-হীন যে মজুর সে রোজগারের জন্য কাজ করে, সে-কাজে পরের কোনও একটা অভাব মোচন হয়—রোজগারের টাকা সে খরচ করে বেশীর ভাগ স্ত্রী-পুত্র-কন্যার জন্য—ইহাদের প্রতিপালন করিয়া সে প্রকৃত-প্রস্তাবে সমাজেরই কাজ ও কর্ত্তব্য পালন করে। বাস্তবিক মানবজীবন ও মানবচরিত্র এমনভাবে গঠিত যে সমাজের সেবা ছাড়া মানুষ বাঁচিতেই পারে না, নিজের সুখের জন্য তাহার দেশের সেবা করিতেই হইবে।

তবে না জানিয়া সেবা ও জ্ঞানকৃত সেবায় তফাৎ আকাশ-পাতাল। আমরা চাই সেবার ইচ্ছায় সেবা। অজ্ঞানে সেবা সবাই করে; গৌরব শুধু তাহারই যে জানিয়া শুনিয়া সেবা করে; সেবার জন্য আত্মত্যাগ করে।

যাহারা সজ্ঞানে দেশের সেবা করে তাহাদের যে নিতান্তই একটা প্রকাণ্ড জাঁকাল রকমের কাজ করিতেই হইবে তাহা নহে। সেবার গৌরব সেবার আকাঙ্ক্ষায়, সেবার সৌকর্য্যে; সেবা-কার্য্যের পরিসর বা চাকচিক্যে নয়। বরং গৌরব তাহারই বেশী যাহার কাজে চাকচিক্য নাই জাঁকজমক নাই, যে এই সংসার-নাট্যশালার পর্দ্দার আড়ালে কাজ করে, ফুট-লাইটের সম্মুখে আসিয়া করতালি অর্জ্জন করিতে চাহে না। যে কাজের উপর লোকের খুব নজর থাকে, যাহাতে খ্যাতি লাভ করা যায়, দেশের লোকের সম্মান অর্জ্জন করা যায়, সে-কাজের জন্য বরং লোকের অভাব হয় না, কিন্তু যে কাজ খুব নীচে, লোকচক্ষুর অগোচরে করিতে হয়, যাহাতে কর্ত্তব্য করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করা ছাড়া

অন্য কোনও পুরস্কার নাই, সেকাজের কর্ম্মী বড় অধিক মিলে না ; কিন্তু তাই বলিয়া তাহার প্রয়োজন কম নহে, বরং অনেক সময় অধিক। মন্দিরের চূড়ার স্বর্ণকলস সকলের চোখে ঝকমক করে, কিন্তু লোকচক্ষুর অগোচরে মাটির তলে ভিত্তির মূলে যে ইঁটখানি আছে তাহার সৌভাগ্য কম হইলেও মন্দিরটি রক্ষার জন্য তাহার প্রয়োজন কাহারও অপেক্ষা কম নহে। অথচ সে যদি স্বর্ণকলসের সহিত সমান গৌরব লাভ করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে, তবে স্বর্ণকলসকে সে ভূতলশায়ী করিবে ও নিজেও ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

এই কথা দেশের সেবাকাঙ্ক্ষী যুবকের বিশেষ স্মরণ রাখা আবশ্যক। দেশের কাজ যদি করিতে চাও তবে সৌখীন কাজের দিকে বেশী ঝুঁকিও না। তোমার হাতের কাছে যে ছোট কাজটি আছে তাহা লইয়াই তোমার সেবা আরম্ভ করিতে হইবে, সেকাজ ছোট হইতে পারে কিন্তু তাহার ফলে তুমি যে উপকার করিবে তাহা হয়তো কোনও উপকার অপেক্ষা হীন নহে। মনে রাখিও দেশ বলিয়া কোনও একটা abstract বা বস্তুনিরপেক্ষ জিনিষ নাই, দেশের মানুষ লইয়াই দেশ। সে মানুষ যেখানে আছে সেইখানেই তোমার সেবার ক্ষেত্র আছে। তুমি দেশের মানুষের যে উপকারটুকু করিবে সেটা যে অতি সামান্য বা সাধারণ তাহাতে কুণ্ঠিত হইও না। সামান্য হউক, সাধারণ হউক সমাজের পক্ষে তাহার ষোল আনা প্রয়োজন আছে। তুমি যদি একজন পথভ্রান্ত পথিককে পথ বলিয়া দেও বা সাধারণের চলিবার পথ হইতে কাঁটাটি সরাইয়া দেও, তাহা হইলেও তুমি দেশের উপকার করিতেছ এরূপ মনে করিতে পার। চারিদিকে চাহিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে তোমার আশেপাশে জীবনের

প্রতিমুহূর্ত্তে এরূপ অসংখ্য সেবার অবসর রহিয়াছে। সেইসব কাজ তোমাকেই করিতে হইবে। তাহা অপেক্ষা বড় কাজ করিতে পার করিও, কিন্তু ছোট বলিয়া কোনও সেবার কাজকে অবহেলা করিও না। সকলে যদি এইসব ছোট কাজ ফেলিয়া বড় কাজের নিষ্ফল সন্ধানে ফেরে, তবে বড় কাজ কোনও কাজের হইবে না, ছোট কাজটিও মাটি হইবে।

অতি সামান্য অতি নগণ্য কাজ, এমন কি যে কাজকে লোকে নিতান্ত স্বার্থপরের কাজ বলিয়া মনে করে তাহাও দেশের কাজে লাগিতে পারে। নিজের কাজ করা এবং তাহার জন্য পরের কাজ করিতে না যাওয়া স্বার্থপরতা হইতে পারে, কিন্তু নিজেকে একেবারে অবহেলা করিলেই যে দেশের কাজ করা হয় তাহাও নহে। দেশের জন্য মরিলে গৌরব আছে যদি মরার প্রয়োজন থাকে, কিন্তু যেখানে বাঁচাটাই বেশী দরকার সেখানে মরার কোনও গৌরব নাই। সময়ে সময়ে দেশের জন্য বাঁচারই বেশী আবশ্যক হয়। শুধু বাঁচা নয়, নিজের উন্নতি করাটাও অনেক সময়ে নিজের মঙ্গলামঙ্গল বিষয়ে উদাসীন হওয়ার চেয়ে দেশের পক্ষে বেশী হিতকারী হইতে পারে। নেলসন বা ওয়েলিংটন কিম্বা পিট বা গ্ল্যাডষ্টোন ইংলণ্ডের যে পরিমাণ হিত করিয়াছেন, সেক্সপীয়ার বা মিলটন, নিউটন বা ডারউইন তাহা অপেক্ষা অল্পহিত করিয়াছেন একথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। কিন্তু সেক্সপীয়ার যদি থিয়েটার ছাড়িয়া পার্লামেন্টের সদস্য হইয়া দিন রাত "দেশের কাজ" করিতেন, মিলটন যদি নৌসেনায় নাম লেখাইতেন, ডারউইন যদি চার্টিষ্টের দলে আন্দোলন করিয়া বেড়াইতেন বা নিউটন যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেন তবে তাঁহারা তাঁহাদের দেশের জন্য বেশী করিতেন কি? তোমার ভিতর যদি

এমন কিছু থাকে যাহাতে পরিণত অবস্থায় তুমি দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারিবে, তবে সেই শক্তিকে বর্দ্ধিত ও পূর্ণ পরিণত করাই তোমার পক্ষে প্রধান কর্ত্তব্য হইবে এবং সেই আত্মোন্নতির চেষ্টায় যদি তুমি দেশের আর দুই দশটা কাজ না করিয়াও থাক তবে তাহাতে তোমার সেবার গৌরবে কিছু ব্যাঘাত হইয়াছে এমন কথা বলা চলিবে না। শুধু অসাধারণ শক্তিশালী মহাপুরুষগণেরই যে আত্মোন্নতির দ্বারা দেশের সেবা করা হয় তাহা নহে, এক হিসাবে প্রত্যেকের পক্ষেই আত্মোন্নতির চেষ্টা দেশসেবারই একটি অত্যাজ্য অঙ্গ। দেশের হিতের জন্য প্রত্যেকেরই সাধ্যের সীমা পর্য্যন্ত কার্য্য করা উচিত। তুমি অপরিণত বুদ্ধি বা অপরিণত শক্তি লইয়া যে কার্য্য করিতে পারিবে, সেই শক্তি ও বুদ্ধির সাধনা দ্বারা উৎকর্ষ সম্পাদন করিলে তুমি তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান দেশকে দিতে পারিবে, তোমার সেবার মূল্য অনেকটা বাড়িয়া যাইবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ শক্তিসাধ্যের চরমোৎকর্ষ সম্পাদন করিয়া দেশকে সেই শক্তি ব্যবহার করিতে দিতে বাধ্য। সুতরাং একথা সত্য যে self-culture বা আত্মোন্নতিও দেশের সেবার একটি উৎকৃষ্ট পন্থা।

যেখানে নানা পথ সম্মুখে মুক্ত রহিয়াছে সেখানে বিরোধ ও সংশয় অবশ্যম্ভাবী। নিজের উন্নতি যেমন দেশের জন্য কর্ত্তব্য, আর্ত্তের সেবাও তেমনি কর্ত্তব্য। যখন এই উভয় কর্ত্তব্যে বিরোধ হয় তখন কোন্ পথ শ্রেয় বলিয়া অবলম্বন করিতে হইবে? ইহার সহজ উত্তর এই যে সংশয়ের স্থলে ত্যাগের পথই শ্রেষ্ঠ। সাধারণ ভাবে একথা অত্যন্ত সত্য। যেখানে আত্মতুষ্টি ও আত্মত্যাগে বিরোধ, সেখানে ত্যাগের পথই কর্ত্তব্য হিসাবে নিরাপদ, নহিলে হয়তো বা আমরা দেখিতে

পাইব যে আমরা নন্দলালের মত একটা পণ করিয়া বসিয়াছি যে

"দেশের তরে যা' ক'রেই হোক রাখিবই এ জীবন।"

কিন্তু সব সময় একথা সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। এমন অবস্থা অনায়াসে কল্পনা করা যাইতে পারে যেখানে আত্মরক্ষার পথই দেশের পক্ষে শ্রেয়। রবার্ট ব্রুস পলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া দেশের সেবায় তিনি পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন একথা কেহ বলিবে না।

আসল কথা এই, যে দেশের কাজ বলিয়া কাজের কোনও মার্কা-মারা বিশেষ শ্রেণী নাই। প্রায় সব কাজই দেশের কাজ। কাপড়-বোনা জুতা-সেলাই মোট-বওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় দেশের বিধি ব্যবস্থা প্রণয়নে সহায়তা করা পর্য্যন্ত নিজের জন্য বা পরের জন্য যে কোনও কাজ করা যায় সকল কাজই দেশের কাজ হইতে পারে। প্রভেদটা কাজের মধ্যে নাই, প্রভেদ সেই কাজের অন্তরালে কর্ম্মকর্ত্তার মনের ভিতর। যে কাজ করিতেছি তাহা যদি দেশের সেবা করিবার ইচ্ছায় এবং সেবা করিতেছি এই বুদ্ধিতে করি তবেই তাহা দেশ-সেবা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়াছেন যে নিষ্কামভাবে ধর্ম্মবুদ্ধিতে যে কার্য্য করিবে সে কার্য্য যাহাই হউক না কেন তাহাই ধর্ম্ম। আত্মীয়-বধ সামাজিক অমঙ্গল সাধন প্রভৃতি যত প্রকার অনিষ্ট তাহা হইতে হউক না কেন তুমি যদি সে কার্য্য ধর্ম্ম করিতেছি জানিয়া কর তবে তাহাই ধর্ম্ম। সেইরূপ দেশের সেবা করিতেছি জানিয়া তুমি যে কাজই কর না কেন, সে কাজ যত কেন স্বার্থপরের মত দেখা যাক না, তাহার দ্বারা তুমি দেশসেবার গৌরব লাভ করিবে।

এ কথা যদি সত্য হয় তবে দেশ-সেবকের কাছে আমরা চাই কি? চাই—ঐকান্তিক নিষ্ঠা, সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ ও আত্মবিলোপ। আর চাই—ধীরবুদ্ধি, শান্তচিত্ত, রাগদ্বেষের একান্ত অভাব। চাই—সেই নিষ্ঠা যাহা ইবসেনের Brandএর মত all or none এই নিয়মে সমস্ত জীবনকে নিয়মিত করিতে পারে, যাহা দেশের প্রয়োজনে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে পারে। চাই—সেই আত্মত্যাগ যাহা অহঙ্কার একেবারে লুপ্ত করিয়া দিয়াছে, যাহা কোনও কার্য্যে দেশের মঙ্গল হইতে ভিন্ন করিয়া আপনার মঙ্গল কল্পনা করিতে পারে না, দেশের জন্য আশা ছাড়া নিজের জন্য কোনও ইচ্ছা করিতে পারে না। চাই—সেই আত্মবিলুপ্তি যাহাতে নিজের সুখদুঃখ রাগদ্বেষ তৃপ্তি-অতৃপ্তি অহঙ্কার-অভিমান সব দেশের পায়ে নিবেদন করিয়া দিয়াছে। কিন্তু শুধু ইহাতে চলিবে না—তোমার প্রবৃত্তির উৎকর্ষেই দেশসেবায় তোমার উৎকর্ষ লাভ হইবে না—বুদ্ধির উৎকর্ষও সম্পাদন করিতে হইবে। নিরন্তর চেষ্টার দ্বারা, অধ্যয়ন বিবেচনা ও গবেষণা দ্বারা দেশের মঙ্গলামঙ্গল প্রয়োজন-অপ্রয়োজন সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে হইবে, অপ্রমত্ত চিত্তে সমুদয় আবশ্যক অবস্থা বিচার করিয়া দেশের মঙ্গলামঙ্গল নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যেটা তোমার ভাল লাগে সেইটাই যে দেশের পক্ষে সত্যসত্যই ভাল একথা মনে করিও না। ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখ সেটা ভাল কি না, খুব ভাল করিয়া দেখ যে যে সিদ্ধান্ত তুমি করিয়াছ তাহা কেবল বুদ্ধির ফল, তোমার রাগদ্বেষ-প্রসূত নহে। যাহা এইরূপ বিবেচনায় দেশের মঙ্গলজনকরূপে দাঁড়ায় সেই কার্য্য তোমার কর্ত্তব্য হইবে, তাহাতে তুমি মনপ্রাণ একান্তভাবে নিযুক্ত কর।

বুদ্ধি ভগবান সকলকে সমান দেন নাই। দেশের হিতাহিত অনুসন্ধানে উচ্চ অঙ্গের বিদ্যার প্রয়োজন, সে বিদ্যা যত্নের সহিত অনুশীলন করিতে হয়। Politics, Economics, Jurisprudence, Sociology প্রভৃতি বিদ্যা যে কেহ অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারে না। অথচ এ সমুদয় বিদ্যা দেশের হিতাহিত বিবেচনার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। যদি তোমার সে অধিকার না থাকে তবেই যে তুমি দেশের সেবার কার্য্য হইতে বঞ্চিত হইবে এরূপ মনে করিও না। যে-সমুদয় বড় বড় প্রশ্ন এই বিদ্যার সাহায্য ছাড়া সমাধান করা যায় না, তুমি কেবল সেই সমুদয় কার্য্যে অগ্রসর হইতে সঙ্কুচিত হইবে—তাহাতে তোমার অগ্রসর হওয়া অবিবেচনার কার্য্য হইবে; কিন্তু এমন শত শত ছোটখাট কাজ আছে যাহার জন্য এত বেশী বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন নাই—সেই কাজ একান্ত নিষ্ঠার সহিত করিয়া তুমি দেশসেবার সম্পূর্ণ গৌরব লাভ করিতে পারিবে।

হিন্দুশাস্ত্রে সকল বিদ্যানুশীলনে সকল কার্য্যের প্রারম্ভে অধিকারী বিচার করা হয়। সকলেই সকল কাজ করিতে পারে না। যাহা যাহার শক্তির সাধ্য সেই অনুসারে তাহা সম্পন্ন করিয়াই সে ধর্ম্ম করিতে পারে। যেভাবে এই অধিকারী-বিচারতত্ত্ব এখন সমাজে প্রচলিত আছে তাহা অত্যন্ত দূষণীয়, কিন্তু ইহার গোড়ার কথাটা অত্যন্ত খাঁটি। দেশের সেবা সম্বন্ধেও এই অধিকারী-ভেদ মানিতে হইবে, প্রত্যেককে নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে—অধিকার অতিক্রম করিয়া কার্য্য করিতে গেলে কাজ ভাল হইবে না।

আর একটা প্রয়োজনীয় কথা এই যে সব কাজের মত দেশ-সেবারও একটা সাধনা চাই। সখের খেলোয়াড়ের মত দেশ-সেবা

লইয়া খেলা করিলে কোনও কাজই হইবে না—দেশ-সেবায় লাগিয়া পড়িয়া থাকিলে তবেই তুমি একটা কিছু সত্যসত্য ভাল কাজ করিতে পারিবে। তোমার কার্য্যের ক্ষেত্র নির্ণয় করিয়া তোমাকে আগে আপনাকে সেই কার্য্যের জন্য উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে, যে শিক্ষার প্রয়োজন তাহা লাভ করিতে হইবে, যে শক্তির প্রয়োজন তাহার সাধনা করিতে হইবে; নিজেকে আগে তৈয়ার না করিয়া কাজে হাত দিলে শুধু কাজ পণ্ড হইবে। তাই বলিতেছিলাম, দেশসেবার জন্য একটা সাধনা চাই। অভ্যাস দ্বারা শক্তি ও কর্ম্মপটুতা বৃদ্ধি করিতে হইবে, অধ্যয়ন ও অনুশীলন দ্বারা তোমার বুদ্ধিকে শাণিত করিতে হইবে, ঐকান্তিক ধ্যান দ্বারা তোমার চিত্তে সর্ব্বদা সেবার প্রবৃত্তি প্রবল করিয়া রাখিতে হইবে। ইহা না করিতে পারিলে তোমার সেবা নিষ্ফল হইবে।

এই কথাটা আমাদের দেশে সকলে স্মরণ রাখেন না ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। আমাদের দেশে বর্ত্তমান কালে এইরূপ ঐকান্তিক সাধক ও সেবক সুলভ নহে। আমাদের দেশে যে খুব তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও অনুরাগ সত্ত্বেও দেশের সেবাকার্য বিশেষ ফলপ্রসূ হইতেছে না এই ঐকান্তিক সাধনার অভাবই তাহার কারণ। আমরা বেশীর ভাগ উত্তেজনার দাস, আমাদের সাধনার অভাব আমরা উত্তেজনা দিয়া পূরণ করিতে চাই। কিন্তু একটা হাউইয়ের আগুন যতই তীব্র বা প্রবল হউক না তাহার দ্বারা ভাত রাঁধা চলে না। দেশের কোনও স্থায়ী মঙ্গল করিতে হইলে সাময়িক উত্তেজনার উপর নির্ভর করা বাতুলতা; কোনও একটা ভাল কাজ করিতে গেলে দীর্ঘকাল তাহাতে তা দিতে হয়, অধীরতায় তাহা পণ্ড হয় মাত্র।

এই নিষ্ঠা, এই ঐকান্তিকতা, এই যে একটা কাজে লাগিয়া পড়িয়া থাকিবার ক্ষমতা, ইহা আমরা পাইব কোথা হইতে? স্বদেশপ্রেম যতই প্রবল হউক না কেন আমাদের মনের ভিতর এই আগুন চিরদিন সমভাবে জ্বালাইয়া রাখিবার সাধ্য শুধু তাহার দ্বারা হয় না যদি তাহার পশ্চাতে ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক আস্থা ও তাঁহার ধর্ম্মনিয়মে স্থির বিশ্বাস না থাকে; যদি আমরা সত্যসত্য বিশ্বাস করি যে এই জগতের ভিতর ভগবানের ধর্ম্মরাজ্য অনুস্যূত আছে, যদি এই জ্ঞান অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া প্রত্যেক চিন্তা ও প্রত্যেক চেষ্টার ভিতর সর্ব্বদা ইহা জাগ্রত রাখিতে পারি, তবেই আমরা পাইতে পারি এই ঐকান্তিক নিষ্ঠা, এই অটুট চেষ্টা, সুখদুঃখে সমান এই শান্তি; তবেই আমরা তাঁহার আশীর্ব্বাদ বলিয়া সকল শাস্তি সকল দুঃখ মাথায় তুলিয়া লইতে পারি, তবেই পারি আমরা নিষ্ফলতায় না ভাঙ্গিয়া পড়িয়া সফলতায় শান্ত থাকিয়া অচল অটল সংকল্প লইয়া তাঁহার কেতন বহন করিতে, ফলাফল তাঁহার হাতে দিয়া তাঁহার মঙ্গল-অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে জীবনকে নিয়মিত করিতে; তবেই আমরা করিতে পারি প্রকৃত স্বদেশসেবা। ভগবানে এই বিশ্বাস, তাহার ধর্ম্ম-রাজ্যে এই আস্থা, যদি না থাকে তবে দেশের প্রকৃত সেবা ফলাফল অবহেলা করিয়া স্থির নিষ্ঠার সহিত কেহ চিরদিন করিতে পারে না। দেশের কাজ অনেক সময় অনেকে অন্য ভাব অন্য লক্ষ্য লইয়া করিয়া থাকেন, কিন্তু সে সেবায় এ ঐকান্তিকতা এ নিষ্ঠা কখনও থাকিতে পারে না।

মনে রাখিও যে ভগবান মাথার উপরে আছেন, মনে রাখিও যে দেশের সেবায় লোকের সেবায় তুমি তাঁহার কাজ করিতেছ, মনে রাখিও তাঁহার ধর্ম্মরাজ্যের তুমি এক ক্ষুদ্র সৈনিক। অধর্ম্ম

করিয়া, তাঁহার মঙ্গলনিয়ম অবহেলা করিয়া ক্ষণিক সুবিধা লাভ করিতে পার, তোমার চিত্তে ক্ষণিক তৃপ্তি পাইতে পার, কিন্তু ভগবানের ধর্ম্মরাজ্যে অধর্ম্মের দ্বারা কোনও স্থায়ী ফললাভ হইতে পারে না। সুতরাং যদি প্রকৃত স্বদেশ-সেবক হইতে চাও তবে ধর্ম্ম ছাড়িয়া কখনও অধর্ম্ম করিও না, সেবা ছাড়িয়া কখনও হিংসা করিতে যাইও না, ভালবাসা ছাড়িয়া কখনও ঘৃণা করিতে যাইও না। যদি তুমি ধর্ম্মপথে অক্ষুণ্ণ থাকিয়া থাক, যদি তোমার স্বদেশ-প্রীতি ও স্বদেশ-সেবার ভিতর অধর্ম্মের ভেজাল না থাকে, যদি নির্ম্মল পবিত্র চিত্ত দেশের সেবায় উৎসর্গ করিয়া থাক, তবে কিছুতেই তোমার ভয় নাই, কোনও ত্যাগে তুমি সঙ্কুচিত হইবে না, কোনও নিষ্ফলতায় বিচলিত হইবে না, কঠিনতম দুঃখভোগে ভীত হইবে না, ভগবানের ধর্ম্মনিয়মে শেষে তুমি চরম সফলতা লাভ করিবার স্থির বিশ্বাসে শান্তচিত্তে তাঁহার আশীর্ব্বাদের প্রতীক্ষা করিতে পারিবে।

ইহাই স্বদেশপ্রেমিক ও স্বদেশসেবকের আদর্শ। যদি আমরা দেশের প্রকৃত হিতসাধন করিতে চাই তবে এই আদর্শ আমাদের আয়ত্ত করিতে হইবে, চিত্তের এই অবস্থা আমাদের লাভ করিতে হইবে। যদি আমাদের হৃদয় এইরূপ ভাবে গঠিত করিয়া তুলিতে পারি তবে আমাদের কাজের ক্ষেত্রের জন্য খুঁজিয়া ফিরিতে হইবে না।

কাজ তো চারিদিকে পড়িয়া রহিয়াছে, আমাদের এ দরিদ্র অবনত দেশ, পরানুগৃহীত পরমুখাপেক্ষী এ দেশ, রোগশোকের লীলাভূমি এ দেশ, ইহার সেবার শত পন্থা খোলা রহিয়াছে। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র আছে যাহারা দুবেলা দুমুঠা অন্ন খাইতে পায় না, দেশের সেবা যদি করিতে চাও তবে

ইহাদের মুখে অন্ন তুলিয়া দাও; ভিক্ষার অন্ন নয়, পরিশ্রমের পুরস্কার যে অন্ন তাহা দিয়া ইহাদের অভাব দূর করিয়া মনুষ্যত্ব স্ফুরিত কর। গ্রামে গ্রামে পীড়িতের আর্ত্তনাদ। প্রত্যেকে নিজ গ্রামে পীড়িতের শুশ্রূষার আয়োজন কর, এমন ব্যবস্থা কর যাহাতে দরিদ্র রোগী চিকিৎসা পায়। এমন আয়োজন কর যাহাতে সর্কলে গৃহদ্বার পরিষ্কার রাখে, জঙ্গল বাড়িতে দিয়া বাসগৃহকে ভয় ও পীড়ার আশ্রয় না করে, যাহাতে লোকে সুপরিষ্কৃত পানীয় পাইতে পারে, যাহাতে পচা ডোবা দূর হয়। অন্ধ অজ্ঞতায় লোক আচ্ছন্ন—যাও তাহাদের শিক্ষা দাও, লেখাপড়া শিখাও, আর শিখাও তাহাদিগকে স্বাস্থ্যনীতি, শিখাও তাহাদিগকে বাঁচিবার ও সমৃদ্ধ হইবার উপায়। সর্ব্বত্র দেখিতে পাইতেছ দরিদ্রকে নিপীড়িত করিয়া ধনী, ছোটলোককে পীড়িত বঞ্চিত করিয়া ভদ্রলোক সমৃদ্ধ হইতেছে, দরিদ্রের বন্ধু হইয়া তাহাদের সহায়তা কর। ইহার জন্য যে কার্য্য করিতে হইবে তাহা যে সহজসাধ্য একথা আমি বলিতে চাহি না, কিন্তু যদি আমরা সবাই সঙ্কল্প করি যে প্রত্যেকের যতটুকু সাধ্য করিব, তবে কার্য্য যে খুব বেশী কঠিন হইবে এরূপ মনে করি না।

আর একদিক হইতে দেখ, দেখিতে পাইবে আমাদের এ দেশ বড় দরিদ্র; ইহাকে সমৃদ্ধ করিতে চেষ্টা কর, জগতের মুখ্য ব্যক্তিদিগের ন্যায় দেশকে ধনগৌরবে গৌরবান্বিত কর। দেশের ধন নানা লোকের হাত হইতে লইয়া নিজের হাতে সংগ্রহ করিয়া তুমি ধনী হইলে দেশের কোনও উপকার করা হইবে না, দেশের কয়েকটি লোক ধনী হইলে কিছু আসিয়া যায় না। আমাদের চাই দেশের ধনবৃদ্ধি—দেশের আপামরসাধারণের সমৃদ্ধি! সে সমৃদ্ধির উপায় শিল্প ও বাণিজ্য। তোমরা কি জান না ধনের

কি শক্তি, কি সম্মান, জান না কি ধনীর কি আধিপত্য ? দেশের জন্য কি করিবে ভাবিয়া অস্থির না হইয়া, নানা অসম্ভব কল্পনা নানা মরীচিকার সন্ধানে বৃথা সময়ক্ষেপ ও শক্তির অপব্যয় না করিয়া যদি দলে দলে তোমরা শিল্পবাণিজ্যে নিযুক্ত হইয়া দেশের সম্পদ বৃদ্ধি কর, তবে তোমরা দেশের যে উপকার করিবে তাহা অন্য কোনও প্রকার সেবা অপেক্ষা কোনও ক্রমে ন্যূন হইবে না। শিল্পবাণিজ্যে নিযুক্ত হইবার পথে নানা বাধাবিঘ্ন আছে। বাঙ্গালী শিল্প-বাণিজ্যে অধিক সফলতা লাভ করিতে পারে নাই—এ কথা সত্য। কিন্তু যদি সত্যসত্যই এ বিষয়ে তোমার অনুরাগ থাকে, যদি শিল্পবাণিজ্যে শিক্ষানবিসী করিতে, নিম্নতম স্তরে অতি তুচ্ছ কাজ হইতে আরম্ভ করিতে তোমার আপত্তি না থাকে, তবে দেখিতে পাইবে যে শিল্প-বাণিজ্যে অভ্যুদয় অতি সহজসাধ্য।

আমাদের এ দেশ শুধু ধনে দরিদ্র নহে, জ্ঞানেও দরিদ্র। আমরা সময়ে অসময়ে সর্ব্বদাই বলিয়া থাকি যে ভারতবর্ষ জ্ঞানে গরীয়ান্। এ কথা যে বলে সে হয় মূর্খ, না হয় অন্ধ। অতীত কালে আমাদের দেশ জ্ঞানজগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল সত্য; সাহিত্যে দর্শনে গণিতে বিজ্ঞানে শিল্পে ভারত অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। সেই অতীতের গৌরব লইয়া আস্ফালন করিবার অবসর আমাদের তখনই হইবে যখন আমরা আমাদের বর্ত্তমানকে সে অতীত অপেক্ষা অধিক গৌরবান্বিত করিতে পারিব। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান কি সে অতীতের যোগ্য ? সভ্যসমাজে জ্ঞানের জগতে আমাদের স্থান আজ কোথায় ? বাণীর মন্দিরের নিম্নতম সোপানেও যে আমাদের জাতির এখনও অধিকার হয় নাই। যে কোনও বিদ্যার উচ্চতর স্তরে উঠিলেই তোমরা দেখিতে পাইবে যে জ্ঞানের সাম্রাজ্য আজ কত সুবিস্তৃত,

কত শতসহস্র পণ্ডিত তাহার নানা ক্ষেত্রে আজ কাজ করিতেছে, নানা খনি খনন করিয়া জ্ঞানের অপূর্ব্ব মণিমাণিক্যসকল সংগ্রহ করিতেছে। এই সাম্রাজ্যে আমাদের অধিকার বিস্তার করিবার জন্য আমরা কি করিয়াছি ? এই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের শত লক্ষ কর্ম্মীর মধ্যে আমরা একটি কি দুইটি ক্ষুদ্র কর্ম্মী পাঠাইয়া কি তুষ্ট থাকিব ? তাহাতে কি আমাদের দেশ জগতের নিকট সম্মান লাভ করিতে পারিবে ? এখানে তোমাদের বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র রহিয়াছে, জ্ঞানের যে কোনও শাখার অনুশীলন করিয়া যদি তোমরা জগতকে সেই বিদ্যার কোনও নূতন সন্ধান দিতে পার তবে তোমরা তোমাদের মাতৃভূমির গৌরব প্রকৃতই বৃদ্ধি করিতে পারিবে এবং প্রকৃত স্বদেশসেবক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে। কে আছ মাতৃভূমির কৃতীসন্তান, কে আছ মায়ের অনুরক্ত সেবক, এস এই ক্ষেত্রে, তোমার দেশকে জ্ঞানে মণ্ডিত করিয়া সমস্ত জগৎকে অবনত মস্তকে তাহার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করাইবার জন্য চেষ্টিত হও, তোমাদের চেষ্টার ফলে দেশের সমূহ উন্নতি হইবে।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে কি ধনের ক্ষেত্রে যে কেহ প্রকৃত দেশপ্রেমিক সেবক হইবে তাহার একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে—সেটি এই যে, আদর্শকে কোনও মতে ক্ষুণ্ণ করিও না, ছোটখাট কোনও কাজ করিয়া পরিতৃপ্ত হইও না, সামান্য কার্য্য করিয়া মহৎ কার্য্যের সম্মান লাভ করিবার জন্য লোলুপ হইও না। আমার মনে হয়, আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় অমঙ্গলের কারণ আমাদের আদর্শের খর্ব্বতা। আমাদের কল্পনার দৌড় খুব বেশী দূর যায় না। যে কোনও দিকেই যাই না কেন আমরা খুব উচ্চ আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া অগ্রসর হই না, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পদবী লাভের চেষ্টা করি না। দুটো চলনসই বক্তৃতা করিয়া আমরা ডিমসথেনিসের চালে চলিতে

চাই। ব্যবস্থাপক সভায় একটা সামান্য প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া পিট গ্ল্যাডষ্টোনের সম্মান লাভ করিতে চাই। বিজ্ঞানের একটা ক্ষুদ্র মৌলিক গবেষণা করিয়া মনে করি অন্ততঃ একটা ডারউইন কি কেলভিনের কাজ করিয়া বসিয়াছি। আমাদের দেশে পণ্ডিত-সমাজেও খুব উচ্চশিক্ষার অভাব-বশতঃ আমরা অল্প কাজে বড় পুরস্কারলাভ করিয়াও থাকি। একটা বিলাতী কাগজে আমার প্রবন্ধের প্রশংসা বাহির হইলে আহ্লাদে দেশের লোক অস্থির হইয়া যাইবে, আমিও তাই লইয়া খুব খানিকটা হৈ চৈ করিব—যদিও সে প্রশংসা হয় তো বিলাতের একটা পঞ্চমশ্রেণীর লেখকের প্রশংসার চেয়ে কিছুই উচ্চ নহে। আমাদের আদর্শ ক্ষুদ্র বলিয়াই আমরা দেশবাসীর প্রশংসা অপেক্ষা বিলাতী যেমন-তেমন প্রশংসার জন্য লোলুপ হইয়া থাকি।

যদি আমাদের প্রকৃত উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে তবে আমরা এরূপ অল্পে কিছুতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। যে পর্য্যন্ত না এমন একটা কিছু করিতে পারি যাহাতে জগতের পণ্ডিতসমাজের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে স্থান গ্রহণ করিতে পারি সে পর্য্যন্ত নিজে আত্ম-প্রসাদ বা পরের প্রশংসায় সন্তোষ লাভ করিতে পরিব না, অজ্ঞ সমালোচকের অন্ধ চাটুকারিতায় মুগ্ধ হইব না, কেবল আমাদের দেশের দশজনের চেয়ে বড় হইয়াই খুসী হইব না। মনে রাখিও জ্ঞানের জগৎ আজ একটা বিশ্বব্যাপী সমাজ। এখানে কূপমণ্ডুক হইয়া থাকিলে চলিবে না, জ্ঞানের মহাসমুদ্রে অবলীলাক্রমে সন্তরণ করিতে হইবে। আমার দেশের মানদণ্ড যদি ক্ষুদ্র হয় তাই বলিয়া আমার বাণীর মন্দির আমি খাটো করিতে পারি না; আমার বিদ্যার বহর ব্যাঙের হাতের পাঁচ হাত হইল বলিয়া গর্ব্বে বুক ফুলাইতে পারি না। জ্ঞানের মন্দিরে যে ব্যক্তি ভারতের জন্য

গৌরব লাভ করিতে চাহিবে তাহার সাধনা ও সিদ্ধির একমাত্র মানদণ্ড জগতের পণ্ডিতসমাজের সাধারণ মানদণ্ড; যদি আমি যাহা করিয়াছি তাহা সমস্ত জগতে সমাদৃত ও সমস্ত জগতের চক্ষে শ্রেষ্ঠ হয় তবেই আমার কাজকে বড় কাজ বলিয়া গণ্য করিতে পারিব, তবেই আমি আমার মাতৃভূমিকে গৌরবান্বিত করিতে পারিয়াছি বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিব—তবেই আমি দেশের একটা সেবার মত সেবা করিয়াছি বলিতে পারিব।

শুধু জ্ঞানের রাজ্যে নয়, দেশসেবার সকল ক্ষেত্রে আমাদের এই আদর্শের উচ্চতা রক্ষা করিয়া তাহার তুলনায় আমাদের কার্য্যের পরিমাপ করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের কোনও ক্ষেত্রেই এই আদর্শের উচ্চতা পরিলক্ষিত হয় না। বলিতে গেলে এ পর্য্যন্ত আমরা দেশের কাজের কেবল এক ক্ষেত্রেই নিযুক্ত আছি—সে রাজনীতিক্ষেত্র। আমাদের রাজনৈতিক নেতাদিগের মুখে আমরা সর্ব্বদাই শুনিতে পাই যে বাঙ্গালী এক্ষেত্রে অনেক কাজ করিয়াছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে এক্ষেত্রে আমাদের করিবার যত আছে তাহার কিছুই আমরা করি নাই। রাজনীতির নানাবিভাগের মধ্যে সকলটিই আমরা কেবল স্পর্শ করিয়া গিয়াছি; তেমন নিষ্ঠার সহিত, একাগ্রতার সহিত, কোনও একটি বিভাগে এমন কোনও কাজ করি নাই যাহাতে বেশী আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারি। অন্য দেশের কথা ছাড়িয়া দিলেও বোম্বাই বা মাদ্রাজে রাজনৈতিক কর্ম্মীরা প্রকৃত কার্য্যে যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন আমরা বাঙ্গালীরা ততদূরও যাই নাই।

আসল কথা এই যে আমাদের প্রধান দোষ যে আমরা কোনও কাজের ভিতর ডুবিয়া পড়িতে পারি না, কেবল ভাসিয়া বেড়াইতে চাই। আমাদের সে একাগ্রতা সে শ্রমপটুতা নাই যাহা ছাড়া

কোনও কাজই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। গায়ে ফুঁ দিয়া সৌখিন ভাবে কাজ করিলে কাজ সুসম্পন্ন হয় না। নেতা হইবার জন্য, সখের যাত্রার দলে রাজা সাজিবার ইচ্ছায় দেশের সেবার সখ করিলে চলিবে না। কিন্তু যাহার ভিতর থাকে সেই হোম-বহ্নি—যাহাতে দেশের পূজার জন্য নিজের যথাসর্ব্বস্বকে আহুতি দিতে প্রস্তুত করে, যাহার থাকে সেই পণ যাহাতে সে যে পথে আসিতেছে তাহার শেষ না দেখিয়া ছাড়িবে না, যদি এ সংকল্প থাকে যে পর্ব্বতের চূড়ায় না যাইয়া ফিরিবে না, তবেই তাহার এই ব্রত ধারণের জন্য অগ্রসর হওয়া উচিত। সম্মুখে বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র, আমাদের কাঙ্গাল দেশ প্রভূতভাবে ত্যাগী কর্ম্মপটু নিষ্ঠাবান বীর সেবকের জন্য সজল নয়নে প্রতীক্ষা করিতেছেন, পণ করিতে হইবে মায়ের সে অশ্রু আমরাই মুছাইব; আমাদের দেশবাসী দুঃখে কষ্টে জর্জ্জরিত—প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে তাহাদের দুঃখ আমি দূর করিব; আমাদের দেশ জগতের সভ্যসমাজে ধনে মানে জ্ঞানে অন্ত্যজ-তুল্য হইয়া রহিয়াছে; প্রতিশ্রুত হইতে হইবে যে গৌরবের শীর্ষস্থানে তাহাকে আমারাই উঠাইব। পরের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, আমাদের দেশের দুঃখ অপরে দূর করিতে পারিবে না, এক ভগবানকে আশ্রয় করিয়া, ধর্ম্ম সম্বল করিয়া, নিজেদের সাধ্যের সীমা পর্য্যন্ত দেশের সেবা করিবে এই সংকল্প করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে; আমাদের দেশমাতৃকা আমাদিগকে নিরন্তর আহ্বান করিতেছেন—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।

প্রবাসী—চৈত্র-১৩২৩

॥ আহ্বান ॥

অনেকগুলো ভারী কাজের বোঝা মাথায় নিয়ে ব'সেছিলাম—ঠিক সেই সময় রঙ্গপুর জেলার ছাত্র সম্মিলনীর পক্ষ থেকে নিমন্ত্রণ পেলাম, এই সভার নেতৃত্ব ক'রতে।

এ নিমন্ত্রণে আমি উল্লসিত হ'লাম।

কিছুদিন থেকে আমার মনটা ব্যাকুল হ'য়েছিল, বাঙ্গালার যুবকদেরকে সামনাসামনি কতকগুলো কথা বলবার জন্য—সে কথা এমন ভাবে বলবার সুযোগ পেয়ে আমি কৃতার্থ হ'য়ে গেলাম। কাজ থেকে অবসরের প্রতীক্ষা করতে ইচ্ছা হ'ল না।

বন্ধুগণ, তোমরা আমাকে এই সুযোগ দিয়েছ ব'লে আমি যে কত কৃতজ্ঞ, তা' আর বেশী ব'লবার দরকার নেই।

অনেকগুলো কথা মনের ভিতর ভীড় ক'রে আসছে; আমার অনেক স্বপ্ন, অনেক আকাঙ্ক্ষা তোমাদের জীবনের ভিতর মূর্ত্তি গ্রহণের আশায় প্রকাশের জন্য ব্যাকুল হ'য়েছে। সব কথা বলবার সময় নেই—দিনের পর দিন চ'লে গেলেও সব কথা বিশদ ক'রে হ'য় তো ব'লে উঠতে পারবো না।

আমি তোমাদেরকে শুধু ছাত্ররূপে, শুধু রঙ্গপুর জেলার যুবক-রূপে দেখছিনে, আমি দেখছি তোমরা বাংলাদেশের যুবক, ভারতের যুবক—ভারতের ভাবী জাতির একটা অংশ, বিশ্বমানবের ভবিষ্যতের আংশিক ন্যাসধারী!

এই কথাটা সম্যক তোমরা আয়ত্ত ক'রতে পার কি? এই চিন্তা তোমাদের জীবনের ভাঙ্গাগড়ার স্বপ্নে, তোমাদের কর্ম্মে, তোমাদের চিন্তায় তোমাদের সর্ব্বদা উদ্বুদ্ধ করে কি?

আমি চাই বাঙ্গালাদেশের যুবক সমাজের ভিতর এই

আত্মজ্ঞান। ভারতের সুদূর অতীতে মহামনস্বী তত্ত্বজ্ঞ ঋষিরা ব'লে গেছেন, তুমি মানব—যত ছোটই হও তুমি ছোট নও, তুমি ব্রহ্ম। ছোট ব'লে তুমি যে আপনাকে ভাব, সে তোমার মায়া। সেই মায়াকে যত ভাঙ্গবে, যতই আপনাকে ব্রহ্ম ব'লে জানবে, ততই তুমি বড় হবে, ততই মোক্ষের পথে অগ্রসর হবে। তোমার ভিতর তোমার ছোট ব্যক্তিত্ব আছে, সেখানে তুমি ছোট ; কিন্তু তোমার ভিতর—তোমার এই সসীম ব্যক্তিত্বের ভিতরই প্রকাশ হ'চ্ছে অসীম ;—সেইখানে তুমি বড়—সেই কথা তোমায় জানতে হবে, সেই জ্ঞানে তুমি মহীয়ান হবে, সেই জ্ঞানে শক্তিমান হবে।

ছোট্ট মানুষ আমরা, ক্ষুদ্র আমাদের পরমায়ু—সঙ্কীর্ণ আমাদের শক্তি—কতটুকুই বা ক'রতে পারি আমরা! কিন্তু আমাদের দৃষ্টির এই ক্ষুণ্ণ সঙ্কুচিত পরিসরের সীমা ভঙ্গ ক'রে যদি বিশ্বজীবনের ভিতর আমাদের স্থান আমরা আয়ত্ত ক'রতে পারি, যদি চোখের সামনে ধ'রে দেখতে পারি আমাদের এই বিশ্বজীবনের ভিতর function এর প্রকৃত স্বরূপ, তবে আর আমাদের এ ক্ষুদ্রত্ব বোধ থাকবে না।

কোথায় কে কোন্ দিন এক মুষ্টি water hyacinth এর বীজ এনে তার ছোট্ট জলাশয়ে ছেড়ে দিয়েছিল, তার ফুলের শোভায় মুগ্ধ হ'য়ে! অযত্নে অনাদরে সে ফেলে দিয়েছিল গাছ-গুলো, যখন শুকিয়ে গেল ফুল। কোথায় সে তুচ্ছ বীজ গেল, কেউ তো খোঁজ নেয়নি, নেবার দরকার মনে করে নি। হাওয়ায় সে উড়ে গেল, জলে ভেসে গেল—দেখতে দেখতে সে বীজ কচুরী পানায় ছেয়ে ফেল্লে বাঙ্গালার লক্ষ লক্ষ পল্লীর বিল দীঘি জলাশয়, —বন্ধ ক'রে দিলে তার নদীর স্রোত। জীবনের এমনি স্বভাব!—

এর প্রত্যেকটি অংশ জীবন্ত। জীবন থেকে জীবন প্রসূত হয় ছোট ক্রমে বড় হয়, বীজ হ'য়ে পড়ে গাছ।

আমাদের দেহটাই যে শুধু সজীব তা নয়, আমাদের মনটা তার চেয়েও বেশী সজীব। আমাদের প্রত্যেকটা কথা, প্রত্যেকটি কাজ সজীব—প্রত্যেকটি এক একটি কচুরী পানার বীজের মত অদৃষ্ট পথে ছড়িয়ে বিচিত্র প্রণালীতে বিকাশ লাভ করে। যাঁরা বড় লোক, তাঁদের বড় বড় কথা যে বিশ্বের জীবনে কত বড় ফল প্রসব করে তার প্রমাণের অভাব নেই। কিন্তু অতি ছোট মানুষের অতি ক্ষুদ্র কথা—অবহেলায় আমরা যা করি বা বলি, সেই সব তুচ্ছ কথা, সেও যে অমনি নষ্ট হ'য়ে যায় না, সে কথাটা আমরা সব সময় স্মরণ করি না।

আমাদের প্রত্যেকের জীবন সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ ক'রলে দেখতে পাব যে, আমাদের মানসিক জীবনটা কত বেশী পরিমাণে এই সব তুচ্ছ, অবহেলায় উচ্চারিত কথা—অবহেলায় করি যে কাজ, তাই দিয়ে নিয়মিত হ'য়েছে। একজন যে কথা ব'লে শেষ ক'রে দিলেন, একজনের ভিতর যে প্রবৃত্তিটা কাজে সমাপ্ত হ'য়ে গেল, দ্রষ্টা ও শ্রোতার মনের ভিতর গিয়ে তার নতুন জীবন আরম্ভ হ'ল—হয় তো বা সেই কথাই তার জীবনটা গ'ড়ে তুললো ;—তার ফল তার মুখের কথায়, আচরণে চারদিকে ছড়িয়ে প'ড়লো। ছড়িয়ে প'ড়লো, হয় তো কোনও একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নয়—তার সূত্র ধ'রে যদি আমরা যেতে পারি, তবে হয় তো দেখতে পাব যে সেই তুচ্ছ কথার অগণিত বংশ যুগযুগান্তর ধ'রে দেশ হ'তে দেশান্তরে ছ'ড়িয়ে প'ড়ে বিশ্বমানবের জীবনে নানা বিচিত্র ধারায় ফুটে উঠেছে।

বুদ্ধ, প্লেটো, খৃষ্ট, মহম্মদ—এঁরা তাঁদের ক্ষুদ্র জীবনে কটাই বা

কথা ব'লে গিয়েছিলেন ;—সেই কথা থেকে প্রসূত হ'য়েছে বর্ত্তমান জগতের অধ্যাত্ম-জীবনের, ব্যবহারিক-জীবনের, চিন্তা-জীবনের ও কর্ম্ম-জীবনের বিরাট মূর্ত্তি! এ কথা কে না জানে? কিন্তু যেটা কেউ জানে না, সেটা হ'চ্ছে সেই সব তুচ্ছ লোকের তুচ্ছ কথা যাতে ক'রে এই সব মহাপুরুষদের জীবন ও চিন্তাধারা গঠিত হ'য়ে উঠেছিল। কোন এক অজানা সারথি জরাগ্রস্ত এক বৃদ্ধকে দেখে বুদ্ধকে ব'লেছিল কি একটা সাধারণ কথা ;—মহাপুরুষের বৃহৎ আত্মায় সেই তুচ্ছ কথার প্রতিঘাতে যে বিরাট চিন্তার ধারা প্রবাহিত হ'য়েছিল, তার ফল বর্ত্তমান বিশ্বজীবনের একটা প্রকাণ্ড অংশ। আমরা বুদ্ধের কাছে জগতের এ ঋণের সংবাদ জানি ; কিন্তু সেই সারথির কথা ও কাজ, সেই জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের তুচ্ছ জীবন, এই সব তুচ্ছ কর্ম্মের কাছে আমাদের ঋণটা না জানি, না স্বীকার করি।

এই সব ছোট ছোট কথার বড় বড় ফল যে শুধু মহাপুরুষদেরই জীবনে ঘটে তা নয়, আমাদের প্রত্যেকের নগণ্য জীবনের তলায় ডুবুরী হ'য়ে নামতে পারলে আমরা দেখতে পাব যে আমাদের জীবন, চিন্তা ও কর্ম্ম কত আশ্চর্য্য রকমে নিয়ন্ত্রিত হ'য়েছে এমনি সব ছোট-খাট কথা দিয়ে। আমাদের মানব জীবনের বিকাশ হ'চ্ছে বাইরে থেকে অবিশ্রান্ত ভাবে উপকরণ সংগ্রহ ও সমীকরণ ক'রে ; জীবনের বিকাশের পক্ষে তার কোনটাই একেবারে নিষ্ফল নয়। হয় তো, যে কথা আমি শুনিই নি, কিম্বা শুনে থাকলেও তখনি ভুলে গেছি ব'লে মনে হয়, সে কথাটাও যে আমার জীবন স্রোত থেকে বেরিয়ে যায় নি, আমার অসংবিদের ভিতর নিষ্পিষ্ট থেকে সে আমার জীবনও নিয়মিত ক'রেছে—তার বিস্ময়কর প্রমাণ বের ক'রেছেন আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিকেরা।

কিন্তু কথাটা স্বীকার ক'রবার জন্য মনোবিজ্ঞানের কোনও গুহাহিত তত্ত্বের সহায়তার দরকার নেই, আমাদের সংবিদের ইতিহাস আলোচনা ক'রলেই আমরা সেটা প্রত্যেকেই জানতে পারবো।

আমার জীবন থেকে আমি একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আমি যখন বিহারের একটা সামান্য স্কুলে থার্ড ক্লাস থেকে প্রমোশন পেয়ে উঠলাম, তখন আমি গর্ব্বে স্ফীত হ'য়ে আমার এক আত্মীয়কে ব'লেছিলাম "আমি ফার্ষ্ট হ'য়েছি।" তিনি কথাটা শুনে ব'ল্লেন "মোতিহারী স্কুলে ফার্ষ্ট হ'য়েছ তো ব'য়ে গেছে। হ'তে হবে ইউনিভার্সিটিতে ফার্ষ্ট—তবে বুঝবো।" আমার সে আত্মীয় সামান্য কেরাণী—এণ্ট্রান্স ফেল। তিনি সেই যে সেদিন কথাটা ব'লেছিলেন, তা হয় তো ভুলেও গেছেন। কিন্তু আমি ভুলি নি—কথাটা আমার জীবনে খুব প্রকাণ্ড ফল সৃষ্টি ক'রেছে। সেই দিন আমার দৃষ্টিটা সঙ্কীর্ণ মোতিহারী স্কুলের সীমা উত্তীর্ণ হ'য়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর ব্যাপ্ত হ'য়ে প'ড়েছিল; তারপর সে দৃষ্টি আরো প্রসারিত হ'য়ে গেছে। জীবনে হয় তো আমি কিছু ক'রতে পারি নি, পারবো না, কিন্তু এ কথা আমি স্পর্দ্ধা ক'রে বলতে পারি যে, আমার জীবনের কাজের পরিমাণ আমি কোনও ছোট আদর্শ দিয়ে বিচার করি না—বিশ্বের সাধারণ যে মানদণ্ড তাই দিয়ে পরিমাপ ক'রতে হবে আমার কথা ও কাজ; সে মানে যদি তা বড় হয়, তবেই তা বড়, তাতে ছোট হ'লে তা ছোট। এই অনুভূতি আমার সমগ্র জীবনকে নিয়মিত ক'রেছে—কিন্তু আমার ভিতর যে এই অনুভূতি ক্রমে ক্রমে স্ফুরিত ও বিকশিত হ'য়ে উঠেছে, তার মূল আমার আত্মীয়ের সেদিনকার সেই ছোট কথা। আর আজ যদি আমি তোমাদেরকে এমন কোনও কথা বলি যাতে

হয়তো তোমরা ভাবতে থাকবে, সে কথা তোমাদের বিভিন্ন চিত্তে বিভিন্ন চিন্তা প্রবাহ সৃষ্টি ক'রে বিচিত্র পরিণতি লাভ ক'রে নানা ধারায় হয়তো তোমাদের বন্ধু বান্ধব সন্তান সন্ততি, প্রতিবেশী পরিজন থেকে আরম্ভ ক'রে ক্রমে সকলের অজ্ঞাত সূত্র ধারণ ক'রে, বিশ্বের চিন্তা প্রবাহের ভিতর স্থান পেয়ে যাবে, তবে জানবে যে সে কথার সুদূর একটি উৎস আছে সেদিনকার সেই তুচ্ছ কথায়।

বিশ্বমানবের মনোজীবনকে খুব ব্যাপক ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে এ কথা খুব স্পষ্ট ক'রেই মনে হবে যে, দেখতে যদিও আমরা বহু, অসংখ্য সীমাবদ্ধ দেহের ভিতর আটকে র'য়েছে আমাদের কোটি কোটি বিচ্ছিন্ন মন, তবু সব মিলে সেটা একটাই বৃহৎ মন। সে মনের বিরাট যুগ যুগান্তরব্যাপী জীবনের ভিতর ভেদ আছে, কিন্তু পূর্ণচ্ছেদ কোথাও নেই। এ একটা বিরাট প্রবাহ, যা সৃষ্টির আদি থেকে চ'লছে— অনন্ত কাল চ'লবে, যার ভিতর ধারা এসে প'ড়ছে নানা দিক দিয়ে। নানা ধার দিয়ে আবার সে প্রবাহ ভেঙ্গে যাচ্ছে —কিন্তু চ'লেছে একটা অবিশ্রান্ত স্রোত। সেই চিত্ত প্রবাহের ভিতর আমরা এক একটা বিশিষ্ট প্রবাহ। আপনাকে মনে ক'রছি সীমাবদ্ধ জলাশয়, কিন্তু, আদিতে অন্তেতে মধ্যে সব কটা ইন্দ্রিয়ের সহস্র ছিদ্র দিয়ে অজ্ঞাতসারে রক্ষা ক'রছি সেই বিশ্বপ্রবাহের সঙ্গে সংযোগ। পঞ্চদশীকার ব'লেছেন, মায়া ও অবিদ্যায় আচ্ছন্ন ব্রহ্মের দুটি রূপ, ব্যষ্টিভাবে তিনি পুরুষ, সমষ্টিভাবে মহেশ্বর। বিশ্বের এই বিরাট জীবন-প্রবাহ সেই মহেশ্বর। লোষ্ট্রস্তুপের মত সমষ্টি এ নয়—এ ঠিক সেই রকম সমষ্টি যেমন সমষ্টি আমার দেহ। শরীর-তত্ত্ববিদেরা জানেন যে আমাদের এই দেহ কোটি কোটি জীবাণুর সমবায়। প্রত্যেকটি সজীব cellএর একটা স্বতন্ত্র জীবন

আছে; কিন্তু তাদের সমবেত জীবনেই আমাদের জীবন। আমরা এই মহেশ্বরের জীবনে এমনি সব cell মহা-জীবনের জীবাণু।

এই অনুভূতি যদি তোমরা তোমাদের প্রত্যেকের জীবনে জাগ্রত ক'রে তুলতে পার, তবে তোমাদের জীবন থেকে নির্ব্বাসিত হবে ক্ষুদ্রত্ববোধ—প্রত্যেকে আপনার জীবনকে খুব বড় ক'রে দেখতে পারবে। তখন বুঝতে পারবে, যত ছোট, যত নগণ্য কেন হই না আমরা, আমরা সবাই আমাদের সমাজজীবনের, বিশ্বজীবনের অপরিহার্য্য অংশ। আমরা প্রত্যেকে আমাদের প্রতি-দিনের প্রতি কার্য্য প্রতি কথায় সমাজের জীবন, বিশ্বের জীবন প্রকাশ ক'রছি, আর তার ভবিষ্যৎ নিয়মিত ক'রছি; ব্যর্থ হয় তো মনে হ'চ্ছে আমার কাজ—একেবারে নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে হয় তো আমার জীবন, কিন্তু বিশ্ব জীবনের ভিতর তা' কত বিচিত্ররূপে সার্থক হচ্চে, তা আমরা জানিনে—জানবার উপায় আমাদের নেই—কিন্তু তা' যে হ'চ্ছে সে নিশ্চয়।

এই অনুভূতি তোমাদেরকে আপনার চোখে মহৎ ক'রে তুলবে, মহৎ কাজে প্রেরণা দেবে, নীচতায় তোমাদেরকে পরাঙ্মুখ ক'রবে। —নিজের জীবনটাকে তুচ্ছ ব'লে নষ্ট করা আর চ'লবে না; এ কথা বলা চ'লবে না যে আমি আমার নিজেকে নিয়ে যাই করি তাতে কার কি ব'য়ে যায়! এই অনুভূতি তোমাদেরকে প্রবুদ্ধ ক'রবে সমাজ-জীবনের অনুকূল ক'রে জীবনযাপন করার জন্য। এই অনুভূতিই ব্যবহারিক জীবনের মহাকাব্য—তত্ত্বমসি—ছোট নও তুমি, তুচ্ছ নও;—তুমি মহেশ্বর। এই অনুভূতি তোমাদের জীবনকে নূতন অর্থ, নূতন সম্পদে গরীয়ান ক'রে তুলবে।

এ কেবল মন ভুলান কথা নয়, কাব্য-কথা নয়—অনুভবের

অতীত গভীর তত্ত্বও নয়। এটা আমার সাক্ষাৎ অনুভূতি ;—আর যে কেউ এই কথা আয়ত্ত ক'রবার চেষ্টা ক'রবে সেই এটা সাক্ষাৎ-ভাবে উপলব্ধি ক'রতে পারবে, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আর এটা এমন একটা তত্ত্ব কথা নয় যেটা পোষাকী কাপড়ের মত তাকে তুলে রেখে নিশ্চিন্ত ভাবে কাজ করা যেতে পারে। এটা আটপৌরে জীবনের একটা নীতি, রোজকার ব্যবহারিক জীবনে এর প্রয়োজন আছে। দুঃখ দৈন্যের ভিতর এই চিন্তায় পাবে শান্তি, নৈরাশ্যের ভিতর এতে পাবে উৎসাহ। এই অনুভূতি মনে জাগ্রত থাকলে বুঝতে পারবে যে—

জীবনে যত পূজা হয় নি সারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা
যে ফুল না ফুটিতে, ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী গিরিপথে হারাল ধারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।

বিশ্বের জীবনের দিকে চেয়ে দেখ, বিশ্ব-জীবনের এই একত্ব-বোধ প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ হ'য়ে কত বিচিত্রভাবে কর্ম্মে মূর্ত্তিমান হ'য়ে উঠেছে। Internationalism কথাটা সবাই শুনেছ। রাজনীতির ভিতর এই বিশ্ব-জাতীয়তার আদর্শ বেশী করে ফুটিয়ে তোলবার জন্য একটা চেষ্টার কথা আজ অনেক শোনা যাচ্ছে। সেটা হয় তো কথার কথা। সন্দেহবাদী ব'লবে যে এসব ভূয়ো ;—মুখে মুখে যারা বিশ্ব-জাতীয়তার কথা বলছে, কাজে তারা ক'রছে আন্তর্জাতিক বিরোধ! হয় তো তা হ'তে পারে—হয় তো League of Nations এর পোনেরো আনাই ফাঁকি—হয় তো রাজনীতিক্ষেত্রে বিশ্ব-জাতীয়তার আবির্ভাব এখনও সুদূরপরাহত। কিন্তু রাজনীতির বাইরের জীবনের দিকে চেয়ে দেখলে আর

সন্দেহ থাকবে না যে বিশ্বজীবনের ভিতর জাতীয়তার গণ্ডী অনেক দিনই ভেঙ্গে গেছে—শুধু রাজনীতির ভিতর সেই অসত্য অতীত আপনার নষ্ট সত্তা আজও স্বীকার ক'রতে চাচ্ছে না। কিন্তু অন্নবস্ত্রের সমস্যা পূরণে আজ বিশ্বের ভিতর জাতীয়তার ছেদ নাই, ভাব ও চিন্তা জগতে এ গণ্ডী কোনও দিনই ছিল না। যতই দিন যাচ্ছে, রেল, মোটর, এয়ারোপ্লেনে জগৎটা যতই পরস্পরের কাছাকাছি হ'য়ে প'ড়ছে, এ বিষয়ে জগতের আদান প্রদান ততই নিবিড়তর হ'চ্ছে। বিশ্ব-জীবনের এই সুনিবিড় একীকরণের দিনে আমরা এখনও কি ভাবরাজ্যে, কি কর্ম্মরাজ্যে, আমাদের কূপমণ্ডুকের স্বভাব ছাড়তে পারি নি। সমস্ত বিশ্বজুড়ে যে একটা প্রকাণ্ড ভাব ও কর্ম্মপ্রবাহ চলছে, যাতে সমস্ত জগৎটার চেহারা ফিরিয়ে দেবার জন্য সব দেশের লোক উঠে প'ড়ে লেগে গেছে তার ভিতর কোমর বেঁধে কাজে লাগবার আগ্রহ আমাদের বড় কম। কাজে লাগা দূরে থাক, তার খবর রাখাও আমাদের বড় একটা অভ্যাস নেই। বাইরের জগতে যেখানে ঝড় ব'য়ে যাচ্ছে, তার একটা মৃদু স্পর্শমাত্র আমাদের দেশে এসে পৌঁছায় না; বাইরে যেখানে প্রকাণ্ড হট্টগোল, তার ক্ষীণ প্রতিধ্বনিটুকুও আমাদের বধির কর্ণে প্রবেশ করে না। সমস্ত বিশ্বের যে সব সাধারণ সমস্যা সমাধানের বিচিত্র চেষ্টা নানা দেশে হ'চ্ছে, তার নিঃশ্বাস মাত্রও আমাদের দেশে আসতে পায় না।

কথাটা ব'লতে আমার বড় দুঃখ হয়—স্বীকার ক'রতে লজ্জা হয়, কিন্তু কথাটা সত্য যে, আমাদের সমস্ত জাতটার দৃষ্টিক্ষেত্র এখনও সীমাবদ্ধ হ'য়ে র'য়েছে এই ছোট দেশটার মধ্যে। আমাদের দেশে কোনও কিছুর চরম গালাগাল হ'চ্ছে এই যে সেটা বিদেশী। আমাদের চিন্তারাজ্যে বিদেশী মালের আমদানী

একেবারে না হ'চ্ছে তা নয়—আসছে পচা মাল। বিলাতে যেটা পুরোনো হ'য়ে জীর্ণ ব'লে পরিত্যক্ত হ'য়ে গেছে, সেইটা পরম সমাদরে অঙ্গের ভূষণ ক'রে নিতে আমাদের বাধে না; কিন্তু নূতন টাট্‌কা কিছু আমদানী ক'রলেই তার বিদেশী গন্ধে আমাদের নাক টাটিয়ে ওঠে।

জ্ঞানে, ভাবে, কর্ম্মে আমরা যে এমনি ক'রে আমাদের মনটাকে দেশের চৌহদ্দী দিয়ে সীমাবদ্ধ ক'রে রেখেছি, তাতে আমাদের দেশের চিত্ত যে কতটা দরিদ্র হ'য়ে যাচ্ছে, সেটা, বাইরের খবর যে কেউ রাখে, সেই অনুভব ক'রতে পারে। আমার একটি বন্ধু একজন লোকের কথা গল্প করেন, তিনি থাকতেন এই উত্তর বাঙ্গলারই একটা সহরে—ক'লকাতায় কোনও দিন যান নি। কেউ যদি তাঁকে ব'লতো, "আপনি একবার গিয়ে ক'লকাতা দেখে আসুন." তিনি ব'লতেন, "কি আর দেখবো ক'লকাতায়? এখানে পাঁচখানা বাড়ী আছে, ক'লকাতায় না হয় দেড়শোখানা আছে, এখানে দশখানা পাকা বাড়ী আছে, ক'লকাতায় হয় তো একশো খানা আছে এই তো?" আর একটি লোক পাড়াগাঁ থেকে ক'লকাতায় গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে গিয়ে তার চেষ্টা শুধু হ'ল ক'লকাতার তুলনায় তার দেশটাকে খাটো না করা। একদিন মিউজিয়াম দেখিয়ে তাকে বলা হ'ল, "তোদের দেশে এত বড় বাড়ী আছে?" সে অমনি বল্লে, "কি বলেন? আমাদের জমীদার বাড়ী এর চেয়ে ছোট নয়।" আর গাড়ী ঘোড়া মোটর গাড়ী যা' কিছু তাকে দেখান যেতো, সবই সে উড়িয়ে দিত যেন এ সব তুচ্ছ।

আমাদের সমস্ত দেশটার বিশ্ব সম্বন্ধে মনের ভাব কতকটা এই দুজনের মত। হয় আমরা জানতেই চাই না, না হয় তাকে দেশের

কাছে খাটো করবার জন্য প্রাণপণ করি। এর নাম কি patriotism ? এই জাতীয় patriotism আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ ক'রতে ব'সেছে। ভাবতে আমার কান্না পায় যে, যে দেশের লোক সভ্যতার শৈশবে দেশ থেকে বেরিয়ে গিয়ে গ্রীস থেকে জাপান পর্য্যন্ত নিজের সভ্যতা ছড়িয়ে দিয়েছিল, সেই দেশের লোক আমরা—আজ জগৎকে দেবার আমাদের কিছুই নেই, কোনও নূতন বার্ত্তা তাদের শোনাবার শক্তি আমাদের নেই। শুধু তাই নয়, বাইরে থেকে গ্রহণ করবার শক্তি পর্য্যন্ত আমরা হারিয়ে ব'সেছি। এখন বিশ্বের দরবারে আমাদের দেখাবার জিনিস মিউজিয়াম থেকে সংগ্রহ ক'রতে হয়, মাটির তলা থেকে খুঁড়ে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মৃতদেহ দেখিয়ে আমাদের কোনও মতে মুখরক্ষা ক'রতে হয়।

আমার যদি শক্তি থাকতো, তবে আমি সমস্ত জাতটার মাথা ধরে মোচড় দিয়ে তার চোখ ফিরিয়ে দিতাম বিশ্বের দিকে।

"ও আমার দেশের মাটি,
তোমার পরে ঠেকাই মাথা"

কথাটা ভাল। কিন্তু তার উপর মাথা লুটিয়ে পড়ে থাকলেই তো সে মাটির উপকার হবে না। দেশের পূজা করতে হলে উপচার আহরণ ক'রতে হবে সমস্ত বিশ্ব থেকে—প্রসাদ বিতরণ ক'রতে হবে সমস্ত বিশ্বে। সমস্ত বিশ্ব যে দিন দেশের পূজা-মন্দিরে প্রসাদপ্রার্থী হ'য়ে দাঁড়াবে, সেই দিনই বুঝবো যে আমাদের পূজা সার্থক হ'য়েছে।

তার জন্য সবার আগে এই প্রয়োজন যে, আমাদের সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ সাধন ক'রতে হবে। দুনিয়ার

কোথায় কি হ'চ্ছে তার সম্বন্ধে সজাগ ও সতর্ক সন্ধান রাখতে হবে; যেখানে যে রত্ন আবিষ্কৃত হ'য়েছে তাকে আহরণ ক'রতে হবে, যাচাই ক'রতে হবে; বিচার ক'রে তাকে দেশমাতৃকার মুকুটে বসাতে হ'বে।

সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অগ্রসর হ'তে হবে আমাদের;— বিশ্বের জ্ঞানী, গুণী, কর্মীদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে হবে অশ্রান্তগতিতে অনির্দ্দিষ্ট সুদূরের লক্ষ্য লাভের চেষ্টায়; তবেই না আমরা দেশের সেবায় গৌরব লাভ ক'রবো।

কিন্তু বিশ্বের সঙ্গে সমান ক্ষেত্রে দাঁড়াবার চেষ্টা দূরে থাক, তার যথেষ্ট খবরও আমরা রাখা আবশ্যক মনে করি না। আমাদের গভর্ণমেণ্ট থেকে আরম্ভ ক'রে আমাদের মাঠের চাষী পর্য্যন্ত সবাই যেন প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'সে আছে যে, যেটা জোর ক'বে চোখের সামনে এসে না দাঁড়াবে তাকে দেখবো না, জানবো না। তাই আমাদের দেশের সমস্ত শিক্ষাপদ্ধতি বর্ত্তমান জগতের জ্ঞানদানে এত কৃপণ; তাই আমাদের শিক্ষিত দেশবাসী অন্ধের মত অন্ধ নেতাদের অনুসরণ করে; আর দেশের দরিদ্রের দল সুনিবার্য্য কারণে দলে দলে তাদের তুচ্ছ জীবন বিসর্জ্জন ক'রে, ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে দেশকে হতশ্রী ক'রে তুলছে।

দেশের শিক্ষা পদ্ধতির বিরুদ্ধে সমালোচনা করা একটা সাধারণ ফ্যাসান। হাটে মাঠে ঘাটে এর সমালোচনা শুনতে পাওয়া যায়; বিশেষ ক'রে তাদেরই কাছে যাদের ভাল শিক্ষা-পদ্ধতির সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট ধারণাই নেই। আর বিরুদ্ধ সমালোচনা সবচেয়ে বেশী হয় সেই সব নূতন জিনিষের, যা বাস্তবিক ভাল। আমাদের শিক্ষার আমি যে সমালোচনা ক'রলাম, আশা করি কেউ এ সমালোচনা ঠিক সেই পর্য্যায়ে

ফেলবেন না। আমার অভিযোগ এই যে, আমরা শিক্ষা সম্বন্ধে বড় অল্পে তুষ্ট। স্কুল কলেজের পাঠ্য নির্দ্ধারণ ক'রতে গিয়ে, পরীক্ষার বিষয় নির্দ্ধারণ ক'রতে গিয়ে আমরা সুকুমার বালক-বালিকাদের সৌকুমার্য্যের উপর অতিমাত্র দরদী হ'য়ে পড়ি। আমার নিজের অভিজ্ঞতায় আমি জানি যে, ভাল বই—যে বই ছেলেদের পড়া নিতান্ত দরকার সে সব বই কঠিন বলে পাঠ্য তালিকা থেকে পরিত্যক্ত হয়। আর কলেজে—বিশেষতঃ স্কুলে এমন শিক্ষক কমই আছেন যাঁরা ছাত্রদের পরীক্ষার নির্দ্ধারিত বিষয়ের চেয়ে বেশী কিছু ছেলেদের পড়তে বাধ্য করেন। এতে দাঁড়িয়েছে এই যে, আমাদের স্কুল ও কলেজ থেকে ছেলেরা মেয়েরা শেষ পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে এলে, যা কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করে, তা বিশ্বের অগ্রসর জাতিগুলির ছাত্রদের তুলনায় কিছুই নয়।

তার পরিচয় আমাদের দেশের বেশীর ভাগ ছেলে পায় বিদেশে গেলে। আমার ছেলে যখন বিলাতে যায় তখন সে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ক'রে I. Sc. প'ড়ছিল। তার স্কুলের পাঠ্যের বাইরে অনেক বই প'ড়বার বাতিক ছিল; তার ফলে সে এখানে থাকতে যত জিনিষ জানতো আর যা শিখেছিল, তা' তার সহপাঠী ও অগ্রপাঠীদের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু ইংলণ্ডে গিয়ে সে কয়েক দিন পরে আমাকে যে চিঠি লিখেছিল তাতে সে লিখেছিল যে, সেখানকার স্কুলের ১৩।১৪ বছরের ছেলে মেয়েরা এত বিষয় জানে, বিশ্বের এত সংবাদ রাখে, আর এত বই তারা প'ড়ছে যে, তাদের পাশে তার নিজেকে ভয়ানক অজ্ঞ ব'লে মনে হয়। তার এ অভিজ্ঞতা যে কিছু অসাধারণ নয়, সে কথা যে কেউ বিলেতে পড়তে গেছে সেই ব'লতে পারবে। এর হেতু এ নয় যে, আমাদের ছেলেদের বুদ্ধি-সুদ্ধি সে দেশের

ছেলেদের চেয়ে কম; এর হেতু এই যে, তারা তাদের ছাত্র জীবনের সময়ের অসদ্ব্যবহার করে না, বা করবার অবসর পায় না। ক'টা স্কুল বা কলেজ আছে আমাদের দেশে যাতে একটা ভাল লাইব্রেরী আছে? ক'খানা সাময়িক পত্র আছে আমাদের, যাতে বিচিত্র রকমের জ্ঞান প্রসারিত করবার চেষ্টা হয়? বিদেশের যে সব কাগজে এই সব আছে তার ক'খানা এ দেশে আসে, ক'জন তা প'ড়তে পায়? আবার যে লাইব্রেরী বা ল্যাবরেটারী আছে, তার সদ্ব্যবহার করে কয়জন? বিচিত্র জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য দেশব্যাপী সে একাগ্র আকাঙ্ক্ষা কোথায়? সে চেষ্টা, সে সহিষ্ণুতা কোথায়?

নেই—বড় দুঃখে ব'লতে হয়, নেই সে চেষ্টা, নেই সে একাগ্রতা। সমস্ত জাতটা মারা যেতে ব'সেছে আমাদের একটা আড়ষ্ট নিশ্চেষ্টতায়! অসাড় নিস্পন্দ হ'য়ে আমরা প'ড়ে র'য়েছি Tennysonএর Lotus Eatersদের মত। পরিশ্রম ক'রছি—কিন্তু বাটখারার ওজনে যতটুকু নইলে নয় তার বেশী নয়; চলছিও পথে—গরুর গাড়ীর চালে। বিশ্বের অগ্রসর যে সব জাত, তারা চলছে এয়ারোপ্লেনে—তারা পরিশ্রম ক'রছে সে পরিশ্রমে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই—তুষ্টি নেই। আমরা তাদের দিকে চেয়ে দেখি না, তাই গরুর গাড়ীর চালেই তুষ্ট হ'য়ে ব'সে আছি। চেষ্টা আমাদের পরিমিত, কেন না বেশী চেষ্টার কোনও প্রয়োজন অনুভব করি না।

সময়ের যে কি বিরাট অপচয় আমরা ক'রছি, তার পরিচয় আমি দেখতে পাই চারিদিকে। স্কুলে আট দশ বৎসর কাটায় ছেলেরা। সে সময়ের সদ্ব্যবহারে তারা যা' শিখতে পারে তার চার ভাগের এক ভাগ তারা শেখে না। স্রোতে গা ভাসিয়ে

দিয়ে দুলতে দুলতে তারা অগ্রসর হয় জ্ঞানরাজ্যে—যেখানে অন্য দেশের লোকে দুহাতে টেনে সাঁতার কেটে দ্রুত অগ্রসর হ'চ্ছে। শিক্ষকেরা যে সময়ে তাদের পণ্ডিত ক'রে তুলতে পারেন, সে সময়টা ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে তাদের পাঠশালার প'ড়ো ক'রেই রাখেন। স্কুল কলেজ ছেড়ে আমরা নিই একটা জীবনব্যাপী ছুটি। পড়াশুনোর সঙ্গে বিদায় নিয়ে ঢিমে চালে সংসারধর্ম্ম ক'রতে আরম্ভ করি,—সে ধর্ম্মের মূলসূত্র দুকুড়ি সাত বজায় রেখে কোনও মতে জীবন কাটান।

আমার একটা প্রশ্ন শুনতে হয়,—খোসামুদী ক'রে সবাই সে কথা জিজ্ঞাসা করে না, বিস্মিত হ'য়েই অনেকে জিজ্ঞাসা করে—আমি এত কাজ করি কি ক'রে? প্রশ্ন শুনে আমার লজ্জা হয়। আমি জানি যে, আমি যত কাজ করি—পৃথিবীর বড় বড়, চাই কি মাঝারি বা চলনসই কর্ম্মীদের তুলনায় সে কত তুচ্ছ! কিন্তু সেই সামান্য কাজও তাঁদের মনে বিস্ময় উৎপাদন করে!

কাজ ক'রবার শক্তি অভ্যাসের সঙ্গে বেড়ে যায়। প্রথমে যে কাজটা ক্লেশকর থাকে, পরে সেটা সহজসাধ্য হ'য়ে পড়ে। তাই কর্ম্মী যে, তার কর্ম্মশক্তি ক্রমশঃই বেড়ে যায়, আর যে কর্ম্মী নয়, তার কর্ম্মশক্তি সঙ্কীর্ণ ও সংক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে,—কর্ম্মীর কাজ দেখে তখন তার আশ্চর্য্য বোধ হয়। তফাৎটা একটা বিশেষ শক্তি থেকে ততটা হয় না, যতটা অভ্যাস থেকে হয়। আমাদের কাজের অভ্যাস নেই, তাই বিশ্বের লোকের কাজ দেখে অবাক হ'য়ে যাই। নিজের সাধ্য ও শক্তি সম্পূর্ণ প্রয়োগ ক'রে যদি কাজে নেমে পড়ি, তখন আর বিস্ময়মুগ্ধ হ'য়ে আমাদের শুধু চেয়ে থাকতে হবে না, বিশ্বের কর্ম্মী সম্প্রদায়ের মাঝে আমাদের ন্যায্য স্থান নিতে আমাদের এতটুকুও বাধবে না।

তোমাদের কাছে—বাঙ্গলার শিক্ষান্বেষী যুবকদের কাছে আমার আজ এই আবেদন—তোমরা তোমাদের দেশকে মুক্ত ক'রবে এই মরণকল্প নিশ্চেষ্টতা থেকে। ভেঙ্গে দেবে এর যুগ যুগান্তের আলস্য, এই প্রতিজ্ঞা ক'রে জীবনের পথে অগ্রসর হও। ক্লান্তিহীন চেষ্টা ও শ্রান্তিহীন পরিশ্রম ক'রে তোমরা দেশের এই নেশার ঘোর কাটিয়ে দেশের জীবনকে বিশ্বের জীবনের সঙ্গে এক সূত্রে গেঁথে দেবে;—বিশ্বের তালে চলবে তার গতি, বিশ্বের জীবনের সঙ্গে বৃদ্ধি পাবে তার জীবন। চোখ কাণের উপর যে পর্দ্দা আছে সেটা নিঃশেষে সরিয়ে দিয়ে তোমরা সমস্ত বিশ্বের 'পরে সব ইন্দ্রিয়গুলো ফিরিয়ে দাও; যেখানে যেটুকু জানবার আছে নিঃশেষে সঞ্চয় ক'রে নিয়ে এসো;—সেই জ্ঞানের আলোতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠুক তোমাদের চিত্ত;—সে আলোর দীপ্তিতে ফুটে উঠুক চিত্তে নব নব জ্ঞানের ক্ষেত্র, নব নব কর্ম্মের প্রেরণা।

আমাদের দেশে একটা মনোভাব অত্যন্ত প্রবল হ'য়ে উঠছে আজকাল, যে, দেশের সেবার জন্য আজকাল আর কোনও কিছু জানবার দরকার নেই, অনুসন্ধান করবার নেই—দেশকে প্রাণপণে ভালবাসাটাই শুধু দরকার। দেশকে ভালবাসতে হবে—তার জন্য ত্যাগ ক'রতে প্রস্তুত হ'তে হবে, সন্দেহ নেই। কিন্তু অজ্ঞানের ভালবাসা, অজ্ঞানের ত্যাগেই সব চেয়ে বেশী উপকার হয় না। সেবা ক'রবার আকাঙ্ক্ষা থাকলেই ভাল ক'রে সেবা করা যায় না, সেবা ক'রতে জানা চাই। আর সেই জানার সীমা নেই। এমন কোনও কাজই কল্পনা ক'রতে পারি না যার সম্বন্ধে পড়াশুনো ক'রে জ্ঞানলাভ ক'রে কর্ম্মশক্তি বাড়ান যায় না। আর এমন কাজ অনেক আছে যাতে না জেনে হাত দেওয়া ভয়াবহ। মুমূর্ষু রোগীর শুশ্রূষা ক'রতে অনেকেই ব্যস্ত হ'তে পারে,

কিন্তু শুশ্রূষা যে জানে না তার সেবায় হিতে বিপরীত হ'তে পারে।

নদীর জল তৃপ্তি দেয়, স্বাস্থ্য দেয় ;—সেই জল যখন খানা ডোবায় বাধা পড়ে তখন তা' যেমন হয় দুর্গন্ধ, তেমনি হয় বিষাক্ত। আমাদের দেশের জীবন বিশ্বের গতিশীল জীবন প্রবাহের সঙ্গে সম্বন্ধচ্যুত হ'য়ে তেমনি অশেষ আবর্জ্জনা ও কলুষে ভরে উঠেছে। খাল কেটে বিশ্বপ্রবাহ থেকে জীবন স্রোত টেনে এনে একে মুক্তি দিতে হবে। সেই মুক্তিসাধন তোমাদের ব্রত—সেই তোমাদের সাধনা, এই কথা স্মরণ ক'রে যদি তোমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও, তবেই দেশের চরম কল্যাণ, বিশ্বের পরম উপকার সাধন ক'রবে—বিশ্বের জাগ্রত মহেশ্বরের সেবা ক'রে অমরতা বরের অধিকারী হবে।

আমাদের জীবনের সঙ্কীর্ণতার একটা সব চেয়ে বিষময় ফল হ'চ্ছে আমাদের আদর্শের সঙ্কীর্ণতা। বড় অল্পে আমরা তুষ্ট ;—কি অর্থ, কি বিদ্যা, কি ধর্ম্ম, কি চরিত্র, সব দিক দিয়ে আমরা আদর্শকে আমাদের দেশের গজকাঠির মাপে কেটে ছোটখাট ক'রে নিয়েছি। তাই আমরা ছোটখাট একটা যা কিছু ক'রতে পারলেই আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে পড়ি ; মাটির মন্দির গড়ে' আত্মপ্রসাদ লাভ করি, যেন একটা তাজমহল গড়ে' ব'সেছি। বিশ্বের মানদণ্ডে আমাদের সে চেষ্টার পরিমাণ কতটুকু, সেটা বিচার ক'রবার অবসর আমাদের নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই ; যা পেয়েছি সেইটুকু নিয়ে উৎসব ক'রতেই বেশী ব্যস্ত।

আদর্শের এই সঙ্কীর্ণতা আমাদের চেষ্টার পরিধিকেও সঙ্কীর্ণ ক'রে দেয়। খুব একটা বড় চেষ্টার জ্যোতিতে বিশ্ব-মানবের চোখে ধাঁধা লাগাবার মত কিছু করবার স্বপ্ন আমাদের

মনে জাগে না; আমরা একটা আগুনের দানা বের ক'রেই তুষ্ট।

এই তুষ্টি নিয়ে আমাদের বড়াইয়ের অন্ত নেই। সমস্ত বিশ্বের আত্মোন্নতির অশ্রান্ত চেষ্টাকে আমরা materialistic ব'লে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে এই তামসিক তুষ্টিকে একটা আধ্যাত্মিক সম্পদ ব'লে গর্ব্ব ক'রে মরি। কেন না, পূর্ব্বে এ দেশে এমন সব লোক জন্মেছিলেন, যাঁরা আধ্যাত্মিক গৌরবে জগতের সব জাতকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন। তত্ত্বজ্ঞান থেকে যে তৃপ্তি ও অনাসক্তি আসে এই তামসিক তুষ্টির সঙ্গে যে তার কোনও সম্পর্ক নেই, সেটা আমাদের জানবার অবসর হয় না।

এই মোহ-ঘোর ভাঙ্গতে হবে, আদর্শকে বড় ক'রে বিশ্বের সাধারণ মাপদণ্ডে মাপ-জোখ ক'রে সব জিনিষ আমাদের পরখ ক'রে নিতে হবে ;—আর কোনও ছোট মাপ আমরা মানবো না। বিশ্বের দিকে চেয়ে, জগতের অগ্রসর জাতিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে যদি আমরা সঙ্কল্প করি, তবে আপনা-আপনি আমাদের শক্তির সব অসংশয়িত উৎস খুলে যাবে, জীবনের নূতন ধারায় জাতি উজ্জীবিত হ'য়ে উঠবে।

বিশ্ব-জীবনের দিকে সজাগ দৃষ্টিতে চেয়ে যদি আমরা জীবন নিয়মিত করি, বিশ্বের জ্ঞানধারা যদি নিঃশেষ ক'রে আমরা আয়ত্ত ক'রতে পারি, বিশ্বের কর্ম্মচেষ্টার সুরে যদি আমাদের কর্ম্ম-শক্তিকে বেঁধে ফেলি, তবে আমরা দেখতে দেখতে জ্ঞানে গরীয়ান্, কর্ম্মে মহীয়ান, সাধনায় অতুলনীয় হ'য়ে উঠতে পারবো। আমাদের চোখের সামনে দেখতে দেখতে জাপান তার ঘুম-ঘোর ছেড়ে জেগে উঠে সব জাতের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে ;—তারও পরে তুর্কী জেগে উঠেছে; চীন উঠেছে জেগে; আমরা জেগে উঠতে

পারবো না? জাপান তুর্কী বা চীন যে জেগে উঠে হঠাৎ বড় হ'য়ে উঠেছে এটা কোনও ভেল্কীর খেলা নয়—এর পেছনে আছে একটা তীব্র একাগ্র মুক্তি কামনা, উন্নতির এক প্রচণ্ড সাধনা। সেই সাধনার ইতিহাস আমাদের আলোচনা ক'রতে হবে—তাদের সেই পথ আমাদের নিতে হবে। বহুমুখী হবে আমাদের সে চেষ্টা; কিন্তু যে পথে আমরা চলি না কেন, সব পথেই বিশ্বের জীবনের সঙ্গে যোগ রাখতে হ'বে।

দেশের সেবা করবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের যুবকদের মধ্যে খুব ব্যাপকভাবে আছে। তাদের আকাঙ্ক্ষা আছে, উৎসাহ আছে, কিন্তু উপযুক্ত চেষ্টা নেই। আমার এ কথায় অনেকে মনঃক্ষুন্ন হবে জানি, তবু কথাটা বলবার দরকার আছে। এতবড় একটা জাতকে এত গভীর দুর্দ্দশার পঙ্ক থেকে উদ্ধার করবার জন্যে যে কত বড় চেষ্টার প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে যাদের খুব স্পষ্ট ধারণা নেই তারাই কেবল আমাদের সামান্য চেষ্টা নিয়ে বাহবা দিতে পারে। যাঁরা দেশের সেবার জন্য আত্মসমর্পণ ক'রেছেন, যাঁরা দেশের উন্নতির জন্য যা' কিছু হ'ক ক'রেছেন, কাউকে আমি অশ্রদ্ধা করি না, তাঁদের চেষ্টার বিন্দুমাত্র অসম্মান করা আমার অভিপ্রায় নয়; কিন্তু কত দূর যে করা সম্ভব, কত দূর যে করা যেতে পারে, সেটা জেনে শুনে আমি তাঁদের এই চেষ্টায় পরিতৃপ্ত হ'য়ে থাকতে পারি না।

এমনি একটা অধঃপতিত প্রকাণ্ড দেশকে তার দুর্দ্দশা থেকে টেনে তোলবার জন্য একটা প্রকাণ্ড চেষ্টা এতদিনে ফল প্রসব ক'রেছে। সান ইয়াৎ সেনের জীবনব্যাপী সাধনার ফলে চীন আজ অগ্রসর জাতিদের মধ্যে স্থান নেবার জন্য এগিয়ে এসেছে। তার যে সফলতার জয়গান করছি আজ আমরা, সেটা সম্ভব হ'য়েছে

যে বিরাট চেষ্টায়, তার খবর আমরা খুব বেশী রাখি না। ত্রিশ হাজার চীন যুবক অক্লান্ত চেষ্টায়, লোকচক্ষুর অগোচরে, বহু বৎসর ধ'রে লোক শিক্ষায় আত্মনিয়োগ ক'রেছিল। আজ যে চীন বন্ধনের নিগড় ভেঙ্গে উন্নতির পথে অগ্রসর হ'য়েছে, তার জন্য চীন সেনাপতিদের সমর কৌশলের কৃতিত্ব যতখানি, এই ত্রিশ হাজার বীরের বহু বৎসরের একাগ্র চেষ্টার কৃতিত্ব তার চেয়ে কম নয়।

এমনি চেষ্টার প্রয়োজন আজ আমাদের দেশে। নগদ বিদায়ের আশা না ক'রে, হাততালি বা বাহবা পাবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে যে সব কর্ম্মী লোকচক্ষুর অগোচরে, সাময়িক উচ্ছ্বাস বা উত্তেজনার অপেক্ষা না ক'রে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অশ্রান্ত চেষ্টায়, অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত কাজ ক'রে যাবেন, তেমনি কর্ম্মী শত শত সহস্র সহস্র প্রয়োজন। যাঁদের আদর্শ হ'বে চরম সফলতা; বিলম্বে অসহিষ্ণু না হ'য়ে দ্রুতপদে অগ্রসর হবার জন্য যাঁরা প্রাণপণ চেষ্টা ক'রবেন, আর লক্ষ্য স্থির ক'রে অপরিশ্রান্ত উদ্যমের সঙ্গে কাজ ক'রে যাবেন এমনি সহস্র সহস্র কর্ম্মীর প্রয়োজন।

তোমরা যুবক—তোমরা শিক্ষালাভ ক'রছো;—তোমাদের সেই বিরাট কর্ম্মীবাহিনী গড়ে তুলতে হবে, যা' দেশকে বর্ত্তমান দুরবস্থার থেকে উদ্ধার ক'রে তাকে চরম উন্নতির পথে দাঁড় করিয়ে দেবে।

বাঙ্গলার বর্ত্তমান মেঘাচ্ছন্ন—তার ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল ক'রে গড়ে তোলবার ভার তোমাদের।

দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে যদি তোমরা আপনি মানুষ হও, দেশের লোককে মানুষ ক'রে গড়ে তোলবার সঙ্কল্প কর।

মানুষ হব আমরা, সমস্ত দেশটাকে মানুষ ক'রবো, এর চেয়ে বড় প্রতিজ্ঞা, বড় ব্রত আমি কল্পনা ক'রতে পারি না।

দেশ দরিদ্র, তাকে ধনী ক'রতে হ'বে; দেশের লোক রুগ্ন, তাদের নিরাময় ক'রতে হবে; দেশের লোক দৈব দুর্ব্বিপাকে বিপন্ন হ'য়ে পড়লে তাদের সহায়তা ক'রতে হ'বে—এ সব ভাল কথা—কিন্তু এ সব ছোট কথা। সব চেয়ে বড় কথা মানুষ হ'তে হবে—যাকে বলে 100 per cent he-man—তাই হ'তে হ'বে। তার ভিতর এ সব আপনা আপনি এসে পড়বে।

যুবক তোমরা, জীবনের বন্যা তোমাদের মধ্যে উথলে উঠবে; দুই কূল ছাপিয়ে ব'য়ে যাবে তোমাদের জীবন। শরীর হবে শক্তিমান, মন হবে দৃঢ়। কষ্টকে কষ্ট ব'লে জ্ঞান ক'রবে না। বিপদকে খেলার ছলে আলিঙ্গন ক'রবে; জীবনটাকে খেলোয়াড়ের মত খেলে যাবে। শক্তি—দেহের শক্তি, মনের শক্তি—তোমাদের প্রতি অঙ্গে অঙ্গে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠবে। এই হ'ল যৌবনের লক্ষণ,—জীবনের লক্ষণ! যাদের ভিতর জীবন এমনি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হ'য়ে উঠেছে তারা কোনও নীচ কাজ ক'রতে পারবে না, জগতে কারও কাছে মাথা নুইয়ে থাকতে পারবে না; আপনার ব্যক্তিত্ব, আপনার স্বাধীন চিন্তা বিলিয়ে দিয়ে কারও আজ্ঞা-দাস হ'তে পারবে না,—কেন না, তারা হবে মানুষ।

আমাদের দেশের চারিদিকে যখন চাই—যখন দেখি জীর্ণ শীর্ণ ভঙ্গুর দেহ নিয়ে শিশু থেকে যুবকের দল কেবল টায়-টোয় জীবনটাকে ব'য়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, যখন দেখতে পাই তাদের কর্ম্মের চেষ্টা নেই, কষ্ট সইবার উৎসাহ নেই, নিরুপদ্রবে দিন কাটানই তাদের পরম পরমার্থ, যখন দেখতে পাই শিক্ষাভিমানী

লক্ষ লক্ষ লোক তাদের স্বাধীন বিচারের জন্মগত অধিকার বর্জ্জন ক'রে আজ একে, কাল ওকে নেতা ব'লে মেনে নির্ব্বিচারে ভেড়ার পালের মত তাদের আদেশে কর্ম্ম বা অকর্ম্ম ক'রছে—তখন মনে হয় যে এইটাই আমাদের দেশের সব চেয়ে অভাব ;—আমাদের দেশে মানুষ নেই—পুরুষ নেই।

তোমাদের কাছে আমার এই প্রধান আবেদন—তোমরা গড়ে তোল আপনাদেরকে মনুষ্যত্বের, পুরুষত্বের এই দুর্ল ভ আদর্শে। দেশের কাছে তোমাদের অনেক দায়িত্ব আছে, অনেক পথে দেশের সেবা ক'রতে হবে তোমাদের ; কিন্তু এই কথা মনে রেখো যে, দেশের সব চেয়ে বড় দাবী এইটা যে, যাই কর তোমরা, যে পথেই যাও—তোমরা মানুষ হবে। বিশ্বের দরবারে আর সব জাতের মানুষের পাশে তোমরা সঙ্কুচিত হয়ে, আপনার খর্ব্বতায় লজ্জিত হ'য়ে ব'সে থাকবে না ; তাদের মুখোমুখী হ'য়ে পৌরুষে তাদের সমকক্ষ হ'য়ে তাদের সমান আসন দাবী করবে—বাঙ্গলা দেশ তার বীর সন্তানদের দিকে চেয়ে যেন Grachi মাতা Corneliaর মত গর্ব্বের সহিত বিশ্বের কাছে ব'লতে পারেন যে, অলঙ্কার নেই আমার, হীরা জহরত নেই—কিন্তু আছে আমার এই সব সন্তান—এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ কারো নেই !

আমরা পরাধীন জাতি। কিন্তু আমরা যে পরাধীন, এই আমাদের একমাত্র লজ্জা নয়, এ কথা আমরা যেন ভুলে না যাই। একটা কোনও ইন্দ্রজাল-বলে, কিম্বা কৌশলে যদি ইংরাজ বিদায় হয়ে আমাদের দেশ হঠাৎ স্বাধীন হয়ে যায়, তবে তাতেই দেশের লজ্জা হঠাৎ একদিন যাবে না, তাতেই অধিকার হবেনা আমাদের বিশ্ব পরিষদে মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়াবার। আরও অনেক বিষয়ে আমরা খাটো আছি ;—সব চেয়ে বড় লজ্জার কথা

এই যে মনুষ্যত্বে আমরা জগতের লোকের কাছে খাটো। কি শরীরের বল, কি কৌশল, কি জ্ঞান, কি চিত্তের বল, কোনও বিষয়েই আমরা গর্ব্ব ক'রে জগৎকে ব'লতে পারি না যে, আমরা তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

আমাদের এই ছোট্ট দেশটার মধ্যে আমি একটা মাতব্বর লোক হব এ আকাঙ্ক্ষা অনেকের আছে। কিন্তু বামনদের দলে এক ইঞ্চি বেশী লম্বা হ'য়ে গৌরব করে তো কোনও লাভ নেই। আমাদের দেশের প্রাচীর যে ভেঙ্গে গেছে;—আমরা এসে দাঁড়িয়েছি—সমস্ত বিশ্বের হাটের মাঝখানে। আমাদের পাল্লা দিতে হবে, আপনা-আপনির মধ্যে নয়, বিশ্বের সমস্ত জাতের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে ছেলেখেলার দাবী করার চেয়ে লজ্জার কথা আর নেই।

তাই ব'লছিলাম, তোমাদের দৃষ্টিটা এই দেশের সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে একেবারে সমস্ত বিশ্বের দিকে ঘুরিয়ে নিতে হবে। মানুষ হ'তে হবে তোমাদের,—আমাদের এই সব বালখিল্য দলের মাপে নয়, সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

আর এই কথাটা মনে রাখতে হবে যে, বিশ্বের পাঠশালায় পেছনের বেঞ্চিতে একটা স্থান পেয়ে কৃতার্থ হ'লে চলবে না। এ কথা ভুললে চলবে না যে, আমাদের দেশ একটা ছোট দেশ নয়—বিশ্বের দরবারে হাজারীর দলে স্থান পাবার দাবী আমাদের নয়—আমাদের স্থান হ'চ্ছে মন্‌সবদারের প্রথম শ্রেণীতে—জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিদের সঙ্গে এক পর্য্যায়ে। সেইখানে স্থান ক'রে নিতে হবে আমাদের; দেশের জন্য সেই পদবী লাভ করবার দায় তোমাদের—হয় তো তোমাদের ছেলেদের। সেই মহিমামণ্ডিত লক্ষ্যের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে অগ্রসর হ'তে হবে, সেই আদর্শে

নিয়মিত ক'রতে হবে সমস্ত জীবন। অক্লান্ত চেষ্টা,অদম্য উৎসাহ ও ক্লান্তিহীন, অবসাদহীন উদ্যোগ নিয়ে যদি তোমরা আপনাদের জীবনে এই মহৎব্রত উদ্‌যাপনে ব্রতী হও—তবে লক্ষ্য লাভ হোক বা না হোক, গৌরবে মণ্ডিত ক'রবে তোমরা দেশকে, গৌরবে মণ্ডিত হবে তোমরা আপনারা।

মানুষ যদি হ'তে চাও, দেশের সেবা যদি সত্য সত্য ক'রতে চাও, তবে দৃষ্টিকে প্রসারিত ক'রে দেও সেই দূর দিগন্তের পানে—যেখানে বিজয়-লক্ষ্মীর গৌরবময় আসন প্রতিষ্ঠিত আছে। বিনিদ্র চেষ্টার সহিত জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের সদ্ব্যবহার ক'রে অগ্রসর হও ;—যতদূর সাধ্য ও শক্তি ততদূর ছুটে চলে—হাতে তুলে নাও পতাকা ; তার ভিতর মন্ত্র লেখ excelsior! তৃপ্তির অবসাদ চিত্তে আসতে দিও না, তুষ্টিতে আপনাকে অভিভূত ক'র না—সদাজাগ্রত হ'য়ে এই আদর্শের অনুশীলন ক'রে যাও! সফল হও, নিষ্ফল হও, তাতে দুঃখ নেই, যদি তুমি জীবনের অবসানে তোমার সেই পতাকা অম্লান রেখে দিয়ে যেতে পার তোমাদের সন্তানদের হাতে ; তাদেরকে প্রেরণা দিয়ে যেতে পার ঠিক এমনি উৎসাহের সঙ্গে সেই চরম লক্ষ্যের অনুশীলন ক'রতে।

তাই আজ বলি ভাই, ঘুম-ঘোর ভেঙ্গে ওঠ—বৃথা স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে আসল কাজে আলস্য ক'রো না। এ কথা মন থেকে দূর ক'রে দেও যে, কোনও অসম্ভব ইন্দ্রজাল একদিন হঠাৎ তোমার দেশকে মুক্তি দেবে, গৌরব দেবে। মুক্তি যদি পেতে হয়, গৌরব যদি লাভ ক'রতে হয় দেশকে আদ্যোপান্ত মানুষ হ'তে হবে—প্রাণপণ ক'রে সবাইকে মনুষ্যত্বের সাধনা ক'রতে হবে,—স্বপ্নের নয়, ইন্দ্রজালের নয়! সেই মনুষ্যত্ব সাধনায় আত্মসমর্পণ কর। আপনাদেরকে ঝাঁকা দিয়ে জাগিয়ে তোল। আফিমের নেশায়

বিভোর হ'য়ে আছ—জেগে ওঠ—ছুটে চল—আলস্যের অবসর নেই, সময়ক্ষেপের অবসর নেই, বিরামের সময় নেই, অক্লান্ত চেষ্টায় অবিরাম পদক্ষেপে অগ্রসর হও—আর ঃ

"প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

রঙ্গপুর জেলা ছাত্র-সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ

॥ কাব্যের মালমশলা ॥

এখানে অনেকেই কবি আছেন। কবি বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা অনেকে হয়ত এ কথায় উৎসাহিত হইয়া উঠিবেন। কিন্তু তাঁহারা শান্ত হউন; এণ্টনির ভাষায় বলিতে গেলে আমি তাঁহাদের প্রশংসা করিতে আসি নাই, সমাধি দিতে আসিয়াছি।

আর কবির যশ বা অপযশ যাহাই হউক, তাহা যে তাঁহাদের একচেটিয়া এরূপ নয়। কারণ কবি ত্রিবিধ—ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ। অব্যক্ত কবি সেই, যাঁহার ভিতর প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও নিয়ম সাম্যাবস্থায় আছে; প্রকাশ, অর্থাৎ কাব্য ছাপাইবার ইচ্ছা, প্রবৃত্তি অর্থাৎ কাব্য লিখিবার ইচ্ছা এবং নিয়ম, অর্থাৎ সমালোচনা। ইহারা পরস্পরবিরোধী গুণ। তুমি যদি কড়া সমালোচক হও তবে তোমার কাব্যপ্রকাশ ঘটিয়া উঠিবে না। অব্যক্ত কবির এই ত্রিগুণের সাম্যভাব একটু অস্থায়ী রকমের, সামান্য কারণেই ইহা বিচলিত হইয়া অব্যক্ত ব্যক্ত হইয়া পড়ে। জ্ঞ নামক তৃতীয় শ্রেণীর কবির প্রভাবে এই প্রকাশ প্রায় ঘটিয়া থাকে। তুমি হয়ত বাল্যাবধি নানারকম পদ্য রচনা করিয়া তোমার নিয়মগুণের প্রেরণায় তাহা অতি গোপন রাখিয়াছ; কিন্তু হঠাৎ যদি একজন "জ্ঞ" বা সমজদার তোমার কবিতা পড়িয়া সুখ্যাতি করিয়া বসেন, তবে তোমার ছাপান আটকাইয়া রাখা দায় হইবে।

ব্যক্ত কবি স্পষ্ট অর্থাৎ ছাপা হওয়া কবি। কিন্তু ইহাদের ব্যক্তির ভিতর ক্রমের প্রভেদ আছে। কেউবা বিবাহের কবিতা লিখিয়া ব্যক্ত, কেউবা মাসিক সাপ্তাহিকে লেখেন, কেউ বা রীতিমত বই ছাপাইয়া অর্থব্যয় করেন।

জ্ঞ শ্রেণীর কবি সমজদার। ইহারা ব্যক্ত বা অব্যক্ত কবি হইতে পারেন, কিন্তু জ্ঞ হিসাবে ইহাদের বিশেষত্ব, রসগ্রাহিতা নামক এক প্রকার চাটুকারিতা। কথাটা শুনিয়া চটিবেন না। যাঁহাকে আপনারা বলেন রসগ্রাহিতা, বৈজ্ঞানিক শ্রেণী বিভাগে তাহাকে চাটুকারিতা ভিন্ন অন্য কিছুর ভিতর ফেলা যায় না। জলটা পরিষ্কার সোজা দেখিয়াও অমুক ব্যক্তি তাহাকে কাত বলিলেন, বলিয়াই তাহাকে কাত দেখা বা বলা চাটুকারিতার একটা চলিত দৃষ্টান্তস্থল; কবিতার রসগ্রাহী ঠিক এই শ্রেণীর চাটুকার। সাধারণতঃ কবির লক্ষ্য, যেখানে যেটা নাই সেখানে সেটা আছে বলিয়া কল্পনা করা। তাই শুনিয়া যে আহা আহা করে, সে চাটুকার বৈ আর কি? এ কথাটা ক্রমে আরও স্পষ্ট হইবে।

কবিতা জিনিষটার একটা বিশেষত্ব আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন; সকল ভাষায়, অন্ততঃ আমার জানা সকল ভাষায়—কবিতার নাম কবির নাম হইতে তৈয়ার হইয়াছে। কবি শব্দের উত্তর প্রত্যয় বিশেষ দ্বারা কাব্য, কবিতা, কবিত্ব প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। তেমনি poet শব্দ হইতে poetry শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট। অবশ্য পদ্য শব্দ বা ইংরাজী verse শব্দ এ বিষয়ে স্বাধীন। কিন্তু পদ্য বা verse যে কবিতা নয় তাহা সুপ্রসিদ্ধ; অমরসিংহকে যতবড় কৃতিই বিবেচনা করুন, এ পর্য্যন্ত কেহ তাঁহাকে কবি বলিয়া ভ্রম করে নাই। নামের এ উৎপত্তি হইতে অনুমান স্বাভাবিক যে কবি ও কবিতা উভয়ের মধ্যে কবি দ্রব্য, কবিতাটা তার গুণ, ক্রিয়া বা যাহাই বলুন। কবিতার কোন মূল বস্তু সংসারে নাই, তাহা কবিদের সৃষ্টি। অপর পক্ষে দেখুন, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বস্তুতন্ত্র বিদ্যার একটা স্বাধীন নাম আছে; সে বিদ্যার অধিকারীর নাম হইয়াছে

সেই বিদ্যা হইতে। এই প্রভেদ হইতে বুঝা যায় যে কবিতা কি প্রকার বস্তু। পাগলামি, খ্যাপামি, গোঁড়ামি প্রভৃতি শব্দের যেমন পাগল, ক্ষ্যাপা বা গোঁড়া ছাড়া কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, কবিতার ও তেমনি কবির মাথা ছাড়া কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। তাই এমন নাম।

পদ্য যদি কবিতা না হয়, তবে কবিতা কাহাকে বলে? অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে তাহা রসাত্মক বাক্য। এই রস জিনিষটি বিশেষ অনুধাবনের যোগ্য। কবিদিগের বস্তু ও সত্য সম্বন্ধে উদাসীনতা চাপা দিবার জন্য আলঙ্কারিকেরা এক তথাকথিত বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার নাম রস। ইহা খেজুরের রস ও নহে রসগোল্লার রস ও নহে, কেহ কখনও তাহা আস্বাদ করে নাই, তবু নাকি পৃথিবীটা রসে ভরপুর—এ বিশ্বটা যেন একটা রসগোল্লার হাঁড়ি যার ভিতর শত শত জগৎ রসের ভিতর হাবুডুবু খাইতেছে। এই রস হইল কবিতার বিষয় এবং বিশেষ সম্পত্তি। "রস" বলি তাহাকেই, যাহা জিহ্বায় সংযুক্ত হইলে একটা বিশেষ অনুভূতি জন্মে। এমন কে সৌভাগ্যবান আছেন যাঁর জিহ্বা এই অপরূপ রস আস্বাদন করিয়াছে? তোমরা বলিবে, মনের একটা জিহ্বা আছে—এটা বোধহয় রূপক, অর্থাৎ কবিতার রস জিনিষটাও তবে রূপক বা কবিতা। কাজেই দাঁড়াইতেছে এই যে কবিতার রূপ ও বিষয় এমন একটা জিনিষ, যাহা কবিতার সাহায্য ছাড়া বুঝাইবার উপায় নাই। ইহা একটা definition in a circle.

সে রস কি বস্তু, একটু তলাইয়া দেখিতে হইলে কবিতার প্রত্যক্ষ বিষয়গুলিকে একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখা আবশ্যক। মোটামুটি গুটিকতক জিনিষ লইয়া কাব্যশাস্ত্র নাড়াচাড়া করে, ইহাকেও আবার বলে শাস্ত্র? এগুলি তাহার মালমশলা।

সুতরাং রস বস্তুটি যদি কোথাও থাকে তো ইহাদের মধ্যে থাকিবে। আমি কবিতার এই সমুদয় মালমশলা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব, কবির এই রস প্রকৃত প্রস্তাবে কি ব্যাপার।

কবিতার এক প্রধান বিষয় ফুল। ফুল যে প্রকৃতপক্ষে কি বস্তু তাহা আপনারা সকলেই অল্পবিস্তর জানেন; Botany শাস্ত্রে ইহার সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য সংগৃহীত আছে। কিন্তু কবির ফুল এক স্বতন্ত্র জিনিষ। সে হাসে, কাঁদে, চাহিয়া থাকে, বিভোর হয়, ভালবাসে, কত কি করে। আপনারা কেহ কখনও ফুলকে এই সব অসম্ভব কার্য্য করিতে দেখিয়াছেন কি? বিশেষতঃ হাসি জীবের অভিব্যক্তির শেষ ফল, মানুষের privilege হাসি—সে হাসিতে ফুলের তো কোন ছার, মানুষের নিকট কুটুম্ব বানরেরও কোন অধিকার নাই।

ফুল লইয়া যে সব রস বা বিজ্ঞানাতীত ও সত্যাতীত উদ্ভট কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মধ্যে ফুলের বাহারে প্রকৃতির কারিগরি একটি। প্রকৃতি, অর্থাৎ জঙ্গলে এক রকম ফুল ফোটে বটে, কিন্তু বাগানের ফুলের সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না। মানুষ চেষ্টা ও যত্নের দ্বারা ফুলের যে বাহার করিয়া তুলে, প্রকৃতির চতুর্দশপুরুষের সাধ্য নাই যে, তেমন বাহার করে। আপনারা বোধহয় শুনিয়া থাকিবেন যে এখন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় তুচ্ছ নগণ্য কত ফুলের কত আশ্চর্য্য শোভা সম্পাদন সম্ভব হইয়াছে। সে কথা ছাড়িয়া দিলেও, সাধারণ বাগানের ফুলেও যে বাহার, তাহার পনেরো আনা মানুষের কেরামতি। দেখ দেখি কবিদের অত্যাচার। মালী বেচারা সমস্ত বছর খাটিয়া মাটি ভাঙ্গিয়া জল দিয়া গাছ ছাঁটিয়া নানা উপায়ে একটি অপরূপ ফুল তৈয়ার

করিল, আর কবি তাহা দেখিয়া প্রকৃতি বলিয়া মূর্চ্ছা গেলেন। প্রকৃতির হাতে যদি সে ফুলটি ফেলিয়া রাখা যাইত, তবে আগাছার উপদ্রবে সে ফুলটি ফুটিলেও সে হয়ত একটা ছোট্ট পোকায় খাওয়া বদ রংএর যাচ্ছেতাই জিনিষ হইত—সেটা এই রস পিপাসুদের হিসাবে আসিত না।

এই ফুল লইয়া কবি মহাশয়দের মানসিক বিকৃতির আর একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বোধহয় এও একটা বিশেষ রস। শুনা যায়, যখন ইংলণ্ডে প্রথম চা যায়, তখন তারা চায়ের জলটা ফেলিয়া পাতা চিবাইয়া খাইয়াছিল। এমনি একটা বিকৃত উপভোগ কবিদের স্বভাবসিদ্ধ। ফুলের ভিতর ফলটি হইল আসল, ফুলের পাপড়ি সেই ফল হইবার আনুসঙ্গিক উপায় মাত্র। অথচ আমাদের কবির দল এই নিতান্ত অস্থায়ী পাপড়ি লইয়া ব্যস্ত, ফলটির দিকে ফিরিয়াও চাহেন না। এই পাপড়ির সৃষ্টি হইয়াছিল পোকা ভুলাইবার জন্য—ইহা যে বোকা ভুলাইবারও কল, স্বয়ং ভগবানও তাহা বোধহয় জানিতেন না। কবিদের এই উন্মত্ততা এতদূর পর্য্যন্তও গড়ায় যে আমের মত এমন ফল যার এক এক ফোঁটা রস কাব্যরসের দশ মনের চেয়ে অধিক মূল্যবান সে ফল লক্ষ্য না করিয়া আমের মুকুল লইয়া ব্যস্ত।

কবিতার আর একটা মস্ত উপাদান চাঁদ। সে চাঁদ লইয়া কত যে ছাইভস্ম লেখা হইয়াছে তার ইয়ত্তা নাই। চাঁদ কাঁদেনা বটে, তবে হাসি তার লাগিয়াই আছে। আর ভয়ে ভয়ে বেচারা তো পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তারপর তার জলের সঙ্গে, গাছের সঙ্গে, ফুলের সঙ্গে, সাগরের সঙ্গে কত প্রেম, কত আলাপ, কত খেলা। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, চাঁদের সম্বন্ধে এ

সব কথার একটিও সত্য নয়। আলোকটাই যদি হাসির উপলক্ষণ হইত, তবে চাঁদেব অপেক্ষা ল্যাম্পের হাসিবার দাবী অনেক বেশী, কেন না ল্যাম্পের আলো তার নিজস্ব, আর চাঁদের আলো ষোল আনা ধার করা।

চাঁদ লইয়া যে কবিরা এত বেশী নাড়াচাড়া করেন, তার কারণ এই যে, তাঁরা চাঁদকে একটা ছোটখাট ফুটবলের মত দিব্যি চকচকে গোল জিনিষ বলিয়া কল্পনা করেন; কিন্তু চাঁদ সে রকম মোটেই নয়, সে একটা প্রকাণ্ড বড় জিনিষ। আমাদের কলিকাতা সহব অপেক্ষা অনেকগুণে বড় তা আপনারা সবাই জানেন। আব একটা ভুল কবিদের যে তাঁরা কল্পনা করেন যে চাঁদ একটা জীবন্ত মানুষ গোছেব কিছু। সে তো নয়ই, চাঁদ এমন একটা ভয়ানক ঠাণ্ডা জিনিষ যে, তাব আশেপাশে জীবন্ত কিছু থাকিবার যো নাই। এমন একটা বিদঘুটে জিনিষে যারা শোভা দেখে, তাঁরা যে নিতান্তই চন্দ্রাহত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর তাঁদেরই বড় অধিকারী সেক্সপীয়াব মুক্তকণ্ঠে একথা স্বীকার কবিয়া গিয়াছেন। কবিব ভিতর এরূপ সত্যবাদিতা বিবল।

কবির জমা পুঁজির ভিতর নদী একটা মস্তবড় জিনিষ। তবে ছোট নদী হওয়া চাই। ব্রহ্মপুত্রের মত অমন একটা ভীষণ ব্যাপার লইয়া কবিতা লিখিতে বড কেহ সাহস করেন না। নদীর একটা বাহাদুরী একজন বলিয়াছেন যে, সে কেবলই চলিয়াছে।

Men may come and men may go
But I go on for ever.

বহিয়া যাও তো যাও, তাতে কি আসে যায়! এমন তো কত জিনিষ নিত্য হইতেছে। নদী বরঞ্চ শুকাইয়া যায়; বাঙ্গলার মত চঞ্চল নদীর দেশে সে বড় একটা forever এর

ধার ধারে না, কিন্তু এই পৃথিবীটা সর্ব্বদাই ঘুরিতেছে, সূর্য্য রোজ ঘড়ি ধরিয়া উঠিতেছে ও ডুবিতেছে, পাহাড় চিরকালই মাথা উঁচু করিয়া আছে, হাওয়া চিরকালই বহিতেছে। জড়বস্তুর নিয়মই এই যে, সে তার বাঁধা পথ ছাড়িয়া এদিক ওদিক যাইতে পারেনা। ইহাতে কি গৌরব? গৌরব পরিবর্ত্তনে, নিত্য নূতন উন্নতিতে, কিন্তু কবির বিশেষত্ব এই যে তাঁরা অগৌরবকে জোর করিয়া গৌরবের সামনে বসান, মানুষকে জড় পদার্থের কাছে খেলো করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করেন!

অথচ এই জড় পদার্থকেও প্রাণপূর্ণ মানুষেরই প্রতিকৃতি করিয়া কল্পনা না করিলে তাঁহাদের চলে না। এই নদীকেই তাঁহারা গান করান! অভিব্যক্তির হিসাবে এটা একটা anachronism। কারণ গান একটা উচ্চ অঙ্গের বৈজ্ঞানিক চেষ্টা, মানুষ ছাড়া আর কেহই ইহা করিতে পারে না। এখানে অনেক সঙ্গীতজ্ঞ আছেন, বলুন দেখি সেই একঘেয়ে ছলাৎ ছলাৎ বা কুলকুল শব্দটা কি একটা গান পদবাচ্য? কোথায় বা তার তাল কেথায় বা ফাঁক—সুরের তো কোন ভঙ্গীই তাহাতে নাই। আর তা ছাড়া সে গান প্রকৃত প্রস্তাবে মোটেই সঙ্গীত নহে। নদীর জল তটে আঘাত করায় যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দ হয় তাহার সমষ্টিতেই নদীর দূরশ্রুত কলকল ধ্বনির সৃষ্টি হয়। ইহা যদি একটা গান হয়, তবে দূরশ্রুত হাটের গোলযোগ বা স্যাকরার হাতুড়ী পেটায় যে কেন অতি উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত হইবে না তার কোন সঙ্গত উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

তটিনীর প্রেম, সাগরসঙ্গম লিপ্সা ইত্যাদি যে সমস্ত কথা আছে, সেগুলি যে সব মিথ্যা, তাহা আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে

না। বাস্তবিক নদীর কেবল কতকগুলি জল মাধ্যাকর্ষনের ফলে যে নীচের দিকে ছুটিয়া যায়, তাতে না আছে প্রাণ না আছে মন। এমন জিনিষের প্রেম সম্ভবে না।

এই যে সকল মিথ্যা কথার সমষ্টি তাহার নাম রস। এ রস বা মিথ্যার উৎস যে কেবল এই সব খুঁটিনাটি জিনিষ লইয়া ফুটিয়া বাহির হয়, তাহা নহে। কখন কখনও সমস্ত প্রকৃতি বা কোনও একটা বিশিষ্ট ঋতুকে লইয়া রসের অবতারণা হয়। ঋতুর মধ্যে কেহ কেহ বাছাই করেন, কিন্তু কালিদাসের কাছে সবগুলি ঋতুই সমান পূজা পাইয়া গিয়াছে। রবিবাবু এ বিষয়ে কালিদাসের দলে। যে প্রচণ্ড বর্ষার প্রতাপে ঘরের বাহির হওয়া যায় না, রাস্তাঘাট বিশেষ নোংরা হইয়া যায়, এমন কি দেশশুদ্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়া বিষম উৎপাতের সৃষ্টি হয়, যে গ্রীষ্মের কাঠফাটা রৌদ্রে লোকের প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করিতে থাকে, তাও নাকি সুন্দর। যদি কেহ এই কবিদিগকে একবার বৈশাখের রৌদ্রে যমুনানদীর চড়ার উপর দিয়া ৫।৬ মাইল হাঁটাইয়া লইতেন, কিংবা আমাদের পূর্ব্ববঙ্গের একখানা পঙ্কিল খানাডোবাময় গ্রামে লইয়া বর্ষাকালে খুব খানিকটা চুবান খাওয়াইতেন, কিংবা এই কলিকাতারই বর্ষাকালে হাটখোলার একটা গলিতে লইয়া পাঁচ ইঞ্চি পুরু তরল কর্দ্দম প্রবাহের ভিতর দিয়া হাঁটাইয়া লইতেন, তবেই তাঁরা গ্রীষ্ম ও বর্ষার প্রকৃত উপভোগ লাভ করিতেন, তারপর তাঁরা যে কবিতা লিখিবেন সেটা একটা দেখিবার মত জিনিষ হইবে। গ্রীষ্ম বর্ষার মত বীভৎস বস্তুর কথা ছাড়িয়া দিলেও বড় আসিয়া যায় না। ঋতুরাজ বসন্ত, যাকে শিশু হইতে বৃদ্ধ কবি পর্য্যন্ত কেহই দু'একবার না নাড়িয়া ছাড়েন না,—তিনিই যে কি বস্তু তাহাতো কাহারো

অজানা নাই। একজন কবি তার আসল চেহারাটা দেখাইতে গিয়া বলিয়াছেন—

'বহিছে মলয়া আকুলি বিকুলি
রাস্তায় তায় ওড়ে যত ধূলি—

মরি মরি কি আনন্দ! এ আনন্দে চক্ষু চাদরে আবৃত না করিলে—অনায়াসে অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠে

কাঁচা আম দুটো পেড়ে আন সখি
গুড় দিয়ে রাঁধগে অম্বল—

এ ছত্রে কবি প্রকৃত রসগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন; কারণ কাঁচা আমের এমন অম্বলের আস্বাদ সম্বন্ধে কাহারও মতবৈষম্য নাই। বসন্তের এই বিষয়ে একটু গৌরব আছে বটে কিন্তু আর কোনও বিষয়েই তার সম্বন্ধে কহিবার কিছু নাই।

আর কত বলিব, স্বভাব-কবিতায় কবিদের রসসাধনা যে নির্ভেজাল অসত্যের সাধনা, এমন সব বিষয় বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে।

তাঁদের প্রকৃতি সম্বন্ধে কল্পনাটাই ধরুন না কেন! এ ঠাকুরাণীকে আপনারা দেখিয়াছেন কি? যিনি পাতার ভিতর হাতছানি দেন, ফুলের উপর হাসিয়া উঠেন, তারার মালা গলায় পরেন, আকাশের বেনারসী শাড়ী পরিয়া লক্ষ দীপ জ্বালিয়া আরতি করেন, তাহাকে কেহ ইন্দ্রিয়গোচর করিয়াছেন কি? এই যে তারা, এ সম্বন্ধে যে সব উদ্ভট কল্পনার পরিচয় দিলাম এগুলি যে কি আজকাল তা কে না জানে। তার কোনটি বা পৃথিবীর মত আর বেশীর ভাগ তার চেয়ে অনেক গুণ বড়। তার মধ্যে অধিকাংশ ভয়ানক গরম—জ্বলন্ত আগুন। তাদের সম্বন্ধে এসব কল্পনা বহু শতাব্দী পূর্বে সম্ভব হইত: কিন্তু

বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানের ভিতর এমন কল্পনা করিয়া মানুষ ভুলাইবার চেষ্টা দুঃসাহসের কার্য্য।

এই তো গেল স্বভাব-কবিতা। মানুষ সম্বন্ধে কবিতা রচনায়ও কবিরা এই মিথ্যারূপী রসসাধনার প্রচুর পরিচয় দিয়াছেন। তার একটা দৃষ্টান্ত দেখুন প্রেমের কবিতায়। এই কবিতাগুলি এই হিসাবে বস্তুতন্ত্র বলা যায় যে, প্রেম জিনিষটাই একেবারে অসত্য নহে; কিন্তু কবি মহাশয়েরা অভ্যাস ক্রমে ইহার প্রকৃত স্বরূপটা চাপা দিয়া ইহার উপর একটি বিরাট মিথ্যার মন্দির রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বস্তুতঃ প্রেম এক প্রকার hypnotism বা মোহ। জীবজগতে hypnotism দ্বারা অনেক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কোনও কোনও জীব ইহার প্রয়োগ দ্বারা তাহার শিকারকে মুগ্ধ করিয়া অনায়াসে ভোজন ব্যাপার সমাধা করে। মানুষের মধ্যে এই hypnotism একটু উন্নত আকারে দেখা গিয়াছে। আমরা ইহা দ্বারা ঠিক খাদ্য আহরণ করিনা বটে, তবে আরাম করিয়া খাওয়া দাওয়া করিবার একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করি; কারণ সত্য প্রেম ব্যাপারটি এই যে ইহার দ্বারা পুরুষ স্ত্রীকে মুগ্ধ করিয়া তাহাকে আপনার সুবিধার জন্য নিয়ত নিযুক্ত রাখে। ইহার দ্বারা আমরা সংসার পাতি এবং সংসারের তাৎপর্য্য খাওয়া দাওয়ার সুবন্দোবস্ত করি।

এ প্রেম যে পরম মনোরম বস্তু, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার উপকারিতার কথা এক মুখে বলিলে ফুরায় না। এই ধরুন না আজ যে আমরা এখানে বসিয়া নির্বিঘ্নে আনন্দ করিতেছি, তাহা কেবল প্রেমের জোরে। অর্থাৎ ঘরকন্নার আহার সংগ্রহের চিন্তা অপর কেহ লইয়া বসিয়া আছে বলিয়া পারিতেছি।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা প্রেমে বঞ্চিত তাঁহারা এখানে বসিয়া ঠিক আমাদের মত আরাম বোধ করিতেছেন কিনা সে বিষয়ে আমার গুরুতর সন্দেহ আছে।

কিন্তু এই যে প্রেম, ইহার সার্থকতা সংসারে। অর্থাৎ যাহাতে ঘরকন্না হয় এবং মুগ্ধা নারী পুরুষের সুখ সম্পাদনের জন্য জীবন উৎসর্গ করে, তাহাই হইল পাকা প্রেম। আর এক'রকম প্রেম বরদাস্ত করা যাইতে পারে, যেমন প্রসন্ন গোয়ালিনী ও কমলা-কান্তের প্রেম। প্রসন্ন কমলাকান্ত ঠাকুরকে নিত্য দুধ জোগাইত। কিন্তু কবিদের কাছে এমন কথা বলিবার যো নাই। টাকা আনা পাইয়ের হিসাব, হাঁড়িকুড়ির কারবার হইতেই প্রেমের প্রকৃত পরিচয়; কিন্তু কবির প্রেম হইতে এ সব ব্যাপার একেবারে নির্বাসিত। কবির প্রেম এক উদ্ভট বস্তু। বিবাহের সঙ্গে তার সম্বন্ধ না থাকিলেই ভাল হয়; আর যদি বা স্বামী স্ত্রীর প্রেমটা মানিতেই হয় তবে তার ভিতর বিবাহ ও সংসারের ব্যাপারটা যত চাপা থাকে ততই ভাল। কবির কল্পনায় প্রেমের দেবতা বিবাহ প্রাঙ্গনের দ্বারে আসিয়া হাত পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসেন।

কবির কল্পনার প্রেম জগতে নাই; থাকিলেও সেটা মহা-ভাবনার বিষয় হইত। পূর্ব্বরাগ, অভিসার প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তুতে কবির আনন্দ, সমাজ যদি লাঠি ঠেঙ্গা লইয়া সেগুলিকে সর্ব্বদা বিতাড়িত না করিত, তবে সংসার অচল হইত—মানব সমাজ ছারখারে যাইত।

কবির প্রেম যে কি বস্তু তা বস্তুতন্ত্রতার দিক হইতে দেখিলে অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে। বাস্তব জীবনে কবির প্রেম যে কত অশোভন তাহা দুই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতে পারে। মনে, করুন আপনি সন্ধ্যাকালে কর্ম্মক্লান্ত হইয়া ঘরে ফিরিলেন,

আপনার স্ত্রী তাড়াতাড়ি কাপড় চোপড় ছাড়াইয়া, জলখাবারের বন্দোবস্ত না করিয়া, পাখা হাতে বীজন করিতে না বসিয়া, ফুলের পোষাক পরিয়া হাতে একগাছি ফুলের মালা লইয়া উঠানের নিমগাছ তলা হইতে আপনাকে সম্ভাষণ করিয়া গাহিলেন—

"বঁধু তোমায় করব রাজা তরুতলে,"

তখন 'পা' হইতে যে মাথা পর্য্যন্ত আগুন জ্বলিতে থাকিবে সেটাকে প্রেমের আগুণ কোন মতেই বলা চলে না। আর ও মনে করুন, দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত আপনি কাজের জের মিটাইয়া বাহির হইতে শয়নগৃহে আসিলেন। চক্ষু তখন ভারাক্রান্ত, শরীর শয্যালোলুপ। ঘরে গিয়া দেখিলেন শয্যা রচনার কোন আয়োজনই নাই। আপনার স্ত্রী আঁচল পাতিয়া দিয়া বলিলেন—

"এস এস বঁধু এস আধেক আঁচরে বস।"

এমন কত অবস্থার কল্পনা করা যাইতে পারে, যাহাতে কবিদের কল্পনার প্রেম একেবারে ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে কল্পনা করুন, আপনি শয়নাগারে গিয়া দেখিলেন স্ত্রীর যত্নে দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যা প্রস্তুত, বীজন হস্তে স্ত্রী প্রতীক্ষা করিতেছেন, আপনি চিৎপাত হইয়া শুইয়া পড়িলেন এবং তিনি বাতাস করিতে করিতে আপনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। প্রেমের কি জীবন্ত চিত্র !

মানব-ঘটিত কবিতার মধ্যে মিথ্যাকে সত্য ও মন্দকে ভাল করিবার চেষ্টা সবচেয়ে পরিস্ফুট যুদ্ধের কবিতায়। যুদ্ধ যে কি ব্যাপার তাহা আমরা এখন কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছি আর কিছু দীর্ঘ দিন চলিলে আরও ভাল রূপে বুঝিতে পারিব। তবু ত আমরা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে এত দূরে। যুদ্ধক্ষেত্রে যে কি ব্যাপার হয় সেটা আমরা কতকটা কল্পনা করিতে পারি। আমাদের কাছে

কাগজের ছুই একটি অঙ্কের পর গুটিকয়েক শূন্য দিয়া নিতান্ত শান্তভাবে যে ব্যাপারের পরিচয় দেওয়া হয়, যুদ্ধক্ষেত্রে সেটা হাজার হাজার কাটা মাথা—গুড়ুম গুড়ুম শব্দে কামান অগ্নি উদ্গার করিতেছে, টপাটপ মানুষ মরিতেছে, ঘরে ঘরে কান্নাকাটির রোল পড়িয়া গিয়াছে। এ ব্যাপারের মধ্যে যে মাধুর্য্য কোথায় তাহা খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। অথচ কবি মহাশয়রা দাঁড় করাইতে চান যে এটা একটা পরম মনোরম বস্তু। একটা কুকুর যদি পাখী মারিতে যায়, অমনি কবি তাহাকে ছন্দোবন্ধে গালি দিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু যখন ছুই দলে লাখ লাখ মানুষ পরস্পরকে মারিবার জন্য দাঁড়াইয়া যায়, সেটা তাদের কাছে বড়ই চমৎকার জিনিষ।

এমন একটা বীভৎস জিনিষকে সুন্দর করিয়া দাঁড় করাইতে গেলে মিথ্যা কল্পনা ছাড়া উপায় কি? তাই কবিরা একটি নামের সৃষ্টি করিয়াছেন—গৌরব। এক একটা কথা আছে তার মোহ বড় ভয়ানক। এ কথাটা সেই রকম—একবার কেহ মুখে বলিলে আর তার বিরুদ্ধে মাথাটি তুলিবার যো নাই।

আমাদের জীবন কত সুখের ও কত সুন্দর হইতে পারিত যদি এই যুদ্ধের গোলযোগ না থাকিত। যুদ্ধ ও যুদ্ধের নিয়ত আয়োজনে যে অর্থব্যয় হয় সেটা যদি আমাদের ভিতর ভাগ করিয়া দেওয়া হইত তবে আমাদের সুখের অবধি থাকিত না। কবি আপত্তি করিবেন "সুখ বল কাহাকে?" এমন একটা প্রশ্নও করিতে আছে? সুখ যে বুঝেনা তাহাকে কে বুঝাইবে? এই ধর যদি পাঁচবেলা পরিপাটি মুখরোচক ভোজ্যপেয় খাওয়া যায়, যদি একখানা সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাড়ী থাকে, গাড়ীজুড়ি মোটরকার থাকে, সুন্দর নরম বিছানা থাকে ও তাহা সদাসর্ব্বদা ব্যবহার করিবার অবসর থাকে, শীতের দিনে লেপকম্বল, গ্রীষ্ম-

কালে ইলেক্ট্রিক পাখা থাকে, আর যদি একটি পতিব্রতা স্ত্রী থাকেন—অর্থাৎ এমন স্ত্রী যিনি দিন রাত্রি আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজনে ব্যস্ত থাকেন এবং আমার আরাম ও বিশ্রামের ব্যাঘাত করিবার অবসর পান না—এইরকম আয়োজন যদি থাকে তবে সুখের কতকটা আস্বাদ পাওয়া যায়।

যুদ্ধের প্রধান দোষ এই যে ইহাতে আরাম জিনিষটা মোটেই থাকে না। যখন গোলা আসিয়া দমাস্ করিয়া বুকের উপর পড়ে বা মাথার উপর ফাটিয়া সব বিদঘুটে জিনিষ চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়, তাতে তো মোটেই আরাম হয় না। তা ছাড়া সদাসর্ব্বদা এমন একটা ব্যস্ততার ভিতর থাকিতে হয়, আহারাদির এমন অব্যবস্থা হয়, শয়নের আয়োজন বিষয়ে এতটা উদাসীন হইতে হয়, যে সুখ সুবিধার মুখও দেখিতে পাওয়া যায় না। যারা যুদ্ধ করে না, এমন কি যারা দূরে এই আমাদের মত থাকে, তাদেরও যে সুখস্বস্তির ভয়ানক অভাব হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

এমন যে যুদ্ধ তাতে নাকি গৌরব ?

"Theirs not to reason why
Theirs but to do or die—"

যেন ভারী একটা বাহাদুরী। Do and die ত কচুগাছ বিছুটি গাছগুলিও করে। মালী যখন অস্ত্র হস্তে তাহাদিগকে কাটিতে অগ্রসর হয় তখন তাহারা একটুও নুইয়া পড়ে না—মাথা সমান খাড়া করিয়া হাওয়ায় পতপত শব্দে নড়িতে থাকে। তারপর এক কোপ্, বস্ খতম। যদি অস্ত্রের বাঁট খাটো হয়, তবে বিছুটি মালীর হাতে হুল ফুটাইয়া দেয় কিংবা কচুর রসে তার হাত কুটকুট করে এই ত! Do and die এর আবার বাহাদুরী!

বিবেচনা করিয়া কাজ করায় যে মানুষের প্রকৃত গৌরব এ সত্যটা এমন করিয়া ওলট পালট করিয়া দেওয়া কবি ছাড়া আর কাহারও সাধ্য হইত না।

সংগ্রাম জিনিষটা কবিদের বড়ই পাইয়া বসিয়াছে। তাই যখন একটা জ্যান্ত যুদ্ধ না পান তখন তাঁরা ছোট ছেলেদের পাতানো সংসারের মত একটা মন ভুলান সংগ্রাম গড়িয়া লন তার নাম জীবন সংগ্রাম। ভাবটা এই যে, জীবনকে সংগ্রাম বলিয়া কল্পনা করিলে ইহা যেন গৌরবের সপ্তম স্বর্গে আরোহণ করিল। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, জীবনে আপনারা কয়জনে কয়টা সংগ্রাম লড়িয়াছেন ? হাসিয়া খেলিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া আমরা জীবন কাটাই সত্য ; কিন্তু লড়াইয়ের মুখ কয়জন দেখিতে পাই ? কবিরা বলিতে চান যেন পৃথিবীর সব লোক কেবল পরস্পরকে কাটিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত হইয়া আছে, তরোয়ালের সংঘর্ষ চারিদিকেই চলিতেছে। বলুন দেখি, এই সঙ্গতে এমন কেহ আছেন কি, যিনি মনে করিতেছেন যে আমার এই প্রবন্ধের পাতায় পাতায় তলোয়ার লুকানো আছে, একটু অসতর্ক হইলেই তাঁর মাথায় পড়িবে ? এমন কেহও আছেন যিনি মনে মনে আমাকেই এক ঘা দিবার জন্য সঙ্কল্প করিতেছেন ?

জীবন যে সংগ্রাম নয়, সেটা এমন সুস্পষ্ট যে তাহা বুঝাইবার দরকার নাই ; কিন্তু জীবনটাকে সংগ্রাম বলিয়া কবির দল সংসারে একটা মস্ত গণ্ডগোল বাধাইয়াছেন। তাহাদের মতে লোকে আর আয়েসের পথে চলিতেই চাহেনা ; তুমি জমিদার, পিতার প্রসাদে তোমার অর্থের অভাব নাই, অনায়াসে সমস্ত জীবন পরম সুখে কাটাইতে পার, তুমি কিনা ছুটিলে পাটের কারবারে, না হয় পক্ষী শিকারে, না হয় উড়িতে, না হয় নিদেন পক্ষে তোমার

প্রতিবেশীর আধছটাক জমি কাড়িয়া তিনবার প্রিভি কাউন্সিল পর্য্যন্ত মামলা করিতে? কেন? না তা না হইলে জীবনটা সংগ্রাম হইল কৈ? লড়িয়া বাহাদুরী না করিতে পারিলে যেন জীবনটা বৃথাই গেল। যে জীবনে একটা বড় কাজ করিয়া গেল অথচ একদিনের তরে সুখ পাইলনা তা'র জীবন নাকি সার্থকতার চরম আদর্শ। কেন? না জীবন সংগ্রাম—ইহাতে জয়ীরই গৌরব!

এমন একটা ভুল আদর্শ ঢুকাইয়া দিয়া কবির দল সংসারে এক মহাবিপ্লব উপস্থিত করিয়াছেন। ফলে, কেহই সুখ পাইতেছে না। জীবনের প্রকৃত আদর্শ যে সুখ, চার্ব্বাক Democritus ও Epicurus হইতে Mill ও Bain পর্য্যন্ত সকলেই একথা স্বীকার করিবেন। লড়াইয়ে সুখ নাই ইহাও স্বীকৃত, তবে সংগ্রামময় জীবন আদর্শ হয় কিসে? যে Garfield দীন কুটীরে জন্মিয়া বহুকষ্টে লেখাপড়া শিখিয়া, ততোধিক কষ্টে দু' পয়সা রোজগার করিয়া শেষে মহাক্লেশে আমেরিকার সভাপতি হইয়া গুলি খাইয়া মরিল, সে মস্ত আদর্শ স্থানীয় হইল কিসে? আর তুমি বড়লোকের ছেলে, শৈশব হইতে সারাজীবন নিরবচ্ছিন্ন আমোদে কাটাইয়া পুত্র পৌত্রাদি লইয়া, বৃদ্ধ বয়সে অঋণী অপ্রবাসী হইয়া জীবন যাপন করিতেছ, তুমি সকলের আদর্শ হইবে না কেন? ইহার কারণ এই যে, যুদ্ধের ঝোঁকটা কবিদের খুব পাইয়া বসিয়াছে, তাঁরা সব ব্যাপারের মধ্যে যুদ্ধ ও গৌরব না ঢুকাইতে পারিলে কিছুতেই খুসী হইতে পারেন না।

আর ও যুদ্ধে যে ব্যক্তি জিতিল সে যেমন লোকের কাছে তেমনি ইতিহাসের কাছেও জিতিয়া গেল। আর যে পরাজিত ও

পদদলিত সে যেমন সকলের মন হইতে মুছিয়া গেল, তেমনি জীবনেও কবিদলের প্রেরণায় আমরা জয়ীর উপাসক হইয়া উঠিয়াছি। জীবনে যে জিতিতে পারিল না, বড়লোক হইয়া উঠিতে পারিল না তাহাকে আমরা মোটেই আমল দিতে চাই না, তা হউক না তার অন্তর মহৎ, হউক না তার শক্তি অসাধারণ—যদি সুযোগের অভাবে, বিপদের অতিরিক্ত তীব্র আঘাতে জীবনে সফলতা লাভ না করিতে পারিল—তাকে তবে আমরা পায়ের উপরে কিছুতেই উঠিতে দিব না। আর যে অকর্ম্মণ্য নীচাশয়—সততাকে পদে পদে জলাঞ্জলি দিয়া সুযোগের হাওয়ায় উড়িয়া উপরে উঠিল, তা'কেই আমরা মাথায় করিয়া নৃত্য করি। ইহার জন্য দায়ী কে? আমি বলি জীবন-সংগ্রামবাদী কবি।

আর পুঁথি বাড়াইব না। কবিতার মাল-মশলার এই বিশ্লেষণ হইতে আপনারা অবশ্যই বুঝিতেছেন যে কবিতার রস হইতেছে মিথ্যা, ইহার লক্ষ্য দুঃখ। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও ভণ্ডামির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত, সত্য ও সুখ ইহার চিরশত্রু। সত্য ও সুখ যদি জীবনে চাহিবার মত একটা কিছু হয় তবে কবিতাকে সংসার হইতে ফুলের বাতাস দিয়া তাড়াইতে হয়। এমন যে কবিতা, তার ভিতর দুটো মিঠে আওয়াজ ঘুঙুরের মত ঝঙ্কার, মদের মত নেশা আছে বলিয়া কি আপনারা বরদাস্ত করিতে রাজী আছেন?

সঙ্কল্প—অগ্রাণ—১৩২৩

॥ ভাষার আকার ও বিকার ॥

বাঙ্গলা ভাষা—কোনটা তার ঠিক আকার কোনটা বা তার বিকার, কোনটা সাধু কোনটা অসাধু, কোনটা শিষ্ট কোনটা বা অশিষ্ট, এই কথা লইয়া বহু দিন হইল আলোচনা হইতেছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বাঙ্গলা বই লিখিতে আরম্ভ করেন তখন পণ্ডিত সমাজে এ কথাটা উঠিয়াছিল—কথা হইয়াছিল যে বিদ্যাসাগরী ভাষাটা ঠিক খাঁটি সংস্কৃত নয়, আর একটু সহজ ও সরল। বিদ্যাসাগরী ভাষা! তার সম্বন্ধেও এই কথা! কিন্তু ব্যাপারটা খুব ঘোরাল হইয়া উঠিল যখন টেকচাঁদ ঠাকুর তুলিলেন এই ভাষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা। তিনি সংস্কৃত একেবারে বর্জ্জন করিয়া ঠিক রোজ যে সব কথা ব্যবহার হয় সেই কথায় তাঁর "আলালের ঘরের দুলাল" রচনা করিলেন। তখন বিদ্যাসাগরী ও টেকচাঁদী দলে ঠোকাঠুকি লাগিয়া গেল, কেহ বলিল বিদ্যাসাগরের বাঙ্গলা সংস্কৃতের পোষ্যপুত্র, উহা বাঙ্গলা নহে—কেহ বলিল, ভাল বাঙ্গলার আদর্শ বিদ্যাসাগরী ভাষা, টেকচাঁদী ভাষা ছেবলার ভাষা, এ ভাষার লেখা বইয়ের এমন একটা ভঙ্গী আছে যাতে পিতাপুত্রে একসঙ্গে বসিয়া পড়িতে পারে না, যদিও ইহার বিষয় কিছুই দোষের না হউক।

এই আন্দোলন যখন চলিতেছে তখন বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে তাঁর উচ্চাসন বেশ গুছাইয়া লইয়াছেন। যদিচ তিনি "দুর্গেশ-নন্দিনী"তে বেশ একটু সংস্কৃত ঘেঁসিয়াই লিখিতে আরম্ভ করিয়া-ছিলেন, এমন কি নায়ক-নায়িকার প্রেম সম্ভাষণে বা ঠাট্টা তামাসাতেও যথেষ্ট সংস্কৃত ও সমাসযুক্ত শব্দ চালাইয়াছিলেন, তবু তিনি শীঘ্রই তাঁহার আপনার ভাষা—যে ভাষায় তাঁর নিজের

ব্যক্তিত্ব বেশ করিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে সেই ভাষা—পাইয়াছিলেন। সেই ভাষায় তিনি রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের টেকচাঁদী ভাষার সমালোচনার যে শক্ত উত্তর দিয়াছিলেন তাহা আপনারা বোধ হয় সকলেই জানেন।

তারপর এক শ্রেণীর লেখক দাঁড়াইলেন যাঁহারা বুঝিবা টেকচাঁদকেও ছাড়াইয়া গেলেন—রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সে তাঁর এই ভাব ছিল। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন যে তিনি ও রবীন্দ্রনাথ একখানা সংগ্রহ-পুস্তক বাহির করেন, তা'র ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন—"শ্রীকৃষ্ণের এই ছেলেমো ঢল ঢল কান্তি"। কথাটা শুনিয়া বঙ্কিমবাবু, যিনি টেকচাঁদীর পক্ষে উকীল হইয়াছিলেন—চটিয়া উঠিলেন এবং তাঁর কথায় "ছেলেমো" কাটিয়া "বালসুলভ" করা হইল।

রবীন্দ্রনাথের ভাষার মধ্যে নানা স্থলে নানা ভঙ্গী আছে, সংস্কৃতের শব্দসম্ভার, বাঙ্গলার শব্দের ইঙ্গিত, সমস্তই তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত ব্যবহার করিয়া এক এক ভঙ্গীতে লিখিয়াও আগাগোড়া ভাষার ভিতর এমন একটা জোর, এমন একটা প্রাণ ও একটা বৈচিত্র্য ঢুকাইয়া দিয়াছেন যাহা তাঁহার পূর্ব্বের কোনও লেখকের ভিতরই ছিল না। ইদানীং রবিবাবু তাঁর মধ্য যুগের সংস্কৃতবহুল ভাষা ছাড়িয়া আবার খাঁটি বাঙ্গলার দিকে বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে একদল লেখক, যাঁদের শক্তি এবং প্রতিভা রবির মত দ্যুতিমান না হইলেও বেশ স্পষ্টভাবে অনুমান করা যায়, তারা রবিবাবুর হালের এই ভাষার ভঙ্গীটাকে আদর্শ করিয়া তাদের গুরুকেও এ বিষয়ে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বিরুদ্ধ দলে একটা হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছে।

চলিত ভাষায় লিখিব না পোষাকী একটা ভাষায় ভাব প্রকাশ করিব এই কথা লইয়া বিদ্যাসাগরের যুগে যেমন আজও তেমনি দুই দলে বিরোধিতা জমিয়া রহিয়াছে। অবশ্য যাঁরা পুরাতনের বা পোষাকী ভাষার পক্ষপাতী তাঁরাও চান না যে বিদ্যাসাগরী ভাষা আবার ফিরিয়া আসুক। এমন খুব কম লোকই আছেন যাঁরা বিদ্যাসাগরের মত বা কালীপ্রসন্ন ঘোষের মত নির্ভাজ সংস্কৃতমূলক ভাষায় আগাগোড়া পুরা জোর রাখিয়া লিখিয়া যাইতে পারেন। আমার হয়তো এ বিষয়ে বিবেচনাটা খুব পাকা না হইতে পারে, কিন্তু মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ ছাড়া আজ-কালকার লেখকদের মধ্যে সংস্কৃত-ঘেঁষা ভাষায় সমান জোর রাখিয়া কাহাকেও লিখিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তবু জগদিন্দ্রনাথের ভাষা, এমন কি কালীপ্রসন্ন ঘোষের ভাষা, বিদ্যাসাগর বা অক্ষয়কুমারের ভাষার চেয়ে অনেক কম সংস্কৃত-ঘেঁষা। আজ যদি কেহ বিদ্যাসাগরের মত সীতার বিলাপ লিখিতে বসেন তবে নূতন পন্থী ও পুরাতন পন্থী কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। একটা দৃষ্টান্ত দেখাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। এই সেদিন শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় চলতি ভাষার উকীলদের উপর যে আক্রমণ করিয়াছেন, তাহার ভাষাব বিদ্যাসাগরী অপেক্ষা টেকচাঁদের ভাষার সঙ্গেই সাদৃশ্য বেশী। আজকালের পুরাতনপন্থীরা খুব বেশী দূর গেলে বঙ্কিমবাবুর ভাষা পর্য্যন্ত যাইতে চান—তাও হয়ত তাঁর "দুর্গেশনন্দিনী"র ভাষা তাহাদের পছন্দ হইবে না। নূতন পন্থীদের মধ্যে "সবুজ পত্রে" আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় যে ভাষার প্রচলন করিয়াছেন তাহার উপরই ইহাদের বেশী রাগ। তার বিশেষ কারণ বোধ হয় এই যে তিনি

কেবল কলিকাতার চলিত শব্দ ব্যবহার করেন না, সেই ভাষায় সুবন্ত তিঙন্ত এবং কৃৎতদ্ধিত ও চালান।

এই আন্দোলন যাহা এখন আবার নূতন হইয়া খুব বেগে দেখা দিয়াছে তাহাতে আমি যোগ দিব একথা এত দিন ভাবি নাই, কারণ আমার বরাবরই বিশ্বাস যে ভাষার আকারটা কিরূপ হইবে সে বিষয়ে বাক্‌বিতণ্ডার মত এমন নিষ্ফল আলোচনা আর নাই। এ পর্য্যন্ত কোনও প্রতিভাবান্ লেখক পরের বাঁধা ভাষার ভঙ্গী গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন· বলিয়া শোনা যায় না, সুতরাং আমরা মজলিস করিয়া বাক্‌বিতণ্ডা করিয়া যদিবা একটা ভাষার স্বরূপ বাঁধিয়া ঠিক করিয়া দিতে পারি, তার গণ্ডীর ভিতর আমরা প্রতিভাকে আটকাইয়া রাখিতে পারিব এরূপ আশা করা বড় স্পর্দ্ধার কথা। এই বিশ্বাসে আমি এ পর্য্যন্ত এই নিস্ফল আন্দোলনে যোগদান করি নাই। অবশ্য তাহাতে যে আমাদের ভাষা বা সাময়িক সাহিত্য খুব বেশী দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে এমন না হইতে পারে। কিন্তু, আমার মনে হয় যে উভয় পক্ষের উকীলের নিজ নিজ পক্ষ সমর্থনের ব্যগ্রতায় কতকগুলি গোড়ার কথা হইতে সবার দৃষ্টি যেন কিছু সরিয়া গিয়াছে। সেই কয়টি কথা একটু আলোচনা করিবার জন্যই আজ আমি আপনাদের বিরক্ত করিতে সাহসী হইয়াছি।

সাহিত্য একটা আর্ট। সব আর্টের মত ইহারও ভিতর ও বাহির দুইটা দিক আছে। ভিতরের জিনিষটা হইল ভাব ও বাহিরের জিনিষটা তাহা প্রকাশের প্রণালী, তাহার technique. ভিতরের জিনিষটাই আর্টের প্রকৃত সম্পদ, কিন্তু সেটা যদি অতি নোংরা ভাবে প্রকাশ করা যায় তবে সেটা লোকের মনের ভিতর পৌঁছায় না বলিয়াই techniqueএর যা কিছু সমাদর। মনে

করুন একটি কবির মনে একটি সুন্দর ভাব ফুটিয়াছে, তিনি যদি তুলি লইয়া সেই ভাবটি প্রকাশ করিবার চেষ্টায় কেবল কতকগুলা রং ছড়াইয়া যান, তবে তাঁর মনের ভাব তিনি অপরের মনে ঠিক পৌঁছাইতে পারিবেন না। অপর পক্ষে যদি সেই ভাব লইয়া একটি কৃতী শিল্পী নিপুণভাবে রঙের প্রয়োগ করিয়া একটি ছবি আঁকেন তবে তাহাতে ভাবটি এমন ভাবে ফুটিয়া উঠিবে যাহাতে তাহা একেবারে লোকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিবে।

সুতরাং এই প্রকাশের ব্যাপারে বাহাদুরী না থাকিলে তুমি ভাব সম্পদের যত বড় ধনী হও না কেন সাহিত্যে তোমার স্থান নাই। কিন্তু সব জাতির ভাষা যে কারণে মুখে মুখে নানারূপ হইয়া যায়, ঠিক সেই কারণেই এই প্রকাশের প্রণালী সম্বন্ধে কোনও বাঁধা একটা মানদণ্ড করা যায় না। একথা বলা চলে না যে ঠিক এমনি করিয়া প্রকাশ না করিলে তোমার ভাব বাজারে কাটিবে না। গোটা তিন চার মৌলিক রঙ লইয়া, তুলি টানিবার দুই চারটি ভিন্ন ভঙ্গিতে সব চিত্রকর কাজ করেন, কিন্তু প্রতিভাবান চিত্রকর এমন কেহ হন নাই যাঁর technique ঠিক আর কোনও চিত্রকরের হুবহু নকল। ছবি আঁকার নানা প্রণালীর নানা school বা বিদ্যাবংশ জগতে দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির মূলে কোনও মহাপ্রতিভাশালী চিত্রকরের কলা-বৈচিত্র্য, তাঁহার technique এর বিশেষত্ব। কিন্তু তাই বলিয়া Raphael এর প্রণালী ভাল আর Rembrandt এর প্রণালী ভাল নয়, Reynolds এর প্রণালী অনুসরণ যোগ্য, Turner এর চিত্র আদর্শ স্থানীয় হইতে পারে না এমন কথা বলা যায় না। Rembrandt যদি Raphael এর প্রণালী নকল করিতেন তবে তাঁহার ছবি যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা অপেক্ষা ভাল হইত একথা বলা চলে না।

আসল কথা প্রত্যেক কলাবিদের প্রণালী তাহার প্রতিভার ফল। প্রতিভাবান শিল্পীর বিশেষত্ব কেবল ভাবে নয় তাহা প্রকাশের প্রণালীতেও ফুটিয়া উঠিবেই। সেখানে যদি তাঁহার বিশেষত্বটাকে চাপিয়া রাখা যাইত তাহা হইলে তাঁহার প্রতিভার বিকাশ হইত না। কেবল প্রতিভা-বৈচিত্র্য নয়, বিষয়-বৈচিত্রেও technique এর প্রভেদ হইতে বাধ্য। এক এক প্রণালীর এক একটা বিশেষত্ব আছে ও এক এক প্রকার ভাব প্রকাশের পক্ষে বিশেষ উপযোগিতা আছে যাহা অপর প্রণালীতে কিছুতেই পাওয়া যায় না। Hogarth এর ব্যঙ্গচিত্র যদি Raphael এর প্রণালীতে অঙ্কিত হইত তবে তাহার অপূর্ব্ব প্রতিভার প্রকাশ তো হইতই না, তাহার রসিকতা একেবারে মাঠে মারা যাইত। ব্যঙ্গচিত্র Pen and Ink এ যতটা খোলে Oil Painting এ তেমন খুলিতেই পারে না। তৈলচিত্রের ভিতরেও, Raphael এর বিষয়গুলির সঙ্গে তাঁহার পদ্ধতি যেমন খাপ খায় অন্য বিষয়ের সঙ্গে তেমন খাপ খায় না। শান্ত স্নিগ্ধ মাতৃমূর্ত্তি বা St. Sicily বা স্বর্গের শিশু গায়কদের ছবি যেমন Raphael এর চিত্রকলায় খোলে ভাবের সংঘর্ষপূর্ণ ছবি সে প্রণালীতে তেমন খোলে না। তার পক্ষে বরং Rembrandt এর প্রণালী শ্রেষ্ঠ।

চিত্রকলা সম্বন্ধে যে কথা সাহিত্যের আর্ট সম্বন্ধে সে কথা ষোল আনা খাটে। একই সময় Shakespeare ও Ben Johnson কবিতা লিখিয়াছেন, Bacon দর্শন ও ব্যবহার আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের ভাষা কি এক? এক Shakespeare এর ভিতরই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভাষার ভঙ্গী ভিন্ন। Burke এর বক্তৃতা ও প্রবন্ধ খুব ওজস্বী, Bright এর বক্তৃতার জোরও কম নহে; কিন্তু Burke কে যদি Bright এর ভঙ্গীতে বলিতে বাধ্য করা

হইত কিম্বা Bright কে Burke এর ভাষায় কথা কহিতে হইত ভাবে কি বিসদৃশ ব্যাপার দাঁড়াইত! এ প্রভেদ যে কেবল ভাষার একটা ভঙ্গীতে তাহা নয়, প্রায়ই শব্দচয়নের প্রভেদ হইতে এই প্রভেদ জন্মায়। Burke এর সবচেয়ে ভাল অংশগুলিতে ল্যাটিন গ্রীক কথার ছড়াছড়ি—Bright যেখানে খুব তেজের সহিত খুব অন্তঃস্পর্শী ভাষায় কথা কহিতেছেন সেখানে তাঁহার ভাষা প্রায় নিভাঁজ Anglo-Saxon. Dickens চলতি ভাষা বা slang এর ব্যবহার করিয়া কথায় যে রকম জোর দিয়াছেন, তাঁহাদের যদি কেবল পুঁথির ভাষা ব্যবহার করিতে হইত তাহা হইলে সে জোর সে ভাষায় থাকিতে পারিত না। Samuel Weller কে যদি Dickens কেতাবী ভাষায় কথা বলাইতেন তবে Pickwick Papers এর অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য মাটি হইত। আর আজকালকার সবচেয়ে শক্তিমান বক্তা Lloyd George কে যদি নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া যাইত যে slang ব্যবহার করিতে পারিবে না তবে বোধ হয় তাঁহার শক্তির অর্দ্ধেকটা অপ্রকাশ থাকিত।

আজকালকার ইংরাজী সাহিত্য ও ইংরাজী বক্তৃতাগুলি পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে ইহার মধ্যে এমন একটা নূতন ভঙ্গী আসিয়াছে, এমন একটা নূতন শক্তি জাগিয়া উঠিয়াছে যাহা সেকালে ছিল না। ইহা চল্‌তি ভাষাটা খুব বেশী পরিমাণে সাহিত্যের ভিতর আসিয়া পড়ায়। অনেকে মনে করেন ইহাতে ইংরাজী ভাষার অবনতি হইয়াছে—Classic ইংরাজী উঠিয়া গেল বলিয়া অনেকে দুঃখ করেন। যাহা গিয়াছে তাহা যে মন্দ, তা'র যে কতকগুলি বিশেষ গুণ নাই এমন কথা কে বলিবে? কিন্তু যাহা নূতন হইয়াছে তাহারও গুণের দিকটা না দেখিলে চলিবে কেন? প্রকৃত প্রস্তাবে যে ভাষায় যার প্রতিভা পরিস্ফুট হয়

সেইটাই তা'র ভাষা। সুতরাং ভাষাটা ভাল না মন্দ সে বিষয় বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে দুইটি জিনিষ, প্রথম লেখকের প্রতিভা আছে কিনা, এবং সে প্রতিভা তাঁহার ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছে কি না, কথাটি লেখক যে ভাবে লিখিয়াছেন তাহা তাঁহার ভাবের পরিপূর্ণ ব্যঞ্জক কিনা। তাহা ছাড়া আর একটা সাধারণ দিক দেখিবার আছে সেটা এই যে ভাষাটা আর্ট হিসাবে সুন্দর হইয়াছে কিনা—অর্থাৎ আমাদের সৌন্দর্য্যবুদ্ধির কাছে সেটা ভাল লাগে কিনা। এক হিসাবে ইহা পূর্ব্বের বিষয়টির আর এক দিক মাত্র, কারণ আর্ট হিসাবে সুন্দর না হইলে ভাবের পূর্ণ ব্যঞ্জনা হইতে পারে না, আর ভাব যদি সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠে তবে ভাষার কোন কলাঘটিত ত্রুটি থাকিতে পারে না—তা' হউক না ব্যঞ্জনা কলায় তখনকার প্রচলিত রীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি কোন লেখকের ভাষা এই ওজনে ঠিক দাঁড়াইয়া যায় তবে তাঁহাকে মন্দ বলিতে গেলে আমাদের সমালোচনা ঠিক দাঁড়াইবেনা। তখন যদি আমরা খুঁটিয়া দেখিতে বসি যে লেখক কোন কথাটি কোন দেশ হইতে লইয়াছেন ভাষার ভঙ্গীটি পূর্ব্ব বা পশ্চিম বা উত্তর বা দক্ষিণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহা লইয়া ভাষার গুণাগুণ বিচার করিতে বসি তবে আমাদের সমালোচকের মর্য্যাদা হারাইতে হইবে। কারণ একথা এখন না মানিয়া উপায় নাই যে শব্দের মধ্যে কুলীন অকুলীনে ভেদ নাই। শব্দ জগতে এমন কেহ অন্ত্যজ নাই যাহাকে আমরা গণ্ডী বাঁধিয়া সাহিত্য হইতে দূরে রাখিতে পারি। মানুষের ভাব সম্পদ নানাদিক দিয়া বাড়িয়া চলিতেছে, সাহিত্যের ভিতরে বা সাহিত্যের বাহিরে নিয়তই একটি চেষ্টা চলিতেছে নূতন নূতন ভাব প্রকাশ করিবার বা পুরাতন ভাবের নূতন প্রকাশ বাহির

করিবার। সেই চেষ্টার ফলে নূতন শব্দ বা শব্দ সমাসের সৃষ্টি হইতেছে, কতক বা সাহিত্যে কতক বা অসাহিত্যিক লোকের মুখে মুখে। এবং প্রায়ই এমন দেখা যায় যে লৌকিক শব্দের ভিতরে এমন একটি কথার সৃষ্টি হইয়াছে যাহাতে একটি ভাব যেমন সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয় প্রচলিত সাহিত্যের কোনও শব্দ বা প্রবন্ধে তেমন সুন্দররূপে তাহা হয় না। আমরা যদি পণ করিয়া বসি যে সাহিত্যে যে শব্দ চলিয়া গিয়াছে তাহা ছাড়া বাহিরের কোনও শব্দ বা শব্দসমষ্টি, লৌকিক কোনও ধাতু বা নূতন কোনও প্রত্যয় গ্রহণ করিব না এবং কেহ গ্রহণ করিলে তাহাকে অপপাত্রিত করিব—এবং যদি আমরা এ পণ রক্ষা করিতে পারি তবে আমরা লাভ কি করিব জানি না, কিন্তু আমরা হারাইব অমূল্য সম্পদ— ভাষাকে সমৃদ্ধ করিবার একটা উৎকৃষ্ট উপায় অবহেলা করিব।

কোনও শব্দ বা শব্দসমষ্টি বা কথা কহিবার কোনও ভঙ্গী আমরা সাহিত্যের কুলীন সমাজ হইতে বাহিরে রাখিব এ কথা বলা চলে না। সব কথাই সাহিত্যে চলিতে পারে, কিন্তু শুধু দেখিতে হইবে যে তাহা মানাইয়া চালান হইল কি না। ভাষার একটা প্রাণ আছে তা'র সঙ্গে সমীকৃত করিয়া যে শব্দ ব্যবহার করিব তাহাই সাহিত্যে চলিবে—ভাষার প্রাণের সঙ্গে মিলাইয়া না লাগাইতে পারিলে সে শব্দ খাপছাড়া হইয়া থাকিবে। তাহাতে ভাষা কদর্য্য হইবে। সুতরাং কথাটা বা কথার ভঙ্গীটা কোন দেশের তাহাতে কিছু আসে যায় না। দেখিতে হইবে যে তাহা মানানসই হইয়াছে কিনা, তাহাতে ভাষার শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধি হইয়াছে কি না।

বাস্তবিক কোনও একটা তর্কের উত্তেজনায় ছাড়া আমরা ভাষা সমালোচনার এ নিয়মের ব্যতিক্রম করি না। সবুজপত্রের

সম্পাদক বা রবীন্দ্র বাবুকে যাঁরা কলিকাতার কথা ব্যবহারের জন্য তিরস্কার করেন তাঁহারা রামপ্রসাদের গানের ভিতর কোনও ভাষার ক্রুটি পাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গান বাঙ্গালার সব প্রদেশের লোকের মুখে লাগিয়া আছে কিন্তু তা'র বার আনা খাঁটি কলিকাতার ভাষা। দীনবন্ধুর নাটক সম্বন্ধেও কেহ এ আপত্তি করেন না, বাউলের গান প্রভৃতি গ্রাম্য সঙ্গীতে ভাষার প্রাদেশিকতা সকলেই অনায়াসে হজম করিয়া থাকেন। সুতরাং কলিকাতার ভাষা ব্যবহার হইয়াছে বা কোনও প্রাদেশিক ভাষার ভেজাল পড়িয়াছে বলিয়াই যে পুরাতন-পন্থীরা সব সময়ে ভাষার দোষ ধরেন এ কথা সত্য নহে। কোনও একটা লেখার ভঙ্গী যদি আমাদের পছন্দ না হয় তবে অনেক সময় তার এটা সেটা লইয়া দোষ ধরি। বাস্তবিক সে দোষকে যে সব সময়েই আমরা দোষ বলিয়া মনে করি তাহা নাও হইতে পারে।

এখন কথা উঠিয়াছে যে রবীন্দ্র বাবু যদি কলিকাতার ভাষা চালাইতে চান তবে আমরা কেন না ঢাকার ভাষা চালাইব। রাজসাহীর লোক কেন না রাজসাহীর ভাষা চালাইবেন? আমি বলি কোনও বাধা নাই, যদি আমাদের সে শক্তি থাকে, যাহাতে ঢাকার ভাষাকে ভাষার প্রাণের সঙ্গে মিলাইয়া দিতে পারি। রবিবাবু ইহা করিয়াছেন তাঁহার দেশের ভাষা লইয়া—আমরা পারিব কি? যদি পারি, এবং যদি আমাদের লেখার মধ্যে সেই প্রতিভার বিকাশ থাকে তবে সমস্ত বঙ্গবাসী আদর করিয়া আমাদের লেখা পড়িবে। Burns তাঁহার প্রাদেশিক ভাষায় যাহা লিখিয়াছেন সমস্ত ইংরেজ তাহাকে ইংরাজী ভাষায় মূল্যবান সম্পত্তি বলিয়া মনে করে। Scott এর গ্রন্থে Scotch ভাষার ছড়াছড়ি বলিয়া তাঁহার বই যে কোনও ইংরাজ তাহার শেল্ফ

হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে এরূপ শোনা যায় নাই। পুরাতন পন্থীর ইহাতে প্রথম আপত্তি, যে যদি সবাই তা'র নিজ নিজ প্রাদেশিক ভাষায় গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করে তবে বাঙ্গলা ভাষা এক থাকিবে না বহু হইয়া যাইবে এবং আমরা পরস্পরের কথা বুঝিতে পারিব না। এটা বাড়াবাড়ি। প্রথম আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে বাঙ্গলা ভাষার একটা প্রাণ আছে তার সঙ্গে সমীকরণ না হইলে কোনও কথা বা কোনও কথার ভঙ্গী সাহিত্যে চলিবে না; সুতরাং যাহা কিছু লিখিলেই যে সাহিত্যে চলিয়া যাইবে এমন নহে। দ্বিতীয়তঃ কথিত ভাষা শুনিয়া সকলের সব দেশের কথা বুঝিতে পারা কঠিন হইলেও সেই ভাষাটা লেখা হইলে বোঝা তত কঠিন হইবে না। আর যদি কোনও প্রতিভা-বান লেখকের লেখায় এমন কথা থাকে যাহা আমি জানি না, চেষ্টা করিয়া আমি সে কথা শিখিয়া লইব, যেমন আমরা সবাই অল্পবিস্তর চেষ্টা করিয়া স্কটের উপন্যাস পড়িবার জন্য ঝুড়ি ঝুড়ি স্কচ কথার মানে শিখিয়াছি।

ইঁহাদের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে যদি কলিকাতার কথা দিয়াই ভাষার নমুনা ঠিক করিয়া দেওয়া হয় তবে পূর্ব্ববঙ্গের লোক আমরা বড় বিপদে পড়িব, কারণ কলিকাতার ভাষা তো আমরা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারি না! কিন্তু কলিকাতার চলতি কথায় আমাদের লিখিতেই হইবে এমন কথা কে কবে বলিয়াছে—যদি কেহ বলিয়া থাকে—এ বিবাদে সঙ্গত হউক অসঙ্গত হউক কি কথা যে না বলা হইয়াছে তাহার ঠিকানা নাই—যদি কেহ বলিয়া থাকে তবে সেও সমান ভুল করিয়াছে। যদি কেহ ভাষার একটা বাঁধা নমুনা ধরিয়া বলে যে এমনটি না হইলে তোমার ভাষায় স্থান নাই, সেই ভ্রান্ত। আমরা লিখিব বাঙ্গলা

ভাষা, তা' এক একজনের লিখনভঙ্গী এক এক রকম হইবে বইকি! কেউবা শব্দ চয়ন করিব বেশীর ভাগ সংস্কৃত হইতে, কেউ বা যত্নের সহিত চয়ন করিব পূর্ব্ববঙ্গেরই ভাষা হইতে সেই শব্দ ও ভাষার ভঙ্গী, যাহাতে ভাষার শক্তি বৃদ্ধি হয়। যদি আমার সে প্রতিভা থাকে তবে আমার শব্দবিন্যাস এরূপ হইবে যে তাহাতে ভাষার বিচিত্র শক্তি হইবে ও ভাষা আমার সমৃদ্ধ ভাবের যোগ্য বাহন হইবে—তবে সেই ভাষার সৌষ্ঠব আদর করিয়া প্রশংসা করিবে সকল দেশের লোক।

রবীন্দ্রবাবু ও তাঁহার বর্ত্তমান পন্থা যাঁহারা অনুসরণ করিতেছেন তাঁহারা ভাষার এই স্থায়ী উপকার করিতেছেন—যে তাঁহারা কথিত ভাষার সম্পদ ও শক্তিতে সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও ওজস্বী করিয়া তুলিতেছেন। এই যে ভাষার শক্তির একটা অপরিজ্ঞাত উৎস ইহা টেকচাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করিয়াছেন এবং তাঁহার রচনার মুখে ইহার বিচিত্র লীলা দেখাইয়া তিনি আমাদের প্রশংসা আকর্ষণ করিতেছেন। আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, চলতি ভাষায় এমন অনেক কথার ভঙ্গী আছে যার পুরা জোরটুকু সাধু ভাষায় তরজমা করাই চলে না। "সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে আর আমি ফিরছিনে,"—একথাটা সাধু ভাষায় ঠিক এই force রক্ষা করিয়া বলা যায় কিনা জানি না। এখানে "ফিরছিনে" কথাটার ভিতর এমন একটা ঝোঁক আসিয়া পড়ে যার সম্পূর্ণ অর্থ "ফিরিতেছি না" "ফিরিব না" "কদাপি ফিরিব না" প্রভৃতি কোনও কথায় প্রকাশ হয় না।

রবীন্দ্রনাথের আজকালকার রচনা হইতে এমন শত শত দৃষ্টান্ত অনায়াসে দেখান যায় যাহাতে কথিত ভাষার এই শক্তি ফুটিয়া বাহির হয়। এইটাই আমাদের বিশেষ করিয়া ভাবিবার

ও দেখিবার বিষয়; এই যে কথিত ভাষার শক্তি ইহা কেমন করিয়া সাহিত্যের ভিতর সুন্দর ভাবে গ্রহণ করা যায় তাহা আমাদের বিশেষ অনুশীলনের বিষয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার হালের রচনায় এই চলিত ভাষার প্রয়োগের সুন্দর নমুনা দেখাইয়া দিয়া আমাদের এ নূতন পথে আলো দেখাইয়া চলিয়াছেন।

রবীন্দ্রবাবু শুধু ইহাই দেখাইয়াছেন যে কথিত ভাষার দ্বারা আমাদের ভাষা সমৃদ্ধ হইতে পারে এবং আমাদের ইহাকে সেই সম্পদ দিতে হইবে। তিনি একথা কোনও দিন বলেন যাই যে সে সম্পদ কেবল কলিকাতার কথারই আছে, আর, আমরা পারি না পারি, কলিকাতার কথা আমাদের লিখিতেই হইবে! কথাটা এই যে কথিত ভাষাকে সাহিত্যের ভিতর টানিয়া আনিয়া ভাষার শক্তি ও সৌষ্ঠব বাড়ান যায় কিনা। কোথাকার কথিত ভাষা সেটা মোটেই ভাবিবার কথা নয়। শক্তি যে বাড়ে, সৌষ্ঠব যে পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে, রবীন্দ্রনাথের রচনাই তাহার পরিচয়। শুধু কলিকাতার ভাষা বা চলতি ভাষার ব্যবহার হইয়াছে বলিয়াই যদি আমরা তাহার উপর চটিয়া না বসি তবে একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমার প্রতিপাদ্যটা সংক্ষেপে এই যে ভাষার একটা কোনও বাঁধা নমুনা এবং শব্দের একটা নির্দিষ্ট সমষ্টি লইয়া যে আমরা গণ্ডী বাঁধিয়া দিব ইহা হইতেই পারে না। যাহার শক্তি যে প্রণালীতে পরিস্ফুট হয়, যে তাহার প্রতিভা যে উপায়ে ফুটাইয়া তুলিতে পারে সেই তাহার প্রণালী, সেই তাহার উপায়। সে যদি চল্‌তি ভাষার আশ্রয় লয় তাহাতে ভাষার শক্তি বৃদ্ধি হইতে পারে যদি সে ভাষা ঠিক লাগাইবার ক্ষমতা তাহার থাকে—তাহার সৌন্দর্য্যের অন্ধি সন্ধি যদি তাহার এমন জানা থাকে যাহাতে শব্দ বিন্যাসে সে সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিতে পারে।

তবে কথা হইতে পারে যে শিক্ষানবিশদের কাছে কোন আদর্শ উপস্থিত করিব? ইহার সহজ উত্তর এই যে প্রতিভাবান লেখকদের আদর্শই আদর্শ, তাহাদের পথই পথ। ছেলেদের যদি বাঙ্গলা শিখাইতে চাই তবে তাহাদের ইহা বলিলে চলিবে না যে তোমরা বিদ্যাসাগর ও বড় জোর কালীপ্রসন্ন ঘোষ ছাড়া অন্য কাহারও আদর্শ অনুকরণ করিও না।

তাহাদের সম্মুখে রাখিতে হইবে সকল শ্রেষ্ঠ লেখকের লেখা,—বিদ্যাসাগর হইতে টেকচাঁদ, কালীপ্রসন্ন হইতে রবীন্দ্রনাথ—সকলের লেখা পড়িয়া তাহাদিগকে অবসর দিতে হইবে বাঙ্গলা ভাষার শক্তির কেন্দ্রগুলি আয়ত্ত করিতে—সেই কেন্দ্রগুলি আয়ত্ত হইলে, সে নিজের শক্তি ও প্রতিভার উপযোগী ভাষা আপনি গড়িয়া লইতে পারিবে। আমরা যতই কেন ঝগড়া করি না, আমাদের বিচারের ফল যেন ছেলেদের মুখের ভিতর গুঁজিয়া না দিই। সাধুভাষা বা কথিত ভাষার গুণাগুণ বা জাতিকুল লইয়া আমরা যতই বিচার করি না কেন, শব্দ বা রচনাপ্রণালীর একটা আর্য্য-সমাজ গড়িয়া অন্ত্যজ ভাষাকে তফাৎ রাখিবার যত চেষ্টা করি না কেন প্রকৃত প্রতিভাবান লেখকের রচনা হইতে আমোদ লাভ ও তাহার সম্যক অনুশীলনের সুযোগ হইতে যেন আমরা পরবর্ত্তীদের বঞ্চিত করিবার চেষ্টা না করি। চেষ্টা করিলে তাহা ব্যর্থ হইবে—ব্যর্থ না হইলে আমরা ভাষা ও সাহিত্যের গুরুতর ক্ষতি করিব।

পরিশেষে একটা কথা বলা বোধ হয় আবশ্যক। কথিত ভাষায় লিখিতে গেলেই যে তা'র ভিতর প্রাদেশিকতা আসিয়া পড়িবেই একথা আমি স্বীকার করি না। কথিত ভাষায় আমাদের দেশভেদে যতই কেন তফাৎ থাক না, মোটের উপর সে ভাষারও

বেশীর ভাগ কথা সকল দেশেই এক, তফাৎটা কেবল উচ্চারণের। কতক কথা অবশ্য ভিন্ন—সুবন্ত ও তিঙন্ত প্রয়োগ বা কৃৎ তদ্ধিতের চেহারা হয়ত খুবই ভিন্ন—কিন্তু এত ভিন্ন নয় যাতে তাকে এক-খাঁচে, একটা standard dialect এ দাঁড় করান না যায়। কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিলে বোধহয় কথাটা স্পষ্ট হইবে। বাঙ্গলার যে প্রদেশেই যাই না কেন কথিত ভাষায় "যাহার" বা "তাহার" কথার প্রয়োগ দেখিতে পাইব না; দেখিতে পাইব "যার" ও "তার"—তার উচ্চারণে কোথাও যার "য" টা z এর মত হইয়াছে, কোথাও বা সহজ j, কোথাও বা খুব sharp j—হইয়াছে। "পুকুর" কথাটা সকল দেশে না চলিলেও বেশ ব্যাপকভাবে প্রাদেশিক ভাষায় রহিয়াছে—তবে কোথাও বা তাহাকে বলে "পুকুর" কোথাও "পুখুর" কোথাও "পুখোইর"। "কাত" কথাটা সব দেশেই আছে। তবে কোনও দেশে তা'কে বলে সোজাসুজি "কাৎ," কোথাও বলে "কাইৎ"। এখন অনেক শব্দ চলতি কথায় আছে। আর ক্রমশঃই সেগুলির একটা standard উচ্চারণ দাঁড়াইয়া যাইতেছে, সেটা যে সব সময় খাঁটি কলিকাতার উচ্চারণ তাহা নহে। এই ধরুণ "দুপুরে"র খাঁটি কলিকাতার কথা "দুকুর" কিন্তু standard ভাষায় সেটা "দুপুর"—লুচিকে "নুচি" এবং "নৌকা"কে "লৌকো" standard ভাষায় বলে না। "করলুম" ও "গেলুম" এর চেয়ে "করলাম" ও "গেলাম" এই standard ভাষায় চলতি বেশী। এই যে standard ভাষা, ইহার উচ্চারণ প্রণালী অনুসরণ করিয়া যদি এই সব শব্দ লেখা হয় তবে বাঙ্গলায় কোনও দেশ নাই যেখানে ইহা বোধগম্য হইবে না। কতক কথা —বিশেষতঃ কতকগুলি নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষের নাম আছে তার সম্বন্ধে একথা বলা যায় না যথা, কলিকাতার ভাষায় ধুচুনি,

চুপড়ি প্রভৃতি, আমাদের ভাষায় ছোচা, ধুতি প্রভৃতি। তাও জিনিষের কথা লিখিতে গেলে প্রাদেশিক ভাষার ব্যবহার ছাড়া তো উপায় নাই। হোচা বা খরা বলিতে যে জিনিষ বুঝায় এবং হোচা বাওয়া বা খরা বাওয়া যে ক্রিয়ার নাম তাহাকে আমরা সাহিত্যের ভিতর আসিতে দিব না একথা বলা চলে না। আর যদি সাহিত্যে আনিতে হইলে তাহার একটা পোষাকী নাম দিতে যাই তাহা হইলে যে একটা কঠিন ব্যাপার হইবে। সুতরাং হোচা বাওয়ার কথা যদি আমার লিখিতেই হয় তবে "হোচা-বাওয়াই" লিখিতে হইবে। এবং যিনি আমার কথা বুঝিতে চান তাঁকে অনুগ্রহ করিয়া এই কথাটির মানে শিখিবার কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। তবে যাহা বলিতেছিলাম, এই শ্রেণীর প্রাদেশিক কথার সংখ্যা—সর্ব্বপ্রদেশের সাধারণ কথার তুলনায় কম। এমন কথা ব্যবহার করিবার অবসর খুব বেশী হয় না। এবং কদাচিৎ যাহা ব্যবহার করিতে হইবে সেই কথা লইয়া যে বিভ্রাট তাহাকে অতিমাত্র বাড়াইয়া একটা ভাষার বিভীষিকার সৃষ্টি করা সঙ্গত নয়।

এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আমাদের মনে রাখা উচিত যে আমরা একটা আর্টের সমালোচনা করিতেছি। যে ভাষার সমালোচনা করিতেছি তাহাতে ভাষার সৌষ্ঠব ও শক্তি কতটা রক্ষা হইয়াছে কেবল তাহাই আমরা বিচার করিতে পারি। সেই বিচারে যাহা ভাল দাঁড়াইবে তাহাই ভাল, যাহা মন্দ হইবে তাহাই মন্দ; তারপর তাহা হইতে হিত কি অহিত হইবে, সমাজের পক্ষে সেটা উপকারী হইবে কি অপকারী হইবে, জাতীয় একতার অনুকূল কি প্রতিকূল হইবে সে বিচার কেবল সাহিত্য হিসাবে সমালোচনায় মোটেই প্রাসঙ্গিক নয়।

॥ নবযুগের কথাসাহিত্য ॥

আজকাল কথাসাহিত্যে একটা নূতন রকমের সৃষ্টির ঢেউ আসিয়াছে। তাহার আঘাতে সমালোচক, পাঠক, ও অপাঠক জনসাধারণ বড় আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছেন; সমালোচকের চেয়ে পাঠক বেশী আর পাঠকের চেয়ে অপাঠক আরও অনেক বেশী। যে বই পড়ে, সে সে বই সম্বন্ধে যত মতামত প্রকাশ করে, যে পড়ে না সে তার চেয়ে অনেক বেশী মতামত প্রকাশ করে।

এই নূতন সাহিত্যের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নাই। ইহাতে আর কিছু হুউক বা না হউক এই কথাটা প্রমাণ করে যে এ সাহিত্য এ দেশে একটা নূতন ধারার সৃষ্টি করিয়াছে এবং সে ধারাটা সমাজের চিত্তকে অল্পবিস্তর আঘাত করিয়াছে। ইহা একেবারে নগণ্য বলিয়া অগ্রাহ্য করিবার বস্তু নয়। এই সব অভিযোগের মধ্যে দুইটি কথা বিশেষভাবে সকলে বলিতেছে; প্রথমতঃ, এ সাহিত্য সম্পূর্ণ বিলাতী, ইহার পাত্র ও পাত্রীগুলি ধুতি ও শাড়ী পরা সাহেব ও মেমসাহেব মাত্র। তাদের মনটা পরিপূর্ণরূপে বিলাতী এবং সমাজের পক্ষে তাহা সম্পুর্ণরূপে অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, এই সব বইয়ের প্রতিপাদ্য যাহাই হউক এ গুলির মালমশলার ভিতর এমন সব কদর্য্য জিনিষ আছে যাহা নীতি ও ধর্ম্ম বিগর্হিত ও সুরুচির পরিপন্থী। ইহাতে পাঠকের নৈতিক অবস্থা উন্নত না করিয়া অবনত করে।

প্রথমেই বলিয়া রাখি যে বর্ত্তমান নূতন ঢেউয়ে ইউরোপের নানা দেশের অতি আধুনিক সাহিত্যের অপটু নকলের চেষ্টায় এমন কতকগুলি গল্প লেখা হইয়াছে যাহার সম্বন্ধে এ অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বাঙ্গলার দেশ ও

সমাজের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃষ্টি না করিয়া, ফ্রান্স বা নরওয়ে বা রাশিয়ার জীবনের পরিচায়ক কথাসাহিত্যে হুবহু নকলে যে শাড়ী পরা মেমসাহেব এবং নিন্দনীয় কুরুচির কতক পরিমাণে সৃষ্টি হইয়াছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সব অস্থায়ী বুদ্বুদ স্বরূপ যে সব বই বা গল্প লেখা হইতেছে তাহা দিয়া নবযুগের সমগ্র সাহিত্যের বিচার করা চলে না। নবযুগের সাহিত্যের বিচার করিতে তার মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী তাহার দ্বারাই পরিমাপ করিতে হইবে। এইসব কথায় যে ধারার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাকেই কেবলমাত্র নযযুগের কথাসাহিত্যের নিদর্শন ও পরিচয় বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সুতরাং নূতন বর্ষার ধারায় জীবনপ্রাপ্ত হইয়া ব্যাঙের ছাতার মত প্রচুর পরিমাণে এবং তাহারই মত অস্থায়ী যে নানা কথা নানাদিকে ফুঁড়িয়া উঠিতেছে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া নবযুগের কথার মধ্যে যে সব বই প্রকৃত স্থায়ী সাহিত্য বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে কেবল তাহাদের সম্বন্ধেই এই অভিযোগের আলোচনা করা সঙ্গত।

প্রথম অভিযোগ এই যে, যে সব পাত্র পাত্রী লইয়া হালি-সাহিত্যের কারবার তাহারা বাঙ্গালী নয়, তাদের প্রাণের কথা বাঙ্গালীর প্রাণের কথা নয়। যে সব বই কেবলমাত্র বিদেশী সাহিত্যের অপটু অনুকরণ মাত্র নয়, যার ভিতর সত্য সাহিত্য পদার্থ আছে, তার সম্বন্ধে একথা বলিবার পূর্ব্বে একটু স্মরণ রাখা আবশ্যক যে বাঙ্গালীর প্রাণ শত বর্ষ পূর্ব্বে যাহা ছিল আজ তাহা নাই। শাড়ী পরা মেমসাহেব এক হিসাবে আজ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে। আমাদের আজকালকার মনের কথা, আজকালকার আশা আকাঙ্ক্ষা, আজকালকার কর্ম্মপ্রেরণা যে একশো বা দেড়শো বছর পূর্ব্বেকার চেয়ে অনেকটা ভিন্ন এবং সে বিভিন্নতার ভিতর যে

বিলাতী সাহিত্য সমাজ প্রভাব খুব বেশী পরিমাণে আছে সে কথা অস্বীকার করিলে চলে না।

সমাজের বারো আনা লোক একথা অস্বীকার করে সত্য। বেশীর ভাগ লোকের বিশ্বাস যে তাহারা তাদের পিতৃপিতামহের ক্ষুন্ন পথেই ঠিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। ইহার কারণ এই যে, সমাজের বেশীর ভাগ লোকের ভিতর এই পরিবর্ত্তনটা এত আস্তে আস্তে হইতেছে যে, সব সময় আমরা টের পাই না যে আমরা বদলাইয়া যাইতেছি। কৈশোরে যেমন ছেলেরা বাড়ে অথচ নিজেরা টের পায় না যে তাহাদের শরীরটা কিছুমাত্র বড় হইয়া চলিয়াছে শেষে হঠাৎ একদিন একটা পুরাতন জামা পরিতে গিয়া আবিষ্কার করিতে বসে যে জামা ছোট হইয়া গিয়াছে, সমাজও তেমনি দিন দিন ভয়ানক পরিবর্ত্তিত যাইতেছে অথচ সমাজ সেটা টের পায় না। এই টের না পাওয়ার আর একটা বড় কারণ এই যে, আমাদের চোখের সামনে সর্ব্বদাই আর একদল লোক রহিয়াছে যাহারা আমাদের চেয়ে খুব বেশী পরিমাণে বদলাইয়া গিয়াছে। তাদেরকে আমরা আচারে ব্যবহারে প্রায় সাহেব হইতে অভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করি। সাধারণের চক্ষে তাঁরা যত বড়ই সাহেব হউন না, আপনাদিগকে তাঁহারা সাহেব বলিয়া মনে করেন না, বরং তাঁদের মধ্যে অনেকের ভিতর জাতীয়তা বোধটা খুব প্রবল ভাবেই আছে। কিন্তু তবু সাধারণ লোকের চেয়ে ইঁহারা সাহেব হইয়াই গিয়াছেন। ইঁহাদের সঙ্গে আপনাদিগকে তুলনা করিয়া আমরা মনে করি যে, ইঁহারাই ভয়ানক বদলাইয়া গিয়াছেন, আমরা ঠিক যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি।

অথচ জীবনের ছোট খাট খুঁটি নাটি বিষয় হইতে আরম্ভ

করিয়া খুব বড় বড় কথা আলোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, আমরা বাস্তবিক অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছি। খুব যে রক্ষণশীল সেও যে কতটা বদলাইয়াছে তাহা সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষণ করিলেই দেখা যাইবে। রামচন্দ্র রায় সাহেবী পোষাক পরেন না, শ্যামচন্দ্র পরেন বলিয়া রামচন্দ্র শ্যামচন্দ্রকে সাহেব বলেন কিন্তু রামচন্দ্রের পায়ে ডারবী সু এবং মৌজা, মায় সস্পেণ্ডার শক্ত কফ্ ও কলার সম্বলিত সার্ট এবং তদুপরি কোর্ট, তার মাথার চুলটি দশ আনা ছয় আনাই হউক বা হাল কোনও বিলাতী ফ্যাসনেই হউক ছাঁটা এবং তার টেড়িটিও আধুনিক। মুখে তার সিগারেট এবং বাড়ীতেও হয় তো তিনি সিগারেটই পান করিয়া থাকেন, হুকা কলিকার হাঙ্গামা পোহাইতে প্রস্তুত নন। বাড়ীতে তিনি টেবিল চেয়ারে বসিয়া কাজ করেন; তৃষ্ণার্ত্ত হইলে তিনি বরফ লেমনেড বা ওই রকম আর কিছু খাইয়া তৃষ্ণা নিবারণ করেন, এবং সেটা কাচের গেলাসে। তারপর তিনি টোস্ট সহ চা পান করেন ইত্যাদি। তবু দেখা যায় রামচন্দ্র, শ্যামচন্দ্রকে দিন রাত বলিয়া থাকেন, বাপপিতামো'র রেওয়াজ ছাড়িয়া রাতরাতি সাহেব বনিবার চেষ্টা কিছু নয়, এবং শ্যামচন্দ্রের সঙ্গে দিনরাত আপনাকে তুলনা করিয়া নিজেকে নিতান্ত সনাতন পন্থী বলিয়া মনে করেন।

একথা মনে হইতে পারে যে এসব পরিবর্ত্তন বাহ্যিক, আমাদের অন্তর যেটা সেটা এখনও খাঁটি বাঙ্গালী আছে। আমাদের অন্তর যে খাঁটি বাঙ্গালীর অন্তর সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই, কিন্তু বলা বাহুল্য ইহা শত বর্ষ পূর্ব্বের বাঙ্গালীর অন্তর নয়; ইহা আজকার বাঙ্গালীর অন্তর। খাঁটি বাঙ্গালীর

চিত্ত ইংরাজী ও অন্যান্য প্রভাবে নানারূপে রূপান্তরিত হইয়া আজকালকার বাঙ্গালীর অন্তরে পরিণত হইয়াছে।

বাহ্যিক আচার ব্যবহার ষোল আনা বাহ্যিক নয়। এক তো বাহ্যিক ব্যবহার মাত্রই একটা আন্তরিক ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার পরিচয়। অপর পক্ষে বাহ্যিক আচারে অন্তরটা অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। সামান্য একটা দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইব। এখন রেলগাড়ী ট্রামগাড়ী হইয়াছে, দশটা পাঁচটা স্কুল কলেজ আফিস প্রভৃতি হইয়াছে। এখন সবাই রেলে ও ট্রামে চলাচল করিতে অভ্যস্ত, সময় দেখিয়া কাজ করা এবং চেয়ার টেবিলে বসিয়া কাজ করা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। এখন আমাদের যদি এক সুদূর পাড়াগাঁয়ে ধীর মন্থর অনিশ্চিত গতিতে নৌকায় চলাচল করিতে হয়, বা এমন জমীদার বা মহাজনের সঙ্গে কারবার করিতে হয় যাঁর সময়ের কোন একটা ঠিক-ঠিকানা নাই, কিম্বা একটা খারাপ পাড়াগাঁয়ের রাস্তায় চলিতে হয় তবে আমরা অস্থির হইয়া উঠি। কেন? একদিন আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা এই সব রীতিতেই কাজ কর্ম্ম করিতেন এবং তাহাতে কোনও অস্বস্তি বোধ করিতেন না। আজ আমরা করি কেন? ইহার কারণ এই যে আজকালকার রেল টেলিগ্রাফ প্রভৃতি, আজকালকার দেশব্যাপী এই কর্ম্মপদ্ধতি আমাদের স্বভাব ও আমাদের দৃষ্টিক্ষেত্র বদলাইয়া দিয়াছে। আজ আমরা ঠিক সেকালের আমরা নই। এ শুধু এই ব্যাপারেই নয়। সব বিষয়েই এইরূপ হইয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে খাদ্যে তৃপ্তিলাভ করিতেন আজ আমাদের তাহা মুখে রোচে না, যে সব খেলায় তাঁরা আমোদ পাইতেন সেগুলি আমাদেরকে একটুকুও আনন্দ দিতে পারে না। ঠিক সেকালের যাত্রা বা পাঁচালী

সহিষ্ণুতার সহিত শ্রবণ করিতে আজকালকার খুব অল্প লোকেই পারেন। সেকালে নারীর যে প্রসাধন নারী ও পুরুষের সমান মনোরঞ্জন করিত আজ তাহা হাস্যাস্পদ; যে সব কথার ভঙ্গী হাস্য পরিহাস সেকালে চলিত ছিল, আজ তাহা কেবল ব্যঙ্গ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

কেন হয়? একদল লোক আছেন তাঁহারা বলেন যে এ কেবল আমাদের বিলাতীর নকলের ফল। আমাদের সেকালের জীবন যাহা ছিল তাহাই খাঁটি বাঙ্গালীর জীবন; দেড়শো বছর ধরিয়া আমরা ক্রমে একটা বিজাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বিলাতীর নকল করিয়া একটা অসত্য কৃত্রিম জীবন সৃষ্টি করিয়াছি। ইহা বাঙ্গালীর জীবন নয়, ইহার ভিতর বাঙ্গালীত্বের পরিচয় নাই, আমরা আমাদের অন্তরের বাঙ্গালীর প্রাণকে পিষিয়া মারিয়া একটা মুখোস পরিয়া কলের পুতুলের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। ইহার ভিতর সত্য কিছুই নাই।

যাহা হইয়াছে তাহা ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে একথা আমি আলোচনা করিতে চাই না। এই সব পরিবর্ত্তনের ফলে আমরা উন্নত হইতেছি, না অবনতি ও ধ্বংসের পথে চলিয়াছি সে কথা তুলিতে চাই না। সে আলোচনায় এমন অনেক কথা ওঠে যাহা আমার বর্ত্তমান বিষয়ের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অবান্তর। আমার প্রতিপাদ্য শুধু এই কথা যে, পরিবর্ত্তন হইয়াছে—কেবল যাঁরা সাহেব বনিয়া গিয়াছেন শুধু তাঁরাই নন, যাঁরা আজকালকার নিষ্ঠাবান সনাতনপন্থী তাঁদের ভিতরও প্রগাঢ় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আর যতই কেন ঘাড় নাড়িয়া আমরা তাহাকে অস্বীকার করিতে চেষ্টা করি না কেন, এ পরিবর্ত্তনকে অসত্য বা অবাস্তব বলিবার আমাদের কোনও অধিকার নাই।

ইহা যে কেবল মাত্র বিলাতীর জড়বৎ অনুকরণের ফল তাহা নহে। সামান্য কয়েকজন লোক সম্বন্ধে এবং সামান্য কয়েকটা বিষয় সম্বন্ধে হয় তো একথা বলা চলে যে, তাহা সম্পূর্ণ মেকি, কেবল মাত্র বিলাতীর অপ্রবুদ্ধ অনুকরণের ফল। কিন্তু সমগ্র জাতীয় জীবনে যে এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ইহা কেবল বিলাতীর নকল নয়। আমাদের জীবনে যে নূতন আবেষ্টনের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার আঘাতে আমাদের জাতীয় জীবনের অনুকূল ও প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার ফলে এই নূতন জাতীয় চিত্র ও চরিত্র গঠিত হইয়াছে। ইহা ভাল হউক মন্দ হউক, ইহা সত্য এবং সত্য জীবনের প্রকাশ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

অনেক সময় শুনিতে পাই যে, এই যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে সে প্রধানতঃ কেবল পুরুষ সমাজে, বাঙ্গালী নারী এ পরিবর্ত্তনের ধার ধারেন না। বঙ্গ নারী আজও তাঁর সেই সনাতন অন্তর লইয়া আমাদের ঘরে ঘরে অধিষ্ঠিত আছেন। ইহা সম্পূর্ণ অসত্য। নারীকে আমরা বাহির হইতে যতই সযত্নে আগলাইয়া রাখি না কেন, তাঁহাদের ভিতরও আমাদের ভিতর দিয়া এই পরিবর্ত্তনের ধাক্কা পৌঁছিয়াছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আজ কালকার বাঙ্গালী নারী বেহুলাও নন, খুল্লনাও নন, ভারত চন্দ্র যে বাঙ্গালী নারীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তিনি তাহাও নন। তার একটা সামান্য পরিচয় এই যে, আজকাল কার বঙ্গনারী বেশ ভূষা করেন নূতন রকমের, স্বামীর সহিত পত্র ব্যবহারে শিশু বোধকের আদর্শ ব্যবহার করেন না, দাশরথী রায়ের পাঁচালীর চেয়ে বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস আগ্রহের সহিত পড়েন, এবং পাল্কীর দরজা বন্ধ করিয়া পুঁটুলির মত বাহিত হন না। রেল ষ্টীমারে মানুষের মত হাঁটিয়া বসিয়া যাতায়াত করেন।

এই তো গেল সাধারণ সমাজের কথা। তা ছাড়া আজকাল একটা মস্ত সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে যাঁরা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিবিধ বিদ্যালাভ করিয়াছেন, যাঁরা সমগ্র জগতের সঙ্গে সংযোগ রাখিয়া ভাবনা চিন্তা করেন, এবং যাদের চিন্তা ও জীবনের ক্ষেত্র সাবেক অবস্থা হইতে খুব বেশী পরিমাণে ভিন্ন। তাঁদেরকে ভাল বা মন্দ কিছুই বলিতে চাই না। শুধু এই কথা বলিতে ইচ্ছা করি যে, তাঁরা সমাজের সাধারণ লোকের চেয়ে অনেকটা অগ্রসর—অর্থাৎ সমাজের এখনকার গতি যে পথে সে পথে ইঁহারা অন্যান্য লোকের চেয়ে অনেকটা বেশী দূর অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন। ইঁহাদের ভিতর আধুনিক জগতের সমস্ত ভাব ও আদর্শ কার্য্য করে, ইঁহাদের কথায় বার্ত্তায় আচারে ব্যবহারে আধুনিক জগতের জীবনের খুব একটা সুস্পষ্ট ছাপ আছে। ইঁহারা সংখ্যায় নিতান্ত অল্প নন, এবং সমাজের মধ্যে ইঁহাদের একটা প্রকাণ্ড স্থান আছে।

এই সব ব্যক্তি কিম্বা ইহাদের চরিত্রের ছায়াপাতে যাঁহাদের জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে তাঁহারাই নব যুগের কথা সাহিত্যের পাত্র পাত্রী। কাজেই তাঁদের কথাবার্ত্তা বা কার্য্য কর্ম্ম যে ঠিক সেকেলে বাঙ্গালী পুরুষ বা নারীর মত হইবে না, ইহা বিচিত্র কি? এবং ইহাদের কথাবার্ত্তা বা কার্য্য কলাপের ভিতর খুব আধুনিক একটা রস থাকা নিতান্তই স্বাভাবিক। ইঁহাদিগকে বিচার করিতে গিয়া একশত বৎসরের পুরাতন বাঙ্গালী নরনারী কিম্বা আজকালকার মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে পশ্চাতে পড়িয়া আছেন তাঁদের আদর্শে ইহাদের যাচাই করিয়া ইঁহাদিগকে ধুতি শাড়ী পরা সাহেব মেম বলিয়া টিটকারী দেওয়া বিচিত্র নহে। ইঁহারা সাহেব মেম কিনা সে কথাটা তো বিচারের বিষয় নয়। কথাটা এই যে, ইঁহারা বাস্তবিক সত্য কিনা? আজকালকার বাঙ্গালী সমাজে ঠিক এই

সব নরনারী আছেন কিনা? বলা বাহুল্য যাঁরা সূক্ষ্মভাবে সমাজের সংবাদ রাখেন তাঁরা জানেন যে এমন রক্ত মাংসে গঠিত নরনারী বঙ্গ সমাজে আছেন, এবং তাঁরা সত্য। এই সব নরনারীর চিত্র হিসাবে এ গল্পগুলি সত্য।

যাঁরা এই পাত্র পাত্রীকে সাহেব ও মেম বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান, তাঁরা প্রায়ই ভুলিয়া যান যে, আধুনিক শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের পাত্র পাত্রী একটা আদর্শ বা idea-র প্রতীক কিম্বা একটা type নন, তাঁরা individual. একটি বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনের ভিতর বিশিষ্ট ঘটনা সমাবেশের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সত্য ও নিপুণ ভাবে চিত্রিত করাই উপন্যাসের সার্থকতা। এ সম্বন্ধে একমাত্র বিবেচনার কথা এই যে, বাস্তবিক সেই বিশিষ্ট ব্যক্তি সত্য সত্যই সংসারে সম্ভব কিনা, এবং যে বিশিষ্ট আবেষ্টনের ভিতর তার জীবন অঙ্কিত হইয়াছে তার ভিতর তাহা ঠিক তেমনি করিয়া গড়িয়া ওঠা সম্ভব কিনা। তাহা যদি সম্ভব হয়, যদি ইহাদের সব কথা ও কার্য্য সেই বিশিষ্ট আবেষ্টনের ভিতর সত্য ও স্বাভাবিক বলিয়া পরিগণিত হয়—এবং যদি এই জীবনের পরিকল্পনায় প্রকৃত আর্ট থাকে, তবে সে উপন্যাস সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার নাই। তেমন পুরুষ বা নারী যে খুবহামেষা দেখা যায় না, শত করায় একটি কিম্বা পঞ্চাশটি, এ সব কথার আলোচনা একেবারে নিষ্প্রয়োজন ও নিরর্থক—কেননা ইহারা type নহে individual. অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, সমালোচকেরা individual কে type বলিয়া ধরিয়া লইয়া অযথা প্রমাদগ্রস্ত হইয়াছেন এবং তাঁদের নিজেদের ভ্রম লেখকের স্কন্ধে চাপাইয়া তাহাকে গালি গালাজ করিয়াছেন।

নব যুগের কথা সাহিত্যের বিরুদ্ধে অভিযোগের দ্বিতীয় দফা, ইহার দুর্নীতি।

দুর্নীতির পরিপোষক যে সাহিত্য তাহা যে নিন্দনীয় সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ নীতিতে সমাজের স্থিতি, দুর্নীতিতে তাহার অবনতি। সুতরাং যে কথা দুর্নীতিমূলক, যাহা দুর্নীতির প্রচার করে তাহা সমাজের পক্ষে যে অমঙ্গলকর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই সহজ সত্যটা বর্ত্তমান যুগের কথা-সাহিত্য সম্বন্ধে যেভাবে প্রায়ই প্রযুক্ত হয় তাহার ভিতর অনেকটা গোলযোগ আছে। এমন বই যে আজকাল রচিত হইয়াছে যাহাতে দুর্নীতি প্রশ্রয় পায় সে কথা আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু যে সব বই নীতির খাতিরে সব চেয়ে বেশী নিন্দিত হইয়াছে তার মধ্যে অনেকগুলি এ শ্রেণীর নয়।

প্রথম একটা কথা আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে চাই। কোনও কথার অংশ বিশেষে নীতিবিরুদ্ধ কথা থাকিলেই তাহা দুর্নীতির পোষক হয় না। দেখিতে হইবে যে, বই খানার সমগ্র উদ্দেশ্য দুর্নীতির পোষক কিনা। "কৃষ্ণকান্তের উইলে" রোহিণীর মুখে বঙ্কিম বাবু নানা স্থানে এমন কথা বলিয়াছেন যাহা সুনীতি-বিরুদ্ধ। "বিষবৃক্ষেও" এমন কথা আছে। "চন্দ্রশেখরের" শৈবলিনী তো একটা জীবন্ত দুর্নীতি। কিন্তু এই সব গ্রন্থে দুর্নীতির পোষণ করা হয় নাই। সমগ্র গ্রন্থের নৈতিক উদ্দেশ্য মন্দ নহে, কাজেই গ্রন্থের অংশ বিশেষে কথাবস্তুর স্ফুরণের জন্য বা চরিত্রাঙ্কনের প্রয়োজনে নীতিবিরুদ্ধ কথা থাকিলেও এসকল গ্রন্থ নিন্দনীয় নহে। দেখিতে হইবে বই খানায় পাপকে লোভনীয় ও অনিন্দনীয় বলা হইয়াছে কিনা, তার ভিতর flavour of vice আছে কিনা।

এই হিসাবে নিন্দার হাত এড়াইতে হইলেই যে বইখানাকে একখানা হিতোপদেশের মত নীতিগর্ভ উপদেশমূলক বস্তু হইতে

হইবে, পাপের পরাভব ও পুণ্যের জয় দেখাইতে হইবে—এমন নহে। পুণ্যের জয় ও পাপের ক্ষয় অনেক সময় এমন সাজান ভাবে দেখান যাইতে পারে যাহাতে লোকের মনের উপর কোনও ক্রিয়াই হয় না। অপর পক্ষে পুণ্যের পরাজয় ও পাপের প্রতিষ্ঠায় পরিসমাপ্ত গ্রন্থও পাপের প্রতি বিদ্বেষ বাড়াইয়া দিতে পারে। Hamlet-এ যে নায়কের মৃত্যু হইল, নিরপরাধী Opheliaর মৃত্যু হইল তাহাতে রাজা ও রাণীর পাপের উপর পাঠক বা দর্শকের বিরক্তি ক্ষীণতা প্রাপ্ত না হইয়া বরং বর্দ্ধিত হইয়া ওঠে। "রাজা ও রাণী," "নীল দর্পণ" প্রভৃতি tragedy-র সম্বন্ধেও একথা খাটে। প্রকৃত কুশলী শিল্পী কথারচনায় পাপকে এমনভাবে ব্যবহার করিতে পারেন যে, পাপের ঠিক রূপকথার রাক্ষসের মত পরাভব না হইলেও পাপের প্রতি বিরাগ পরিপূর্ণরূপে পাঠকের মনে ফুটিয়া ওঠে।

অনেক সময় নবযুগের কথাসাহিত্যের দুর্নীতি সম্বন্ধীয় আলোচনা পড়িয়া আমার মনে হইয়াছে যে সমালোচকের চিত্ত ঠিক রূপকথার শ্রোতাদের মানসিক অবস্থা হইতে অধিক পরিণতি লাভ করে নাই। শিশুর কাছে রূপকথা বলিতে গেলে, রাক্ষস, দানব বা দৈত্য যে থাকুক তার খুব নিষ্ঠুর ভাবে বিনাশ সাধন হইলে শিশুরা আনন্দে নাচিয়া ওঠে। তার চেয়ে কমে তাহাদের চিত্ত কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না। "ঘরে বাইরে"তে নিখিলেশের শোচনীয় পরিণতির ভিতর পুণ্যের জয় ও পাপের অত্যন্ত পরাভবের অভাব সত্ত্বেও যে ধর্ম্মের গৌরবের একটা সুন্দর পরিচয় আছে তাহা উপভোগ করিবার মত সূক্ষ্ম অনুভূতি তাঁহাদের নাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের হাতে এত লাঞ্ছিত হইয়াছেন। বিমলা মনের দুঃখে গলায় দড়ি দিয়া কাপড়ে কেরোসিন লাগাইয়া পুড়িয়া মরিলে তাঁদের তৃপ্তি হইত। কিন্তু সেই মামুলি পরিণতি

সম্পাদন করিয়া গল্পের আর্টের মুণ্ডপাত করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক রসজ্ঞ রবীন্দ্রনাথের গলায় দড়ির ব্যবস্থা করিতেন।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে দুর্নীতির প্রচার অতীব গর্হিত হইলেও যাহা কিছু আমাদের প্রচলিত নীতি জ্ঞানের বিরুদ্ধ তাহারই প্রচার নিষিদ্ধ হইবার যোগ্য নয়। একথা আজ সকলেই জানে যে, সমাজের বিবর্ত্তননীতি হইতে নীতিশাস্ত্রও বাদ যায় না। কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় সে সম্বন্ধে সব যুগে এক নিয়ম খাটে না। আমাদের শাস্ত্রে প্রবল রাজার পক্ষে দুর্ব্বলের রাজ্য জয় করা একটা পরম ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত ছিল, আজ সবাই জানে যে, তাহা গুরুতর অপকার্য্য। এমন হাজার হাজার দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। তা' ছাড়া যুগে যুগে ধর্ম্মাধর্ম্মের গুরুত্ব লঘুত্ব ঘটিত তারতম্য বিষয়ে লোক মতের পরিবর্ত্তন হয়। সেকালের দণ্ড-নীতির সঙ্গে আধুনিক দণ্ড নীতির তুলনা করিলে এ বিষয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যুগে যুগে নৈতিক জগতে revaluation of values বা নৈতিক মূল্যের কমি বেশী হইতেছে।

হিন্দুসমাজে এমন এক সময় ছিল যে, নারীর পক্ষে সতীত্বহানি খুব গুরুতর দোষ বলিয়া পরিগণিত ছিল না, এবং স্থলবিশেষে কঠোর সতীত্বের আদর্শ ত্যাগ করা ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত ছিল—যথা নিয়োগধর্ম্মে। কিন্তু কালাত্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক আবেষ্টনের পরিবর্ত্তন হইলে, নিয়োগবিধি পরিত্যক্ত হয়, নারীর সতীত্বের মূল্য বাড়িয়া যায় আর অসতীর প্রতি শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্তের বিধান উত্তরোত্তর কঠোর হইয়া উঠে। এমনি revaluation of values সমাজের ভিতর দিনরাত চলিতেছে। কতকগুলি বিষয়ে আমরা নীতির এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য না করিয়া নির্ব্বিবাদে মানিয়া লই, কিন্তু স্থল বিশেষে আমরা এই মন্থরগতির

পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারি না, এবং প্রাচীন শাস্ত্র বাক্য বা চিরাগত সংস্কার আশ্রয় করিয়া পরিবর্ত্তনকে অস্বীকার করিতে থাকি।

পিতৃভক্তি চিরদিনই ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত কিন্তু ইহার নৈতিক ওজন সব সময়ে সমান থাকে নাই, থাকিবে না। রামচন্দ্র পিতৃবাক্যে তাঁর সত্য পালনের জন্য রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনবাসের কষ্ট গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ অতি উচ্চ আদর্শ, এবং পিতৃভক্তি অবশ্য পালনীয় ধর্ম্ম। কিন্তু আজ কালকার দিনে আত্ম প্রতিষ্ঠার ধর্ম্মের মর্য্যাদাটা এত বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, যদি কোনও লোক কেবল পিতার একটা খেয়াল মিটাইবার জন্য তার নিজের আত্ম-প্রতিষ্ঠা হইতে আপনাকে বঞ্চিত করে তবে তাহাকে লোকে নিন্দা না করিলেও মূর্খ বলিতে দ্বিধা করিবে না! আর ব্রজেশ্বরের মত যদি কেহ আজ পিতার খেয়াল মিটাইবার জন্য নিরপরাধী পত্নীকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দেয় বা পত্নীর নির্য্যাতন ঘাড় পাতিয়া লয় তাহাকে লোকে প্রশংসা তো করিবেই না, নৈতিক হিসাবে হীন বিবেচনা করিবে।

সুতরাং শ্রীরামচন্দ্রের যুগের আদর্শ হইতে বর্ত্তমান যুগের আদর্শ যে বহুপরিমাণে ভিন্ন হইয়া গিয়াছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেই যে সেকালের বাঁধা মন্ত্র আছে,

"পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

ইহার ফলে আমাদের অনেকে এই সত্যের মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে স্বীকার করিয়া লইতে মহাকুণ্ঠিত। এখনও তাঁরা জোর গলায় বলিতে চান যে, এই সনাতন শাস্ত্রবাক্যই বিংশ-শতাব্দীরও ধর্ম্ম, চত্বারিংশ শতাব্দীরও ধর্ম্ম থাকিবে। চারিদিক

দিয়া সমাজে এ আদর্শ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, পিতৃভক্তি ধর্ম্মের একটা নূতন স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, পিতার প্রীতি সম্পাদনের কর্ত্তব্যের নানা উপাধি সংযোগ করিয়া দৈনিক ব্যবহারে আমরা তার স্থান নিরূপণ করিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু মুখ ফুটিয়া যদি কেউ একথা বলিতে যায় যে, সকল স্থানে সকল অবস্থায় পিতার বাক্য পালন ধর্ম্ম নয়, তবেই সর্ব্বনাশ! আমার একবার এ অভিজ্ঞতা হইয়াও ছিল। এক সময় দেশের কোনও কাজের জন্য আমি নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইয়াছিলাম। সভায় আমি অনেক স্থানে বলিয়াছিলাম যে, দেশের ডাক যদি পরিণত বয়স্ক কেহ অন্তরের ভিতর অনুভব করিয়া থাকে, দেশের জন্য কোনও একটা কাজ করা যদি সে আবশ্যক ও সঙ্গত বিবেচনা করে, তবে পিতামাতা যদি অন্যায়রূপে তার বিরোধী হন তবে সেখানে পিতামাতার অবাধ্য হওয়াই পুত্রের ধর্ম্ম। এ কথায় নানাস্থানে একটা ভয়ানক গোলযোগ হয় এবং আমি আমাদের সমাজের একটা স্থায়ী ভিত্তি ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছি বলিয়া অনেকে আমাকে স্বচ্ছন্দ-ভাবে গালাগালি দেন।

একথা এখানে উত্থাপন করিবার তাৎপর্য্য এই যে, কোনও একটা মত বা কর্ম্মনীতি পুরাকালের কোনও নীতিবাক্যের বা প্রচলিত সংস্কারের বিরোধী হইলেই তাহাকে দুর্নীতি বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলে না। সমাজের ভিতর revaluation of values নিরন্তর চলিতেছে, কতক সময় আমরা সেটা টের পাই এবং স্বীকার করি, কতক সময় টের পাই না, কিম্বা স্বীকার করি না। কোনও লোক তা সে ঔপন্যাসিক হউক বা অন্যলোক হউক, যদি আমাদেরকে যেই নূতন values অনুসারে কোনও কথা বলেন বা ব্যবস্থা দেন, তবে তাঁহার প্রতি রক্ষণশীল সমাজ যে

খড়্গ হস্ত হইয়া উঠিবেন এবং তাহাকে নীতিবিরোধী সাব্যস্ত করিবেন তাহা স্বাভাবিক, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁর কথা যে দুর্নীতির পোষক হইবেই, একথা বলা চলে না।

ঔপন্যাসিক যদি বাস্তবিক এ নামের যোগ্য হন এবং তাঁর যদি সত্য কথা বলিবার সৎসাহস থাকে তবে তিনি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সমাজকে দর্শন করিয়া যে চিত্র আঁকিবেন তাহাতে নৈতিক জগতে এই সব নূতন values এর প্রমাণ দেখা যাইবে। মৌখিক নীতিশাস্ত্রে যে ধর্ম্মের যে মূল্য সমাজের বাস্তব জীবনে এবং প্রচলিত গুপ্ত বিশ্বাসে যদি সে ধর্ম্মের মূল্য না থাকে তবে তাহা এই উপন্যাসে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। মুখের নীতিশাস্ত্রের মানদণ্ড দিয়া লোকে সে উপন্যাসকে নীতিবিরুদ্ধ বলিলেও সমাজের বাস্তব নীতিশাস্ত্রমতে সে বই নীতিবিরোধী বলিয়া গণিত হইতে পারিবে না।

তা ছাড়া ঔপন্যাসিককে অনেক স্থলে এই নৈতিক মূল্যের পুনর্ব্যবস্থায় সহায়তা করিতে হয়। সামাজিক রীতি নীতি বিধি বাবস্থা কখনও সম্পূর্ণরূপে ন্যায়শাস্ত্রসঙ্গত হয় না। রোজ রোজ সমাজের সর্ব্বাঙ্গ পুষ্ট ও পরিণত হইতেছে, এই পরিণতির ফলে হয় তো একটা অঙ্গ অপর একটার চেয়ে বেশী পরিণত হইয়া পড়ে, সামাজিক জীবনের একভাগে হয়তো একটা নীতি স্বীকৃত হইয়াছে অথবা অন্যভাগে তাহা হয় নাই। আরও, অনেক সময় হয় তো একটা প্রাচীন নীতি সমাজে চলিয়াছে। সমাজ হয়তো নির্ব্বিচারে সেই নীতি আগাগোড়া প্রয়োগ করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু সামাজিক অবস্থা ও আবেষ্টন হয় তো এমন ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে যে, সেই সনাতন রীতি ঠিক পূর্ব্বের মত করিয়া অনুশীলন করিলে সমাজের সমূহ অমঙ্গল হইতেছে।

এই সব স্থলে সত্যনিষ্ঠ ঔপন্যাসিক সমাজের যে চিত্র উপস্থিত করিবেন তাহাতে লোকের মনে হইবে যে, প্রাচীন নীতির value বা আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্বন্ধে মত বদলাইবার প্রয়োজন আছে। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে বিশিষ্ট আবেষ্টনের ভিতর ফেলিয়া তাদের জীবন উদ্ঘাটিত করিয়া তিনি দেখাইবেন যে, প্রচলিত নীতি বিশিষ্ট ক্ষেত্রে কি অনিষ্ট করিতেছে।' এ জন্য যে ঔপন্যাসিককে ঠিক এই উদ্দেশ্য লইয়াই লিখিতে হইবে বা কোনও একটা বিশিষ্ট পরিবর্ত্তন লক্ষিত করিতেই হইবে এমন নয়। বরং যদি তিনি এমন উদ্দেশ্য লইয়া লেখেন তবে তাঁর উপন্যাস কথা-সাহিত্য হিসাবে ক্ষুণ্ণ হইবে। ঔপন্যাসিকের প্রধান কর্ত্তব্য, সত্য জীবন চিত্রিত করা। সেই চিত্রাঙ্কন মুখে অনেক সত্য আপনাআপনি ফুটিয়া উঠিবে, সমাজের কোথায় ত্রুটি, কোথায় ব্যথা তাহা সকলের মনে জাগিয়া উঠিবে, সমাজের ও নীতির সংস্কার বিষয়ে সমস্যা লোকের মনে জাগিয়া উঠিবে! সে সমস্যার সমাধানের উপায় হয়তো পরোক্ষভাবে লক্ষিত হইবে, কিন্তু সে সমাধান নিষ্পন্ন করা ঔপন্যাসিকের কর্ত্তব্য নহে। গল্পের পরিণতি-মুখে এই সব নীতির পরিবর্ত্তন ঘটিত সমস্যা সমাজের কাছে জীবন্তভাবে উপস্থিত করাই ঔপন্যাসিকের প্রধান কর্ত্তব্য।

নবযুগের কথা-লেখকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের প্রধান হেতু এই যে, তাঁহারা সমাজকে ঘাঁটাইয়া এই সব সমস্যা উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, প্রচলিত নীতি ও সংস্কার বিষয়ে লোকের প্রশান্ত তুষ্টি বিনাশ করিয়া সমস্ত গোড়ার কথা বিশ্লেষণ করিয়া ভাবিতে লোককে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। ইহার বেশী তাঁহারা বিশেষ কিছু করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না। কিন্তু ইহাতেই রক্ষণশীল সমাজ বিক্ষুব্ধ হইয়া নীতি ও

রুচিবিগর্হিত বলিয়া এই সকল গ্রন্থকে নিন্দা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

সমাজে এমন সব নীতি অবিসম্বাদী সত্যরূপে স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে যাহা অপরিবর্ত্তিতভাবে স্বীকার করা হয় তো একেবারে অসম্ভব। সমাজের তলা খুঁড়িয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে সমাজের বর্ত্তমান আবেষ্টনের ভিতরে সে সব নীতির কোনও ভিত্তিই নাই। হয় তো বা দেখা যাইবে যে, নীতিটা মোটের উপর খাঁটি, কিন্তু বর্ত্তমান সমাজের আবেষ্টনের ভিতর তার সম্যক প্রয়োগ করিতে হইলে তাহাকে কিছু উপাধি-সংযুক্ত করিয়া লইতে হইবে। অথবা হয় তো দেখা যাইবে যে, সে নীতির কোনও পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা নাই। এই সব নীতি সম্বন্ধে সমাজের সাধারণ লোকের বর্ত্তমান মনোভাব এই যে এ সব কথা আমরা আলোচনা করিব না, কেন না এগুলির উপর সমাজ প্রতিষ্ঠিত, এগুলি লইয়া নাড়াচড়া করিলে সমাজ চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কাজেই কেহ এই অনুসন্ধান কার্য্যে অগ্রসর হইলে তাঁহারা "হা হা" করিয়া উঠিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিতে চান। নবযুগের-কথাসাহিত্যের অপরাধ এই যে, ইঁহারা এই সকল কথাকে এমনি sacrosanct করিয়া রাখিতে প্রস্তুত নন। যে নীতি সমাজের পক্ষে যত বেশী প্রয়োজন বলিয়া আপাততঃ মনে হউক না কেন, তাহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান বাঞ্ছনীয়, সমাজের ভিতর তার কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে আলোচনা করিবার অবসর আছে। এই অনুসন্ধান কার্য্যে যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহারা যে কাজে কাজেই দুর্নীতিপরায়ণ বা দুর্নীতির পরিপোষক বা তাঁরা যে লোকের ভিতর প্রচ্ছন্ন দুর্নীতিপরায়ণতা পরিতৃপ্ত করিয়া বইএর কাটতি বাড়াইবার জন্য ব্যস্ত এ অনুমান করিবার কোনও যুক্তিসঙ্গত হেতু নাই।

সুতরাং প্রচলিত মৌখিক নীতির কতক পরিমাণে পরিপন্থী হইলেই যে কোনও গ্রন্থকে দুর্নীতির পোষক বলিয়া নিন্দা করিতে হইবে এমন বলা চলে না। সাধারণ অসম্বুদ্ধ পাঠক তাহা করিতে পারে, কিন্তু জ্ঞানী পাঠক ও সমালোচকের দেখা প্রয়োজন যে, এই সব কথা গ্রন্থে নীতি সম্বন্ধে যে সমস্যা উপস্থাপিত করা হইয়াছে তাহা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কি না। যদি তাহা সত্য হয় তবে তাহা জানিবার ও ভাবিবার বিষয়; এই কাহিনী অবলম্বন করিয়া প্রচলিত নীতির কোনও পরিবর্ত্তন বা সংশোধন আবশ্যক কি না তাহা বিচার আবশ্যক।

কোনও কথা সত্য বা স্বাভাবিক হইলেই তাহা বলিতে হইবে বা তাহা লইয়া উপন্যাস রচিত হইবে এমন কথা বলা চলে না। এমন অনেক সত্য কথা সমাজে আছে যাহা লইয়া সমাজে কোনও সমস্যা উপস্থিত হয় নাই, যাহা লইয়া কোনও ব্যথার আকর সমাজের গায় লুকাইয়া নাই। সে কথা ঔপন্যাসিক আলোচনা করিতে পারেন, কিন্তু যদি তাহা রুচিবিরুদ্ধ বা নীতিবিরুদ্ধ হয় তবে তার আলোচনা না করাই ভাল। কিন্তু যেখানে সমাজের একটা গুরুতর ব্যথা লুকান আছে, যে বিষয়ে ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ করিয়া সমাজ কেবল একটা মহা সমস্যাকে দুই হাতে ঠেলিয়া মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে সেখানে কেবলমাত্র রুচি বা নীতির দোহাই দিয়া সে কথার আলোচনা নিবারণ করিবার কোনও হেতু নাই। এখানে সমস্যাটা ফুটাইয়া তুলিয়া তার সমাধানে সহায়তা করাই প্রয়োজন। এ বিষয়ে ঔপন্যাসিকের সংযমের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। সত্যকথা বলিতে হইবে, সমস্যার উদ্ঘাটন করিতে হইবে, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় ভাবে রুচি বা নীতির বিরুদ্ধতা তিনি করিতে পারেন না।

নবযুগের কথা-সাহিত্যের যাঁরা কোনও স্থায়ী সম্পদ দান করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এই নীতির অনুসরণ করিয়াছেন। মিথ্যা লজ্জা বা সঙ্কোচ করিয়া এমন কোনও সত্য আলোচনা তাঁরা কুণ্ঠিত হন নাই যাহার উপর সমাজের হিতাহিত নির্ভর করে। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাঁহাদের লেখা আলোচনা করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁরা পাঠকদিগের অন্তরস্থিত নীচ প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত করিবার জন্য অযথা কুৎসিত বিষয় লইয়া নাড়া-চাড়া করিবার কোনও চেষ্টা করেন নাই।

কথা সাহিত্যে যদি সত্য সত্য দুর্নীতির পোষণ করা হয় তবে তাহা অবশ্য নিন্দনীয়, কিন্তু এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে সমালোচকের এই কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

নবযুগের সাহিত্য সম্বন্ধে প্রচলিত সমালোচনার একটা লক্ষণের কথা আলোচনা করিয়া আমার বক্তব্য সমাপ্ত করিব। কাব্য ও কথার প্রধান কথা রস বা art. যার ভিতর রস আছে তাহাই কাব্য এবং সেই কথাই সাহিত্য হিসাবে গ্রহণীয়। এই রসের প্রাচুর্য্য ও উৎকর্ষ দিয়াই কথাগ্রন্থের ভালমন্দ প্রধানতঃ বিচার করিতে হইবে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আজ-কালকার কথা-সাহিত্যের আলোচনা করিতে গিয়া সপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় দলের সমালোচকই গল্পের ভিতর পরিস্ফুট সামাজিক বা নৈতিক সমস্যার আলোচনায় এতটা বিভোর হইয়া উঠেন যে, তাঁহারা গল্পের আর্টের আলোচনা করিবার অবসর পান না। সমালোচক ও পাঠকের দৃষ্টি চট করিয়া এই সাহিত্য সমালোচনা হিসাবে অবান্তর বিষয় গুলির আলোচনায় এতটা চাপিয়া বসিয়া যায় যে বইয়ের প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়ের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টিই প্রায় পড়ে না। অথচ কথা-গ্রন্থের ভালো মন্দ বিচার করিতে হইবে

তার রস দিয়া। রসের দিক হইতে বইখানা কতখানি ভালো বা মন্দ তাহাই প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়।

সম্প্রতি বাঙ্গালীর একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সাহিত্য সমালোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, আজকাল ঐতিহাসিক উপন্যাস চলে না, কেন না লোকের রুচি বিকৃত হইয়া গিয়াছে। আবার তিনি কতকগুলি ঐতিহাসিক উপন্যাস সমালোচনা করিয়াছেন—কিন্তু তার মধ্যে ধরিয়াছেন শুধু, কোন্ বইখানার ইতিহাসটা কত পরিপূর্ণরূপে সত্য। ইতিহাসের ভুল হইলেই তিনি সে উপন্যাস নিন্দা করিয়াছেন, আর ঐতিহাসিক হিসাবে সত্য হইলেই তাহাকে প্রশংসা করিয়াছেন। এই লেখকের সমালোচনা, আজকালকার অনেক সাহিত্য সমালোচনার নিদর্শন বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

কথাটা একটু আলোচনা করিলে আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট হইবে। ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রধানতঃ উপন্যাস, তবে তার আখ্যান বস্তু ইতিহাসের আশ্রিত। ইহার আলোচনা করিতে গেলে প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, বইখানা উপন্যাস হিসাবে ভাল হইয়াছে কি না,—উপন্যাসের রস, যে গুণে উপন্যাস আমাদের রসপিপাসা পরিতৃপ্ত করে তাহা ইহাতে প্রচুর পরিমাণে আছে কি না? যদি তাহা থাকে তবে ইহার ঐতিহাসিক ভুলভ্রান্তি সব ক্ষমা করিয়া লোকে আদরের সহিত গ্রহণ করিবে। সেক্সপীয়রের ঐতিহাসিক নাটক যে অনেকস্থানে ইতিহাসের মাথায় লগুড়াঘাত করিয়াছে তাহাতে তাহাদের মর্য্যাদা কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয় নাই। স্কটের মত নিপুণ ঐতিহাসিকও Kenilworthএ রাজ্ঞী এলিজাবেথের মুখে যে সময়ে সেক্সপীয়রের নাটকের সুখ্যাতি ঢুকাইয়াছেন, সে সময় শিশু সেক্সপীয়র ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ডের পথে ধূলাখেলা করিতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র

ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়া যে সব উপন্যাস লিখিয়াছেন তার ভিতর অনেক ইতিহাসই ভুল, কিন্তু তাহাতে তাঁহার উপন্যাসের মর্য্যাদা নষ্ট হয় নাই।

সাধারণ উপন্যাসেরও যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ঐতিহাসিক উপন্যাসেরও সেই লক্ষ্য ও সেই উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য রসের সৃষ্টি। উপন্যাসের জীবন যে রস তাহা সৃজন করিলেই ঐতিহাসিক উপন্যাস সার্থক, তাহা না সৃজন করিতে পারিলে তাহার ইতিহাস অংশ যতই সত্য ও নির্দ্দোষ হউক সে উপন্যাস সার্থক হইতে পারে না। যে লেখক ইতিহাস অবলম্বনে কথা রচনা করেন তাঁহার ইতিহাসের সত্যতা সম্বন্ধে সাবধান হওয়া আবশ্যক, ইতিহাসের গুরুতর বিরুদ্ধতা উপন্যাসের রসভঙ্গ করে। আদর্শ ঐতিহাসিক উপন্যাস যেমন পরিপূর্ণরূপে রসসৃষ্টি করিবে ঠিক তেমনি পরিপূর্ণরূপে সত্য হইবে। Charles Reade-এর The Cloister and the Hearth এইরূপ উপন্যাসের একটি সুন্দর নিদর্শন। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য কতকটা ক্ষুণ্ণ হইলেও অতি সুন্দর উপন্যাস হইতে পারে, কিন্তু রসসৃষ্টি হিসাবে হীন হইলে ঐতিহাসিক উপন্যাস কিছুতেই গৌরব লাভ করিতে পারে না।

কাজেই কোনও ঐতিহাসিক উপন্যাস সমালোচনা করিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে হয় যে, উপন্যাস হিসাবে বইখানা সার্থক হইয়াছে কিনা, ইহাতে সুন্দর রসসৃষ্টি হইয়াছে কি না? এমন বই সমালোচনা করিতে গিয়া সমালোচক যদি কেবল তার ঐতিহাসিক সত্যতা বা অসত্যতা সম্বন্ধেই আলোচনা করেন তবে তাঁর সে সমালোচনা সম্পূর্ণ নিরর্থক হইবে।

ঠিক সেইরূপ সামাজিক সমস্যামূলক উপন্যাসেও প্রথম বিবেচ্য কথা এই যে, সে উপন্যাসে কথার রস আছে কি না, এবং কি

পরিমাণে তাহা আছে। সামাজিক সমস্যাটির উদ্ঘাটন বা তৎসম্বন্ধে গ্রন্থকারের বা পাত্র পাত্রীদের মতামত আলোচনা, আলোচ্য হইলেও তাহা গৌণভাবে আলোচ্য। টলষ্টয়ের সামাজিক মতবাদ পরিপূর্ণরূপে অস্বীকার করিলেও তাঁর উপন্যাস পড়িয়া আনন্দ লাভ করিতে কাহারও বাধা লাগে না। Bernard Shaw বা H. G. Wells এর সামাজিক মতামত যাঁহারা মোটে স্বীকার করেন না, তাঁহারা ইঁহাদের বই আর্টের দিক হইতে আদর করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু আমাদের দেশে নবযুগের কথা-সাহিত্যের যে সমালোচনা হইয়াছে বা হইতেছে তাহাতে রস-রচনা হিসাবে এ সব বইয়ের গুণাগুণের পরিমাপের চেষ্টা না করিয়া ইহাদের সামাজিক মতামত লইয়াই খুব বেশীর ভাগ মাথা ঘামান হইতেছে। যাঁরা সমালোচনা পড়িয়া বইয়ের রসাস্বাদ করিবার সহায়তা লাভ করিতে চান তাঁদের এরূপ আলোচনায় সমূহ ক্ষতি হইতেছে। দেশের মধ্যে রসবোধ সম্যক্‌রূপে উদ্বুদ্ধ না হইয়া এইরূপ সমালোচনায় তাহা সম্পূর্ণরূপে চাপা পড়িয়া যাইতেছে।

সমালোচনার প্রকৃত কার্য্য প্রশস্তি পাঠও নয়, লগুড়াঘাতও নয়। সমালোচক রসজ্ঞ। তিনি গ্রন্থ পাঠ করিয়া যে রস বা রসের ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা পাঠক সাধারণের গোচর করিয়া, একদিকে আলোচিত গ্রন্থের গুণাগুণ পাঠকের কাছে পরিস্ফুট করিয়া তোলেন, অপর দিকে এই আলোচনা মুখে তিনি পাঠকের মনে রসজ্ঞতা ও রসসংগ্রহপ্রবণতা প্রবুদ্ধ করিয়া তোলেন। যে পরিমাণে রসগ্রাহিতা পাঠক সাধারণের মনে এই রকমে সঞ্চারিত হয়, ঠিক সেই পরিমাণে সাহিত্যের উৎকর্ষও সাধিত হয়। কারণ লেখককে লিখিতে হয় পাঠকের মনের দিকে

চাহিয়া। পাঠকের চিত্তের যতটা উৎকর্ষ লেখক ধরিয়া লইতে পারেন ঠিক সেই ওজনে তিনি তাঁর লেখার উৎকর্ষ সম্পাদন করিতে পারেন। যদি পাঠকসমাজ রসগ্রাহিতা বিষয়ে অপ্রবুদ্ধ হয় তবে বাজে জিনিষ অনেক বেশী কাটে সাহিত্যের ভাণ্ডার বাজে মালে বোঝাই হইয়া যায়। পাঠক সাধারণের চিত্ত যদি রসগ্রাহিতা বিষয়ে উন্নত হয়, তবে বাজে মাল কাটিবে না, কাজেই সাহিত্যের উন্নতি হইবে।

সমালোচকের এই গুরুতর দায়িত্ব আজকালকার সমালোচনায় সম্যকরূপে দেখা যায় না, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। ইহার একটি ফল এই যে রসের দিক হইতে কথা সাহিত্যের মোটেই আলোচনা হইতেছে না, আলোচনা হইতেছে অবান্তর বিষয় লইয়া। রস হিসাবে মুড়ি মিছরীর একদর হইয়া গিয়াছে। যৌন সমস্যা মূলক যে কোনও উপন্যাসকে "হরিদাসের গুপ্ত কথার" সঙ্গে এক পর্য্যায়ে ফেলিতে সমালোচক দ্বিধা করেন না। পাঠক সাধারণও উভয়ের ভিতর প্রভেদ ধরিতে শিখিতে পারে না। এইরূপ সমালোচনা বাঙ্গলা সাহিত্যের যত বড় অনিষ্টের জন্য দায়ী, তথাকথিত কুসাহিত্যের দায়িত্ব তত বেশী নয়। অপ্রবুদ্ধ সমালোচনা অসাহিত্য ও কুসাহিত্য সৃষ্টি করে ও তাহার প্রসারে সহায়তা করে।

'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত

॥ সাহিত্যে জাতীয়তা ॥

রায় বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় কিছুকাল হইল সাহিত্যের চিকিৎসায় ব্যাপৃত আছেন। তিনি গতমাসে বাঙ্গলা সাহিত্যের একটা নূতন জীবাণু আবিষ্কার করিয়া তার দূরবীক্ষণিক ও আনুবীক্ষণিক বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সে জীবাণু সাহিত্যে জাতীয়তা। দূরবীক্ষণিক বিশ্লেষণ দ্বারা তিনি ইংরাজ আবির্ভাবের পর হইতে আমাদের যুগ পর্য্যন্ত সমস্ত বাঙ্গলা সাহিত্য ও সমাজের এক ইতিহাস রচনা করিয়া ফেলিয়াছেন। এই ইতিহাস যে কতটা আলোচনার যোগ্য তাহা ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, ইহার ভিতর ভূদেব মুখোপাধ্যায় অনেকটা স্থান জুড়িয়াছেন, চন্দ্রনাথ বসু ও অক্ষয়কুমার সরকারেরও honourable mention আছে—নাম নাই অক্ষয়কুমার দত্তের,—নাই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের—কেশবচন্দ্র সেনেরও নাই বলিলেই চলে। সুধু এই ক'টা হইতেই বেশ বুঝা যাইবে যে, যে কাচখানার ভিতর দিয়া যতীন্দ্রবাবু বাঙ্গলা সাহিত্যের অতীত যুগের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন সে খানা টেলিস্কোপে বসাইবার যোগ্য নয়, তাহাতে Laughing galleryর আরসী তৈয়ার হইতে পারে।

এই ইতিহাস-চর্চ্চাটা লেখকের আসল প্রতিপাদ্য নয়, প্রতিপাদ্য একটা সামাজিক তত্ত্ব। তিনি একটা গুরুতর সাহিত্য ও সমাজ ঘটিত সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন এবং একটা বৃহত্তর সমস্যা উত্থাপিত করিয়াছেন,—আমাদের স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ বিষয়ক যে সব সনাতন সংস্কার আছে সেগুলি কোনরূপ পরিবর্ত্তন বা সংস্কার সাধনের চেষ্টা সাহিত্যের দ্বারা করা উচিত কিনা? এবং সাধারণ ভাবে "বিদেশের সঙ্গে, একটা বিভিন্ন সভ্যতার সঙ্গে

ভাবের আদান প্রদান—free trade of cultural ideas সর্ব্বাংশে ভাল না মন্দ ?”

এই সব সমস্যা কেবলমাত্র দুদশখানা সাহিত্যের গ্রন্থ পড়িয়া বিবেকবুদ্ধি মাত্রের সহায়তায় করা যায় না। এ সব সমস্যার আলোচনায় অনেকগুলি কথা উঠে। প্রথমতঃ যে সব সংস্কার লইয়া আলোচনা করা হইতেছে তাহার প্রকৃতি ও ইতিহাস জানা আবশ্যক, সমাজের অঙ্গের সঙ্গে তার কোনখানে কি প্রকার যোগ, সমাজের জীবন ধারার সঙ্গে তার সমন্বয়ের কি সূত্র তাহা জানা আবশ্যক। হিন্দু সমাজের কোনও আচার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে হিন্দুর শাস্ত্র সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞান থাকা দরকার। তা ছাড়া সমস্ত জগতের সামাজিক ইতিহাস ও সমাজের ক্রমপরিণতির মুখে অনুষ্ঠান ও সংস্কার কিরূপে ভাঙ্গা-গড়া হইয়াছে তাহাও বেশ ভালরূপে জানা দরকার। সিংহ মহাশয়ের সমস্ত লেখা পড়িয়া আমার দৃঢ় সংস্কার হইয়াছে যে, হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এ কথা কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছি না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি “মানসী ও মর্ম্মবাণীতে” আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষে আমার কি নজীর আছে ? সে প্রশ্নের উত্তর শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া আমি দিয়াছিলাম “ভারতী” পত্রিকায়। আমার সে যুক্তির কোনও উত্তর দিবার চেষ্টা সিংহ মহাশয় এ পর্য্যন্ত করেন নাই—ধর্ম্মশাস্ত্রে সম্যক অধিকার থাকিলে তিনি সে সব যুক্তির উত্তর দিতে চেষ্টা করিতেন কিম্বা স্বীকার করিতেন যে শাস্ত্রমতে আমার যুক্তির উত্তর নাই।

তা ছাড়া যে সব সমস্যা তিনি আলোচনা করিতে অগ্রসর

হইয়াছেন তাহা কেবল আমাদের দেশেই আবির্ভূত হয় নাই। মানব সমাজের ইতিহাসে অনেক স্থলে এই সব সমস্যা উঠিয়াছে। সেই সব সমাজে এসব সমস্যার কি সমাধান হইয়াছে তাহার আলোচনায় এবিষয়ে অনেকটা সাহায্য পাওয়া যাইবে। তা ছাড়া সমাজতত্ত্ব ও সামাজিক অনুষ্ঠান ও সংস্কারের ক্রমপরিণতির আলোচনায় এই সব সংস্কার ও অনুষ্ঠানের স্বরূপ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়। এই জন্য মানব সমাজের ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বে (social anthropology) সম্যক অধিকার না থাকিলে এসব বিষয়ের আলোচনা নিষ্ফল হয়। সিংহ মহাশয়ের এসব বিষয়ের সহিত যে কিছুমাত্র পরিচয় নাই তাহা তাঁর ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। মানব সমাজের ইতিহাসে এবং ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে মানবের যৌনসম্বন্ধ নিয়মনে সতীত্বের উদ্ভব ও প্রকৃতির সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকিলে সতীত্ব সম্বন্ধে তিনি যেসব কথা বলিয়াছেন তাহা বলিতেন না।

আমরা একটা প্রাচ্য জাতি। একটা পাশ্চাত্য জাতির সঙ্গে ভাব ও অনুষ্ঠানের স্বচ্ছন্দ আদান-প্রদান আমরা করিব কিনা,—এই সমস্যা যতীন্দ্রবাবু তুলিয়া তার একটা মনগড়া জবাব দিয়াছেন। এ উত্তরটা দিবার আগে অন্যান্য বহু দেশে এই সমস্যা উঠিয়া তার যে সমাধান হইয়াছে তাহার একটু আলোচনা করিবার চেষ্টা করিলে সিংহ মহাশয় ভাল করিতেন। জাপান ও চীনের গত ৬০।৭০ বৎসরের ইতিহাস তুলনায় সমালোচনা করিলে এ বিষয়ে অনেক তথ্য জানা যাইবে। রুষিয়ার গত তিনশত বৎসরের ইতিহাসে এবিষয়ে অনেক তথ্য নিহিত আছে। যতীন-বাবু বোধহয় খবরই রাখেন না যে, রুষ দেশটা তিনশত বৎসর পূর্ব্বে ছিল একটা প্রাচ্য জাতি। সে-দেশের আচার অনুষ্ঠান

ও সমাজ বন্ধনের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েও যে পাশ্চাত্য জগতের চেয়ে ভারতবর্ষের সঙ্গে সাদৃশ্য কত বেশী ছিল তাহা Stepniak এর Russian Peasantry পড়িলে জানা যায়। Peter the Great রুষিয়াকে পাশ্চাত্য জাতি করিয়া গড়িবার জন্য নানা প্রচেষ্টা করেন, সেনাগঠনে পাশ্চাত্য সেনাপতি নিয়োগ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাগারে পাশ্চাত্য শিক্ষক ও পাশ্চাত্য বিদ্যা আনিয়া তিনি রুষের "জাতীয়" জীবনের উপর একটা প্রচণ্ড আঘাত করেন—সে আঘাতের সঙ্গে ভারতে বৃটিশ সংসর্গজনিত আঘাতের সঙ্গে বহু সাদৃশ্য আছে। যতীন্দ্রবাবু ও তাঁহার বন্ধুগণ শুনিয়া অবাক হইবেন যে, সেখানেও সনাতন-পন্থীরা রুষিয়ার প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠান ও প্রাচীন culture রক্ষা করিবার জন্য যে সব তর্ক যুক্তি উপস্থিত করিয়াছিল, যতীন্দ্রবাবু ও তার দলের লোকদের সঙ্গে তার আশ্চর্য্য রকম সাদৃশ্য আছে। রুষের পাশ্চাত্য ভাব গ্রহণ এবং তার ফলে জগতের ইতিহাসের আত্মপ্রতিষ্ঠার একটা অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে Vinogradoff এর "Self-Government in Russia" পুস্তিকায়, তাহা পড়িলে যতীন্দ্রবাবু এসব বিষয় আলোচনার প্রভূত সহায়তা লাভ করিতে পারিতেন।

বর্ত্তমান তুরস্কে যে প্রক্রিয়া চলিয়াছে তাও বিশেষভাবে অনুশীলনের যোগ্য। অনতিদীর্ঘকাল পূর্ব্বে মুস্তাফা কেমাল পাশা এক বক্তৃতায় এসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তার ভিতর একটা প্রকাণ্ড সার সত্যের ইঙ্গিত আছে। তিনি তাঁর দেশবাসী সনাতন-পন্থীদের তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তোমরা একটা সুদূর অতীতে বসিয়া আছ—modern হও। এই কথাটাই

* Dacca Review, Vol VI. Oct, 1916

আমিও আমার সনাতনপন্থী স্বদেশবাসীকে বলিতে চাই। বিলাত বা কোনও বিশিষ্ট দেশের অনুকরণ আমরা চাই না। কিন্তু চার পাঁচশত বৎসরের পুরাতন ভারতবর্ষের ভিতর বসিয়া চারিদিক দিয়া পরিবর্ত্তনের পথে পাষাণ প্রাচীর গড়িয়া থাকিতেও আমরা চাই না। আমরা চাই ঠিক আজকার ভারতবাসী হইতে—আজকার বিশ্বের সমস্ত culture-স্রোতের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়া সজীবভাবে অগ্রসর হইতে, এক কথায়—modern হইতে।

সিংহ মহাশয় ও তাঁহার বন্ধুরা একটা কথা স্মরণ রাখেন না যে, আজকালকার যে culture বা সামাজিক সংস্কার ও আচার তাহার বেশীর ভাগই কোনও জাতি বিশেষের বিশেষ সম্পদ নয়। আজ যেসব নূতন আদর্শ নূতন ভাব বা চিন্তা গড়িয়া ওঠে, তাহা জাতীয়তার গণ্ডী ছাড়াইয়া বিদ্যুদ্বেগে সমস্ত বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ে, সমস্ত বিশ্ব তাহা আপনার জীবন-ধারার সঙ্গে সমীকৃত করিয়া লইবার চেষ্টা করে। তাহার ফলে আজকার মানবসমাজ সমস্ত জাতীয় গণ্ডী অতিক্রম করিয়া cultureএর দিক হইতে এক বিরাট সমাজরূপে গঠিত হইয়াছে, যাহার স্বরূপ ব্যাখ্যান করিয়াছেন Wallas তাঁর Great Society গ্রন্থে। সিংহ মহাশয় চান যে বিশ্বব্যাপী ভাব ও চিন্তার এই আদান-প্রদান ব্যাপারে হাত দিব না—আমরা আশ্রয় করিয়া থাকিব আমাদের জাতীয়তা। তার ফল যে কি হইবে তার পরিচয় চীন! চীনদেশ কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আপনাকে ঠিক এইরূপে সমস্ত বর্ত্তমান জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিবিড়ভাবে ডুবিয়াছিল আপনার "জাতীয়" cultureএর ভিতর। সেজন্য Ihering চীনকে বলিয়াছেন 'জাতীয়তা তত্ত্বের ডন্ কুইক্সোট' (ein echter Donquijote der Nationalitaets

princips)। আমাদেরকেও সিংহ মহাশয় এই কূপমণ্ডুকের পরামর্শ দিতেছেন।

এই সব তত্ত্বকথার উপোদ্‌ঘাত স্বরূপ তিনি বাংলার প্রায় দেড়শত বৎসরের সামাজিক ও সাহিত্যিক ইতিহাস এক নিঃশ্বাসে বলিয়া গিয়াছেন। সে ইতিহাসে তাঁর অধিকার অত্যন্ত প্রগাঢ়। তার দুই চারটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

রামমোহন রায় সম্বন্ধে রায় বাহাদুর বলিয়াছেন, "তিনিও ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এইরূপভাবে বিদেশীয় সভ্যতার নিকট আত্মবিক্রয় করা তাঁহার স্বাধীন চিত্ত কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না।"

কথাটা ইহার পূর্ব্বাপরের কথার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলে ইহার তাৎপর্য্য এই বুঝা যায় যে (১) ইংরাজী সভ্যতার প্রথম সংস্পর্শে ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তির চক্ষুতে ধাঁধা লাগিয়া গিয়াছিল এবং তাহারা ইংরাজের যাহা কিছু তৎসমস্তই অনুকরণীয়, এবং দেশীয় সমস্তই বর্জ্জনীয় জ্ঞান করিয়াছিল। (২) ইহার কিছুকাল পর রাজা রামমোহনের অভ্যুদয় হয়। (৩) রাজা রামমোহনও পূর্ব্বোক্ত 'ইংরাজী শিক্ষিত'দের মত ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা পাইয়াছিলেন।

এ কথাগুলির একটিও সত্য নহে। যাহাদের চক্ষে ইংরাজী শিক্ষার আলোকে ধাঁধা লাগিয়াছিল তাহারা হিন্দুকলেজের ছাত্র ডিরোজিওর শিষ্য—রামমোহনের পরবর্ত্তী, অগ্রবর্ত্তী নয়। রাজা রামমোহন ইংরাজী ও বহুভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁর শিক্ষা হইয়াছিল সংস্কৃত, আরবী ও ফারসীর সাহায্যে। সুতরাং 'ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত' সেকালের বাবুদের সঙ্গে তিনি এক পর্য্যায়ে ছিলেন না।

রামমোহন রায়ের মতামতের যে ব্যাখ্যা সিংহ মহাশয় দিয়াছেন, তাহা যে ভারতের বর্ত্তমান যুগের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষের মতের কত বড় ভেঙ্গানি তাহা যে কেহ রামমোহনের রচনাবলী যত্নের সহিত অনুশীলন করিয়াছে সেই বুঝিতে পারিবে। সিংহ মহাশয়ের মতে খৃষ্টান পাদরীগণ তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা সম্বন্ধে উপহাস করিয়াছিল বলিয়াই রামমোহন রায় তাঁহার দেশের দেবদেবীর উপাসকদের বুঝাইতে লাগিলেন "তোমরা উপনিষৎ প্রতিপাদিত পরব্রহ্মের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া ও কি করিতেছ? তোমাদের জন্য আমি সভ্য সমাজে মুখ দেখাইতে পারিতেছি না।" ইত্যাদি। যদি সিংহমহাশয় রামমোহন রায়ের জীবনী ও গ্রন্থাবলী না পড়িয়া থাকেন তবে তার এসম্বন্ধে কিছু না লেখাই উচিত ছিল। যদি পড়িয়া থাকেন, তবে এমন একটা নিদারুণ অসত্য তিনি লিখিলেন কেমন করিয়া? রাজা রামমোহনের একেশ্বর বাদ বা নির্গুণ ব্রহ্মবাদ খৃষ্টানদের পাদরী বিদ্রূপের বহুপূর্ব্বে জন্মিয়াছিল ও প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা তাঁর পুঁথিপড়া বিদ্যা ছিল না, ইহা ছিল তাঁর জীবনের সাক্ষাৎ অনুভূতি, তাঁর হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রপাঠের ফল। এই সাক্ষাৎ অনুভূতির আলোকে তিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াই তার ভিতর এই এক সত্যই প্রকটিত দেখিয়াছেন। প্রত্যেক শাস্ত্র হইতে স্বতন্ত্রভাবে তিনি এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন—হিন্দুকে বুঝাইয়াছেন হিন্দুশাস্ত্র হইতে, খৃষ্টানকে খৃষ্টীয় শাস্ত্র হইতে। তাঁর নিজের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার যাচাই করা এই সত্য তিনি জগৎকে দিয়া গিয়াছেন,—বিদ্রূপের ভয়ে নয়, প্রশংসার আশায় নয়—সত্যের প্রতি জাতিধর্ম্মনিরপেক্ষ অদম্য অনুরাগবশে সেই লোকাতীত সত্যনিষ্ঠা ও সত্যানুভূতির

এ প্রকার ব্যাখ্যা রামমোহন রায়ের ভেঙ্গানি ছাড়া কিছুই নয়।

সব চেয়ে অদ্ভুত কথা এই যে, সিংহ মহাশয়ের মতে "বেদোপনিষদের পরে ইতিহাস পুরাণ ধর্ম্মসংহিতা, তন্ত্রাদিশাস্ত্র এবং চৈতন্যমহাপ্রভুর পরবর্ত্তি বৈষ্ণব শাস্ত্রাদির মধ্য দিয়া হিন্দুশাস্ত্রের যে ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি হইয়াছিল তিনি (রামমোহন) তাহার কোনও অনুসন্ধান করেন নাই। * * তিনি ধরিয়া লইয়াছিলেন, ভারতবর্ষে বেদ ও উপনিষদের যুগের পরে একটা dark age অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারের যুগ আসিয়াছিল এবং তাহা পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে অপসৃত হইবে।"

একথা কি সত্য সত্যই মনে করিতে হইবে যে সিংহ মহাশয় রামমোহনের লেখা পড়িয়াও এই কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন? যদি তিনি রামমোহনের বাঙ্গলা রচনা পাঠ করিতেন তবে দেখিতে পাইতেন যে রামমোহনের স্মৃতি ও তন্ত্রশাস্ত্রে যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল, সে যুগের অপর কাহারও সে গভীর পাণ্ডিত্য ছিল না। যে কূলার্ণব ও মহানির্ব্বাণতন্ত্র সিংহ মহাশয়ের শরণ্য Woodroffe সাহেবের প্রধান অবলম্বন তাহা সর্ব্বপ্রথমে প্রচারিত করেন রাজা রামমোহন। এমন কি সেকালে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত একথা পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতেন যে মহানির্ব্বাণ তন্ত্র রামমোহনের স্বরচিত—প্রকৃত প্রাচীন গ্রন্থ নয়। সিংহ মহাশয় কি ইহাও জানেন না যে, নিজের জীবন ও ধর্ম্ম নিয়মিত করিতে রাজা রামমোহনের আশ্রয় ছিল উপনিষদ নয়, তন্ত্র—বিশেষতঃ মহানির্ব্বাণ তন্ত্র। আমি রাজা রামমোহনের রচনা পাঠ করিয়াছি; "ইতিহাস পুরাণ ধর্ম্মসংহিতা ও তন্ত্রশাস্ত্র" সাধ্যমত পাঠ করিয়াছি—পরের মুখে তার সংবাদ লই নাই। আমি সিংহ মহাশয় এবং

তাঁহার মতাবলম্বীদিগকে বলিতে পারি যে, ইতিহাস পুরাণ ধর্ম্মসংহিতা ও তন্ত্রশাস্ত্র বিষয়ে রামমোহনের জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি সিংহ মহাশয়ের চেয়ে কম ছিল না, Woodroffe সাহেবের চেয়েও নয়।

তিনি বাঙ্গলা দেশে যে অন্ধকার যুগের কথা বলিয়াছিলেন এবং যাহা হইতে মুক্তির জন্য তিনি ইংরাজী ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য ফলিত বিজ্ঞানের প্রচার চাহিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃতি সেই অন্ধকার যুগের সায়াহ্নে বসিয়া সেই লোকোত্তর মহাপুরুষ যেমন দেখিয়াছিলেন তাহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে আজ একশত বৎসরের অধিক পরে চোখে রঙিন চশমা আঁটিয়া, অজ্ঞতার স্পর্দ্ধা সম্বল করিয়া আলোচনা ধৃষ্টতা মাত্র।

বিদ্যাসাগরের সম্বন্ধে সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন "তাহাকে একরূপ বঙ্গভাষার জন্মদাতা বলা যাইতে পারে।" পাছে এ কথার অর্থ সম্বন্ধে কোনও ভুলভ্রান্তি হয় সেই জন্য তিনি ব্রাকেটের ভিতর ইংরাজী করিয়া বলিয়াছেন (Fathcr of Bengali *language*)। এত বড় এবং এত অসম্ভব ও অনৈতিহাসিক দাবী বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে কেহ কোনও দিন করে নাই। Language এবং Literature—ভাষা ও সাহিত্য, দুটি স্বতন্ত্র বস্তু, একথা সিংহ মহাশয়ের না জানিবার কথা নয়। তা ছাড়া বাঙ্গলা সাহিত্যেরও একটা খুব গৌরবের যুগ—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মের বহু পূর্ব্বে বহিয়া গিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বড় জোর গদ্য সাহিত্য সম্বন্ধে স্রষ্টা বলা যাইতে পারে। কিন্তু সে দাবী ও খুব টেঁকসই নয়, কেন না এ বিষয়ে রামমোহনের দাবী বিদ্যাসাগরের পুরোবর্ত্তী—কিন্তু রামমোহনও সর্ব্বপ্রথম গদ্য লেখক ছিলেন না। এমনি কথা কোনও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী লিখিলেই সে পরীক্ষকের কাছে লাঞ্ছিত হইত।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা দিয়া যে গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন তার জন্য সাহিত্যের এই ফৌজদারী হাকিমের বিচারে তিনি বিজাতীয় ভাবগ্রস্ত সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছেন। এ আবিষ্কারে যে মৌলিকতা আছে তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যাঁরা জানিতেন তাহারা স্বীকার করিবেন। এই অভিনব তথ্যের মূল যুক্তি এই যে বিদ্যাসাগর মহাশয় "কতকগুলি ইংরাজী বই তরজমা করিয়া তাহাই হিন্দুসন্তানদের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন"। সিংহ মহাশয় কি বাঙ্গালী পাঠককে এতদূর অজ্ঞ বলিয়া মনে করেন যে, তাহারা এই কথাটাও নির্ব্বিবাদে গলাধঃকরণ করিবে? তিনি বিদ্যাসাগরের বোধোদয় কথামালা এবং চরিতাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন—তিনি কি একথা জানেন না যে ইহা ছাড়া বিদ্যাসাগর শকুন্তলা সীতার বনবাস প্রভৃতিও লিখিয়াছিলেন, ঋজুপাঠও লিখিয়াছিলেন—এবং সেগুলি পাঠ্যপুস্তক রূপেই লিখিত হইয়াছিল। যদি জানেন তবে এ কথাটা এসম্পর্কে চাপিয়া গিয়াছেন কেন?

বিদ্যাসাগরের তিন খানি বইয়ের উল্লেখ করিয়াই সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন—"এই প্রকার জাতীয়তাহীন শিক্ষাপ্রণালী দীর্ঘকাল যাবৎ এদেশে প্রচলিত ছিল।" সিংহ মহাশয় এ কথাটা প্রকাশ করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই যে, এ সময়ে এই জাতীয় পাঠ্যপুস্তক আরও অনেকে রচনা করিয়াছিল—এবং তার মধ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায় একজন। তিনিও পাঠ্য পুস্তকে প্রধানতঃ ইংরাজী গ্রন্থ আশ্রয় করিয়াই লিখিয়াছিলেন।

সিংহ মহাশয়ের বাঙ্গলা সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাস সম্বন্ধে যে রকম জ্ঞান, অন্যান্য বিষয়েও জ্ঞান তাহা অপেক্ষা হীন নহে।

যথা—একটা সাহিত্য সমালোচনার নমুনা দেখুন—মাইকেল

"হিন্দুর হৃদয় লইয়া" কেন রাম ও লক্ষ্মণকে রাবণ মেঘনাদ অপেক্ষা হীন করিলেন? মেঘনাদবধের সাহিত্যিক মূল্য বিষয়ে অত্যাবশ্যকীয় এই প্রশ্ন সমাধান করিতে গিয়া সিংহ মহাশয়, মাইকেলের জীবন, তাঁর চিঠি পত্র, তাঁর মতামত সম্বন্ধে কোনও গবেষণা আবশ্যক মনে করেন নাই—কেবল মাত্র অন্তরের অভ্রান্ত আলোক সহায়ে ইহার সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন যে, "সেটা ছিল বঙ্গসাহিত্যে অনুবাদ ও অনুকরণের যুগ। মাইকেল গ্রীক ট্রাজেডিকে আদর্শ লইয়া মেঘনাদবধ রচনা করিয়াছিলেন। হোমারের ইলিয়াডের ন্যায় তার কাব্যে মানুষ দেবগণের ক্রীড়াকন্দুকমাত্র।" এই আলোচনার ভিতর রসানুভূতির অদ্ভুতত্ব প্রভৃতি বড় বড় কথার আলোচনা নাই করিলাম। সিংহ মহাশয়ের এই রচনা তাদৃশ আলোচনার যোগ্য নয়। সুধু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—সিংহ মহাশয় কি কোনও গ্রীক ট্রাজেডিই পড়েন নাই? গ্রীক ট্রাজেডি সম্বন্ধে কোনও আলোচনাও কি কোথাও পড়েন নাই? মেঘনাদবধ ইলিয়াডের আদর্শে রচিত সত্য, কিন্তু ইলিয়াডকে কি সিংহ মহাশয় সত্য সত্যই গ্রীক ট্রাজেডির নিদর্শন বলিয়া মনে করেন? বলা বাহুল্য প্রাচীন গ্রীকের সাহিত্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ পরোক্ষ জ্ঞানও যার আছে সেই জানে যে গ্রীক ট্রাজেডি বলিতে যাহা বুঝায় ইলিয়াড তাহা নয় এবং গ্রীক ট্রাজেডির সঙ্গে মেঘনাদবধের কোনও সম্পর্ক নাই।

আলোচ্য প্রবন্ধের পাতায় পাতায় লেখকের এমন সব বহু মন্তব্য আছে যাহা হইতে লেখকের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে প্রগাঢ় ও বহুমুখী অজ্ঞতা ও স্মৃতিভ্রংশের পরিচয় পাওয়া যায়। তার দৃষ্টান্ত কত দিব।

লেখকের মতে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগেই "বাঙ্গালী প্রথম স্বাধীন

চিন্তা করিতে আরম্ভ করিল। আরম্ভ করিয়াই দেখিল পরাধীনতার ন্যায় দুর্ভাগ্য আর মানব জীবনে হইতে পারে না।" বলা বাহুল্য এ কথার ঐতিহাসিক কোনই ভিত্তি নাই। "স্বাধীন চিন্তা" ও স্বাধীনতার চিন্তা এক নয়। বাঙ্গালার স্বাধীন চিন্তার জন্মদাতা বঙ্কিমচন্দ্র বা তাঁর সমসাময়িকেরা নয়—জন্মদাতা রাজা রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত ইহার একজন প্রধান পুরোহিত ছিলেন। তা ছাড়া স্বাধীনতা মন্ত্রেও দীক্ষাদাতা রাজা রামমোহন রায়। তাঁর পরবর্ত্তীকালে ইহার উদ্বোধন হইয়াছিল অনেকের হাতে —তার মধ্যে বঙ্কিমের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্থান কাহারও নীচে নয়। এ সব কথা সিংহ মহাশয়ের যদি জানিবার অবসর না হইয়া থাকে, তবে তিনি এবিষয় আলোচনা না করিলে পারিতেন।

সিংহ মহাশয় এক নিঃশ্বাসে অনেক কথা বলিয়াছেন, তাদের পরস্পরের সম্পর্ক আলোচনা করিবার অবসর পান নাই। তিনি যে জাতীয়তার জন্য প্রাণপণ করিতেছেন, সে জাতীয়তার প্রকৃত নাম হিন্দুয়ানি। অথচ তার পক্ষে দৃষ্টান্ত দেখাইতে গিয়া তিনি পোলিটিক্যাল স্বাধীনতা ও পোলিটিক্যাল জাতীয়তার কথা আওড়াইয়াছেন। হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র যে জাতীয়তার জন্য চিৎকার করিয়াছিলেন—যে স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে "হিন্দুজাতীয়তা" বা হিন্দুয়ানীর কোনও প্রকৃত সম্পর্ক নাই।

কেশবচন্দ্র সেন সম্বন্ধে লেখকের অজ্ঞতার গভীরতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। তিনি তাঁর সমাজকে চার্চ্চ বলিয়াছিলেন এবং অনেক বিষয়ে বিশ্বজনীনতার নামে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ও আচার অনুসরণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর ভিতর যে আধ্যাত্মিকতার ধারা ছিল তাহা সম্পূর্ণ স্বদেশী, এবং স্বদেশী বলিয়াই পরমহংসদেবের

পক্ষে তাঁহার অভিনন্দন করিতে কোনও বিঘ্ন হয় নাই। কেশবচন্দ্র ভগবানকে মা বলিয়া পূজা করিয়াছেন, তাঁর বহু বাঙ্গালা বক্তৃতায় হিন্দুর সুপরিচিত দেবদেবীর প্রতীক আশ্রয় করিয়াই তাঁর আরাধ্য বিশ্বশক্তির ধারণা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে এত বড় প্রকাণ্ড বিদেশী বলিয়া লেখক সাব্যস্ত করিলেন কেন বুঝিতে পারিলাম না।

Congregational worship যেভাবে নববিধান সমাজে গৃহীত হইয়াছে, তাহার আদর্শ খৃষ্টীয় উপাসনা সন্দেহ নাই। কিন্তু রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসভা বিলাতী জিনিষ নহে—উহার মূল মহানির্ব্বাণ তন্ত্র—এ কথাটা বোধ হয় সিংহ মহাশয়ের জানা নাই। নতুবা নিভৃত ব্যক্তিগত উপাসনাই হিন্দুর একমাত্র সাধন-প্রণালী বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিতেন না।

King Charles's head-এর মত সতীত্বের কথা সিংহ মহাশয়ের এ প্রবন্ধে আসিয়া পড়িয়াছে। সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটা কথা বলিব।

যতীন্দ্র বাবু সতীত্ব ও তার সামাজিক মূল্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। "মানসী ও মর্ম্মবাণীর" এই সংখ্যায়ই তাঁর মতাবলম্বী আর একটি লেখক সতীত্ব সম্বন্ধে এমন ভাবে আলোচনা করিয়াছেন যে সতীত্ব বস্তুটা নিত্যসত্য—সর্ব্বকালে সর্ব্বযুগে ইহার মূল্য অপরিবর্ত্তিত।

এ বিষয়ে আলেচনা করিতে গেলে কেবল আমাদের সমাজ সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে জানিলেই চলে না। এ বিষয়ে সমস্ত জগতের মানব সমাজের প্রকৃতি ও পরিণতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার। সে পরিচয় যার আছে সেই জানে যে সতীত্ব ধর্ম্মটার মূল্য relative—absolute নহে। সমাজের বিশেষ প্রণালীর

সঙ্গেই সতীত্ব খাপ খায়, সেই প্রণালীর ভিতরই সতীত্ব ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয় – অন্য অবস্থায় হয় না। এমন সমাজ আছে যেখানে এক নারীর পক্ষে কেবল মাত্র এক পুরুষে অনুরক্তি, নিন্দা ও শাস্তির বিষয় হইতে পারে। দ্রৌপদীর যে অবস্থা হইয়াছিল সে অবস্থা তিব্বতে বহু নারীর হয়। সেখানে নারীর একাধিক পুরুষের সেবায় অপ্রবৃত্তি ধর্ম্ম নহে অধর্ম্ম। তা ছাড়া যখন স্বামীর ধর্ম্ম ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য নিয়োগের দ্বারা পুত্রোৎপাদন নারীর ধর্ম্ম ছিল, তখন যদি কোনও নারী পাতিব্রত্যের দোহাই দিয়া নিয়োগে অসম্মত হইত, তবে সে প্রশংসিত হইত না নিন্দনীয় হইত। মহাভারতের আদিপর্ব্বে ভীষ্ম, ভ্রাতৃবধূদের নিয়োগের ব্যবস্থাদিতে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা আজকালকার কোনও হিন্দুবিধবার কাছে উপস্থিত করিলে সম্মার্জ্জনী পুরস্কার লাভ করিতে হইত। আরব দেশে বহুস্থানে অতিথি সৎকারের একটা প্রধান অঙ্গ এই যে গৃহস্থের পত্নী অতিথির অঙ্কশায়িনী হয়। এ ব্যবস্থায় অতিথি আপত্তি করিলে তাহা গুরুতর অপমান বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং পত্নী যদি এইরূপে পরপুরুষের সেবা করিতে পরাঙ্মুখ হয় তবে সে সতী বলিয়া পূজিত হয় না – অধর্ম্ম-চারিণী বলিয়া লাঞ্ছিত হয়।

এমনি নানাদেশের আচার অনুশীলন করিলে দেখা যায় যে সতীত্ব বা পতিপত্নীর সম্বন্ধ বিষয়ক যে কোনও কর্ত্তব্য সম্বন্ধেই কোনও নিত্যবিধি কোথাও নাই। এ বিষয়ে ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের মানদণ্ড সমাজের আবেষ্টনাপেক্ষ। সতীত্বের সমাদর ও সম্মানের মূল এই যে, ইহা স্বামী-প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই প্রেম বশতঃ নারী আপনাকে ঠিক সেই ভাবে গঠিত করিতে ইচ্ছা করে যাহা তাহার স্বামীর আকাঙ্ক্ষার অনুযায়ী হইবে। আমাদের

সমাজে সে আকাঙ্ক্ষা পত্নীর একনিষ্ঠার দিকে তাই একান্ত পাতিব্রত্য এখানে প্রশংসিত এবং প্রেমময়ী নারী এই পাতিব্রত্যের সাধনা করে।

এই বিষয়ের আলোচনার শেষে সিংহ মহাশয় আমার একটি উক্তি উদ্ধার করিয়া আমাকে challenge করিয়াছেন। আমি বলিয়াছি "নূতন কথা যতই অরুচিকর হউক না কেন, তাহা বলিবার অধিকার কবিকে দিতে হইতে·····ইত্যাদি।" আমি যেস্থানে এই কথা বলিয়াছি তাহার context এর সম্বন্ধে লেশমাত্র আভাস না দিয়া সিংহ মহাশয় কথাটা উদ্ধার করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমার প্রকৃত বক্তব্য কি তাহা যদি কেহ জানিতে চান তবে আমি তাঁকে আমার প্রবন্ধটি পাঠ করিতে বলিব।

সিংহ মহাশয় এ কথার পর বলিয়াছেন "আমি ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, তিনি তো এতগুলি উপন্যাস লিখিয়া আর্টের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তিনি কয়টি নূতন কথা সমাজকে উপহার দিয়াছেন? স্ত্রী পুরুষের একনিষ্ঠ প্রেমের ব্যভিচার, প্রেমের নামে ভোগলালসার বহ্নিতে আত্মসমর্পণ, ইত্যাদি ব্যাপার ত সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই লোকে শুনিয়া আসিতেছে। এই সকল কথা আর্টের কসরত দেখাইবার জন্য বিলাতী ঢঙে যতই চিত্তাকর্ষক করিয়া চিত্রিত করা হউক না কেন, ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই।"

যদি সিংহ মহাশয় মনে করিয়া থাকেন যে এ প্রশ্নের উত্তরে আমি আমার গ্রন্থের প্রশস্তি বা সমালোচনা করিতে বসিব, তবে তিনি ভুল বুঝিয়াছেন। আমি আমার উপন্যাসে নূতন কথা কতকগুলি বলিবার চেষ্টা করিয়াছি সত্য—কিন্তু সত্য সত্যই তাহা নূতন বা সত্য কিনা সে বিচারের ভার আমার নহে। আমার

প্রবন্ধের যে কথার আলোচনা করিতে তিনি অগ্রসর হইয়াছেন তাহার উত্তরে এই প্রকার ব্যক্তিগত প্রশ্ন উপস্থিত করা শিষ্ট তর্ক পদ্ধতির অনুমোদিত নহে।

আমার উপন্যাসের ভিতর নূতন সত্য কিছু আছে কিনা তাহার দ্বারা আমার প্রবন্ধের বক্তব্যের সত্যাসত্য নির্ণয় হইতে পারে না। যদি নূতন কিছু আমার উপন্যাসে না থাকে, তবে তাহা নিরর্থক হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু ইহাও একেবারে অসম্ভব নয় যে আমার উপন্যাসে নূতন রস বা নূতন সত্য যাহা আছে তাহা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা হয় তো সিংহ মহাশয়ের নাই। যাহাই হউক একথা বিচারের ভার আমার নহে। কিন্তু সিংহ মহাশয় বলিতে চান যে আমার উপন্যাসগুলিতে তিনি পাইয়াছেন, সুধু স্ত্রী-পুরুষের একনিষ্ঠ ব্যভিচার, প্রেমের নামে ভোগলালসার বহ্নিতে আত্মসমর্পণ। অর্থাৎ ইহাই আদর্শ অথবা অনিন্দনীয় বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ইহা ছাড়া নূতন কিছুই তিনি পান নাই।

সাহিত্যিক শিষ্টাচারের যদি কোনও মর্য্যাদা সিংহ মহাশয় রক্ষা করিতে চান, তবে হয় তিনি একথা প্রমাণ করিবেন, নতুবা ক্রুটী স্বীকার করিয়া ইহার প্রত্যাহার করিবেন।

আমি এবিষয়ে সিংহ মহাশয়কে বিশেষতঃ কয়েকটী প্রশ্ন করিতে চাই—আশা করি তিনি আর প্রত্যেকটির সত্য উত্তর দিয়া অনুগৃহীত করিবেন ;

তিনি আমার কয়খানি বই পড়িয়াছেন ? কয়খানির নাম শুনিয়াছেন ? আমার কয়খানি বইয়ে স্ত্রীপুরুষের প্রেমের ব্যভিচারের প্রসঙ্গ মাত্র আছে ? কোন বইখানিতে তাহা প্রসংশিত হইয়াছে বা অনিন্দনীয় বলিয়া বলা হইয়াছে।

কলমের আগায় কালি ছিটাইয়া লোককে কলঙ্কিত করিবার চেষ্টা সহজ। সিংহ মহাশয় আমার সম্বন্ধে বহুবার এমনি সাধারণ উক্তি করিয়াছেন—কোনও খানেই তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁর বক্তব্য প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন নাই। আশা করি তিনি আমার প্রশ্নের উত্তরে আমার প্রত্যেক গ্রন্থ হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া তাঁর নিন্দাবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিবেন এবং যদি তাহা না পারেন তবে তাঁর অক্ষমতা স্বীকার করিবেন।

॥ সাহিত্যে ধর্ম্মের সীমানা ॥

বিচিত্রা ভাদ্র—১৩৩৪

বাঙ্গলা সাহিত্যে কিছুকাল হইল একটা নূতন ধারা বহিয়া চলিয়াছে ইহা সকলেরই নজরে পড়িয়াছে। অনেকের মতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এ ভাবগঙ্গার ভগীরথ। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, এই ধারাপন্থীরা রসোদ্বোধনের সাবেক মামুলী ক্ষেত্র ছাড়িয়া নূতন অনাসংশিত রসমূর্ত্তি বিষয়ের ভিতর রসের উৎস খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। ফলে অনেক সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে, যাহার রসের স্বরূপ ও উৎস পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্য হইতে অনেক অংশে ভিন্ন।

নূতনের সাড়া পাইলেই স্থিতি স্থাপক জনসমাজে একটা প্রচণ্ড কোলাহলের আবির্ভাব হয়। এ ক্ষেত্রেও তাহা হইয়াছে। অনেক আঘাত এই নূতন সাহিত্যকে সহিতে হইয়াছে। উন্মত্তের মত সাবেক সমাজ এই সাহিত্যের দিকে ইট পাটকেল যা খুসী ছুঁড়িয়া মারিয়াছেন। উন্মত্তের নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্ররাশির মত তার অনেক-গুলিই ঠিক জায়গায় পেঁছায় নাই, লক্ষ্য বস্তুর চারিদিকে কেবল নিরর্থক আবর্জ্জনা হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে। আর আঘাতের লক্ষ্য নির্ণয়েও এই সব ক্ষাত্রধর্ম্মী সাহিত্য সমালোচক তাঁদের লক্ষ্য নিশ্চয় করিতে গিয়া বাছ বিচার করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন—কে শত্রু, কে মিত্র, কে বা নূতন, কে বা পুরাতন, কে লক্ষ্য, কে অলক্ষ্য তাহা বাছাই করিবার চেষ্টা না করিয়া এলোমেলোভাবে তাঁরা গোলাগুলি বর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। যাঁরা এতদিন এই ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, রসসৃষ্টি ও রসের নির্ম্মল আনন্দ উপভোগীর বিধিদত্ত অধিকারে তাঁরা বঞ্চিত। তাই নূতন ধারার সাহিত্য

তাহাতে বিচলিত হয় নাই। কিন্তু হঠাৎ এই আক্রমণকারীদের রথের উপর আজ এমন একজন আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছেন যাঁহাকে দেখিয়া নব সাহিত্য চমকিত হইয়া চক্ষু বারবার মাজিয়া অবাক বিস্ময়ে চাহিতেছে। আজকার সংগ্রামে যিনি রথী তিনি রথীশ্রেষ্ঠ, রসসাহিত্যে তাঁর অবিসম্বাদী অধিকার। তাছাড়া তিনিই তো এতদিন সমালোচক জগতের কষাঘাতের পোনোরো আনা নিজের বিশালপৃষ্ঠে বহন করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র সমরে দ্রোণাচার্য্যকে আপনার বিরুদ্ধে রথারূঢ় দেখিয়া গাণ্ডীবীর ক্লৈব্যের উদয় হইয়াছিল। যাঁকে নিত্য নূতন রসের পূজারী, নূতন ধারার মন্ত্র গুরু ও অগ্রদূত বলিয়া নবসাহিত্য এতদিন পূজা করিয়া আসিয়াছে, আজ তাঁহার হাতে আঘাত খাইয়া সে যদি হঠাৎ বিভ্রান্ত ও বিচলিত হইয়া উঠে তবে তাহা বিচিত্র নয়।

এতদিন নূতন সাহিত্য সম্বন্ধে যে সব নিন্দা শোনা গিয়াছে তার প্রধান কথা এই যে, ইহা সমাজনীতি বিরুদ্ধ। তা'ছাড়া আর একটা কথা শোনা গিয়াছিল যে, ইহা বিলাতী, এ-দেশের আবহাওয়া বা জীবনের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "সাহিত্যধর্ম্ম" প্রবন্ধে যে সমালোচনা করিয়াছেন তার তলায় তলায় যে এই কথাগুলিই তাঁকেও অনবরত খোঁচা মারিতেছে, তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। তবু সাহিত্যের প্রকৃতি বিচারে যে এই সব কথা একেবারে অবান্তর, রসজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ সে কথাটা নিজের কাছে একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাই তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—"সাহিত্যে যৌন-সমস্যা নিয়ে তর্ক উঠেছে, সামাজিক হিতবুদ্ধির দিক দিয়ে তার সমাধান হবে না, তার সমাধান কলারসের দিক থেকে।" এই প্রথম স্বীকার্য্য ধরিয়া লইয়া তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, "সম্প্রতি আমাদের

সাহিত্যে বিদেশের আমদানী যে একটা বে-আব্রুতা এসেছে” তাহা কলারস বিরুদ্ধ।' কবিবরের এই সিদ্ধান্ত শ্রদ্ধার সহিত আলোচনার যোগ্য।

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, শ্রদ্ধেয় লেখক তাঁর এ-সিদ্ধান্ত যুক্তির উপর নিয়মিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা না করিয়া কেবলমাত্র একটা শ্রেণীবদ্ধ কাব্যস্তূপের উপর বসাইয়া দিয়াছেন এমনভাবে, যে পড়িয়া মনে হয় তাঁর পূর্ব্বের কথাগুলি যুক্তি, কিন্তু হাতড়াইয়া দেখিতে গেলে ধরিবার ছুঁইবার মত কিছুই পাওয়া যায় না। যুক্তির একটা পাকা জবাব যুক্তি দিয়া দেওয়া যায়, কিন্তু কাব্যের উত্তরে যুক্তির পথ কেবলি একটা ধোঁয়ার মধ্যে ঘুরিয়া মরে, কোনও কঠিন লক্ষ্যের সন্ধান পায়না। তা'ছাড়া সমগ্র আধুনিক সাহিত্য বেষ্টন করিয়া কবিবর এই যে সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন তাহার বিষয়বস্তু ঠিক নির্দ্দিষ্ট করিবার কোনও চেষ্টা তিনি করেন নাই। “সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আম্‌দানী যে বে-আব্রুতা এসেছে” তাহা কোথায় পাওয়া যাইবে? সমস্ত আধুনিক সাহিত্য ইহার লক্ষ্য বস্তু হইতেই পারে না, কেননা যে সাহিত্যের ভিতর শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর মতন খড়্গহস্ত শুচিধর্ম্মী সাহিত্যিকও আছেন, তাহা আদ্যোপান্ত এই অভিযোগের বিষয় হইতে পারে না। “বিদেশের আমদানী” কথাটায়ও কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না, কেননা কেবল কয়েকখানি অনুবাদগ্রন্থ ছাড়া কোনও গ্রন্থের লেখকই তাঁদের বই বিদেশের আমদানী বলিয়া প্রচার করেন নাই, এবং এমন অনেকে আছেন যাঁরা তাঁদের লেখা সম্পূর্ণরূপে এই দেশের জল-মাটির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দাবী করেন,—যাঁদের হয়তো কবি এই সমালোচনার বহির্ভূত বলিয়া মনে করেন না। তা'ছাড়া

"বিদেশের আমদানী" কথাটা পরিচয় হিসাবে কোনও নির্দ্দেশই দেয় না,—কেননা এক হিসাবে রাজা রামমোহনের পরবর্ত্তী সমস্ত সাহিত্যই অল্পবিস্তর বিলাতের আমদানী। বিদেশী কবিতার রসাস্বাদে যারা অভ্যস্ত নয়, তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার রসাস্বাদই অসম্ভব, এ-কথা হয়তো কবির কোনো ভক্তই অস্বীকার করিবেন না।

"বে-আব্রুতা" এবং যৌন সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াও কবি বিষয় নির্ণয় সুকর করেন নাই। কেননা যৌন সম্বন্ধের আলোচনা বঙ্কিমচন্দ্রের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল সাহিত্যেই অল্পবিস্তর হইয়াছে—হয়তো সব চেয়ে বেশী হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের নিজের বিরাট গ্রন্থাবলীতে। সেই আলোচনার ভিতর কতটা যে আব্রু-যুক্ত আর কোনটা যে বে-আব্রু এ-সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে। বে-আব্রু কাহাকে বলে এ-সম্বন্ধে মত ও রুচির ভেদ, ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিতর তো আছেই, একই যুগে ও দেশে বিভিন্ন মানুষের ভিতরও আছে। মুসলমানদের কাছে যে-নারী একেবারে বে-আব্রু, বিলাতে সে অত্যধিক আবৃত বলিয়া পরিগণিত হইবে। আর আমাদের দেশে যাঁরা সেমিজ বিহীন সূক্ষ্ম-সাড়ী পরিহিতা নারীর দিকে চাহিতে কোনও সঙ্কোচ বোধ করেন না, তেমন অনেক পুরুষকে আধুনিক ইংরাজমহিলার পরিচ্ছদের বে-আব্রুতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে শুনিয়াছি।

সাহিত্যের বে-আব্রুতার সম্বন্ধে তেমনি কোনও নিত্য বা সনাতন মাপকাটি নাই, এমন কিছুই নাই যাহার দ্বারা আব্রুতার ও বে-আব্রুর মধ্যে একটা খুব সুনির্দ্দিষ্ট সীমানা টানিয়া দেওয়া যাইতে পারে। "চোখের বালি"র অনেকগুলি দৃশ্য অনেকের মতে অতিরিক্ত বে-আব্রু। "ঘরে-বাইরে"র অনেকটা তো বটেই

অথচ আমরা তা' মনে করি না এবং সম্ভবতঃ কবীন্দ্রও তাহা মনে করেন না। শরৎচন্দ্রের "শ্রীকান্ত" কিংবা "চরিত্রহীন" কি এই বে-আব্রুর অন্তর্ভুক্ত? এ বিষয়ে কবিবর আমাদিগকে কোনও অভ্রান্ত নির্দ্দেশ দেন নাই। কবির কতক কথায় মনে হয় যে, যতক্ষণ লেখক কেবল মনের অভিসার লইয়া আলোচনা করেন, ততক্ষণ তিনি শ্লীলতার সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকেন, যখন তিনি মন ছাড়িয়া দেহ লইয়া টানাটানি করেন তখনই তিনি বে-আব্রু। কিন্তু তাহাতেও কথাটা স্পষ্ট হয় না। শারীর ব্যাপার মাত্রই তো অপাংক্তেয় নয়, কেননা চুম্বনের স্থান সাহিত্যে পাশ করিয়া দিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকল সাহিত্য সম্রাট। আলিঙ্গনও চলিয়া গিয়াছে। তা'ছাড়া "হৃদয়-যমুনা" "স্তন" "বিজয়িনী" "চিত্রাঙ্গদা" প্রভৃতি বহু কবিতায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দৈহিক ব্যাপার লইয়া অপূর্ব্ব রস উদ্বোধন করিয়াছেন। সুতরাং এখানেও একটা সীমারেখা আছে, যাহা অতিক্রম করিলেই সাহিত্য বে-আব্রু পদবাচ্য হইতে পারে। সে সীমারেখা কবি কোথায় টানিয়াছেন, তার বাহিরে কোন বই, ভিতরেই বা কোন বই,—তাহা নির্ণয় করিবার কোনও নির্দ্দেশই কবি দেন নাই।

কাজেই কবির এই সিদ্ধান্ত আলোচনা করা অত্যন্ত দুরূহ। বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যে এমন কতকগুলি বই অবশ্যই জন্মিয়াছে যার সম্বন্ধে অসঙ্কোচে বলা যায় যে, তাহা একটা শারীর ব্যাপার লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া মানুষের একটা নিকৃষ্ট বৃত্তির সেবা করিয়াছে মাত্র, তাহা লইয়া কোনও রস উদ্বোধন করে নাই। কেবল সেই গ্রন্থগুলি সম্বন্ধেই কবির এই উক্তি প্রযোজ্য এ-কথা যদি নিঃসংশয়ে ধরিয়া লওয়া যাইত তবে তাঁহার এ-সিদ্ধান্ত

সম্বন্ধে কোনও আপত্তিই উঠিতে পারিত না। কিন্তু সাহিত্যের এই অকিঞ্চিৎকর আবর্জনা দূর করিবার জন্য কবিবর তাঁর অপরিমেয় শক্তি নিযুক্ত করিয়াছেন এ-কথা মনে করা কঠিন —কেননা এই সব বইয়ের সংখ্যা হয়তো খুব বেশী নয় এবং সেগুলি সাহিত্যের বাজারে রদ্দীমাল বলিয়া সুপরিচিত। তা'ছাড়া কবির লিখনভঙ্গী ও তাঁর যুক্তিতর্কের স্বরূপ হইতে মনে হয় যে তাঁর লক্ষিত বস্তু ইহার চেয়ে অধিক ব্যাপক।

রবীন্দ্রনাথ যৌন মিলন ব্যাপারটার দুইটি স্বতন্ত্র দিকের উল্লেখ করিয়াছেন—প্রথম প্রজনার্থ মিলন, দ্বিতীয় প্রেম। এক দিক ইহার দৈহিক ব্যাপার, অপর ভাগ মানসিক বা আধ্যাত্মিক —এইরূপে তাঁর বক্তব্যের অনুবাদ করিলে বোধ হয় ভুল করা হইবে না। দৈহিক সম্বন্ধের দিকটার বিষয়ে তাঁর মত এই যে, "রসবোধ নিয়ে যে সাহিত্য কলা, সেখানে এর (বিজ্ঞানের) সিদ্ধান্ত স্থান পায় না।" এই কথাটা পরবর্ত্তী কথার সঙ্গে সমন্বয় করিলে তাঁর সিদ্ধান্তটা এই বলিয়া মনে হয় যে, যৌন-মিলনের এই দিকটা লইয়া যে-সাহিত্য আলোচনা করে সেইটাই "বিদেশের আমদানী বে-আব্রুতা" এবং তার উপরই তিনি কশাঘাত করিয়াছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি রবীন্দ্রনাথের লেখার ভিতর খুব একটা সুনির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত কোনও খানেই সাদা কথায় লেখা হয় নাই—সাদা কথাটা কাব্যরস ও বাক্যালঙ্কারের নিপুণ রমণীয় অরণ্যের মাঝখানে যত্নে সংগুপ্ত আছে—কেবল অলঙ্কারের ইঙ্গিত দিয়া তাহা নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। কাজেই ঠিক তাঁর কি অভিপ্রায় তাহা তাঁর কোনও বিশিষ্ট উক্তির দ্বারা নিশ্চয়রূপে নিরূপণ অসম্ভব। কিন্তু আমি যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে কবিবর তাঁর ভাষা ও অলঙ্কারের ইঙ্গিতে এই তথ্যই লক্ষিত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

এই তথ্য কবিবর কোনও সুনিবদ্ধ যুক্তিমালার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, কেবল যুক্তির ইঙ্গিত করিয়াছেন কতকগুলি রূপক দ্বারা। সেই রূপকমালা যে যুক্তির স্থান লইতে পারে না তাহা দুই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইব। তিনি সত্য ও সার্থকের মধ্যে যে ভেদ অভ্রান্তভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বলিয়াছেন,—"যে জিনিষের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে দেখি সেই জিনিষই সার্থক। এক টুক্‌রো কাঁকর আমার কাছে কিছুই নয়, একটি পথ আমার কাছে সুনিশ্চিত (ইহা কি সার্থকের সঙ্গে একার্থবোধক ?) অথচ কাঁকর পদে পদে ঠেলে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেয়, চোখে পড়লে তাকে তোলবার জন্যে বৈদ্য ডাকতে হয়, ভাতে পড়লে দাঁতগুলো আঁৎকে ওঠে; তবু তা'র সত্ত্বের পূর্ণতা আমার কাছে নেই। পথ কনুই দিয়ে বা কটাক্ষ দিয়ে ঠেলাঠেলির উপদ্রব একটুও করে না, তবু আমার সমস্ত যেন তাকে আপনি এগিয়ে স্বীকার করে।"

পথ ও কাঁকরের এ দৃষ্টান্ত যুক্তি ও নয়, নৈয়ায়িকের দৃষ্টান্তও নয়। সে মাপে ওজন করিতে গেলে ইহার ভিতর এতগুলি ফাঁক ধরা যায় যে নৈয়ায়িক এ-দৃষ্টান্ত বা যুক্তিকে কোনও মতেই স্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু এতো যুক্তি নয়, এ একটা রসচিত্র। যে-সত্যটা কবি প্রথমে প্রস্তাব করিয়াছেন ঠিক সেইটাই এই রস-চিত্র দিয়া প্রকট করিয়াছেন। সত্য ইহার মধ্যে লজিকের সূত্রে নাই, আছে কবির অনুভূতিতে।

প্রথমতঃ, পথের সার্থকতা ও কাঁকরের অসার্থকতা যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তবু একের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে দেখি অপরের মধ্যে তাকে দেখি না ইহাই যে তাদের মধ্যে প্রকৃত সার্থক প্রভেদ, তার কোনও হেতুই আমরা পাই না। এ-কথা খুব

যুক্তির সঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, ইহাদের প্রকৃত প্রভেদ এই যে, পথ আমাদের আনন্দ দেয়—আমাদের রূপবোধকে পরিতৃপ্ত করিয়া, আর কাঁকর আমাদের পীড়া দেয়; সম্পূর্ণের প্রকাশ বা অপ্রকাশ এ-বিষয়ে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক। তা'ছাড়া পথের মধ্যেই যে সম্পূর্ণের প্রকাশ আছে, কাঁকরের মধ্যে তা কখনই থাকিতে পারে না, এ-কথাও তো চিরন্তন সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সমস্ত বিশ্বকে যে-দৃষ্টিতে আয়ত্ত করা যায়, সে-দৃষ্টির সম্মুখে কাঁকর ও নিরর্থক নয়, তার স্থানে সে সার্থক,—আর সেই সার্থকতায় তার রসরূপের কল্পনা একেবারেই অসম্ভব নয়। যে ব্যক্তি এই বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র কাঁকরকে—Sub-specie aternitatis—দেখিতে পারিয়াছে সে তার সার্থকতা লইয়া রস-রচনা অনায়াসে করিতে পারে—তার কাছে তো কাঁকর অসার্থক নয়, তার কাছে কাঁকরের সত্যের পূর্ণতা প্রকাশ হইয়াছে। সুতরাং নৈয়ায়িকের কথায় বলিতে গেলে, এ-দৃষ্টান্ত এক দিকে অব্যাপ্তি আর একদিকে অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট।

আর একটা দৃষ্টান্ত দিই। সজনে ফুল তার সৌন্দর্য্য সত্ত্বেও, কবির কথায়,—"ও যে আমাদের খাদ্য এই খর্ব্বতায় কবির কাছেও আপনার সামর্থ্য হারাল।" তেমনি বকফুল প্রভৃতি সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—"রান্নাঘর ওদের জাত মেরেছে।" পক্ষান্তরে, "সকল ব্যবহারের অতীত ব'লে মকর বেঁচে গেছে।" এইসব দৃষ্টান্ত দ্বারা কবি এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন যে,—"যে জিনিষটা কাজে খাটাই তাকে যথার্থ ক'রে দেখিনে। প্রয়োজনের ছায়াতে সে রাহুগ্রস্ত হয়।"

এ-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আপত্তি করিবার বহু হেতু আছে। কিন্তু এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে দৃষ্টান্তের সম্বন্ধ যদি আমরা ন্যায়ের মাপকাঠি

দিয়া যাচাই করিতে যাই তবে ইহা একদণ্ডও টিকিবে না। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে দৃষ্টান্তগুলি অনিন্দনীয়, তবু, ন্যায়ের বিধানে, কেবল পাঁচটা অনুকূল দৃষ্টান্ত দিলেই কোনও সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় না; দৃষ্টান্তগুলি সমস্ত অভিজ্ঞতার ব্যাপক হওয়া চাই—আর একশত অনুকূল দৃষ্টান্ত একটা বিরুদ্ধ দৃষ্টান্তে বিপর্য্যস্ত হয়। অথচ এখানে বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত যে অনেকগুলি আছে তাহা কবি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন;—তিনি মানিয়াছেন যে "সে-কবির সাহস আছে, সুন্দরের সমাজে তিনি জাত বিচার করেন না।" যে সজনে ফুলের দৃষ্টান্ত তিনি দিয়াছেন তাহাই অন্ততঃ তাঁর নিজের কাছে সার্থক হইয়া উঠিয়া তাঁর কাব্যে স্থান পাইয়াছে, আর "বিচিত্রার" শ্রাবণের সংখ্যাতেই তেমনি কুরচি ফুল তাঁর কাছে সার্থক হইয়াছে। পক্ষান্তরে যে বিম্বফল কবির কাছে পরম সার্থক, কবি হয়তো জানেন না, তাহাও লোকে কাজে লাগাইয়া থাকে, এবং কোথাও কোথাও তাহার তরকারীও খাইয়া থাকে। তাঁর মত সাহসিক কবি ছাড়া অন্যেও, মানুষের কাছে খুব বেশী খাটে যে গরু ঘোড়া, তাহা লইয়া কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। মকর যদি দেবীর বাহন হইয়া সার্থক হইয়া থাকে, তবে গরু কি দেবী হইয়াও সার্থক হয় নাই?—অথচ ছেলেবেলায় গরুর রচনায় কে না প্রথমেই লিখিয়াছে 'গরু অতি উপকারী জন্তু'?

তেমনি পুরুষের জীবনে পত্নীকে অকেজো বলিয়া কেউ উপেক্ষা করিবেন না—অথচ সেই যে কাজের মানুষ পত্নী, তিনিও অনেক কবির কাছে কাব্যহিসাবে সার্থক হইয়া উঠিয়াছেন।

যাহা প্রয়োজনে লাগে তাই যে কাব্য হিসাবে অসার্থক, আর যাহা নিষ্প্রয়োজন তাই সার্থক নয়, এ কথা সত্য নহে, আর ইহার

পক্ষে প্রকৃত কোনও যুক্তি নাই। কবির কাছে কোন জিনিষটা সার্থক, কোন্‌টা অসার্থক তার একমাত্র নির্ণায়ক সেই বিশিষ্ট কবির রস-বোধ। যাহা সেই রস-বোধকে উদ্বুদ্ধ করে তাহাই সার্থক, যাহা তা' করে না তাহা অসার্থক। এই যে রস-বোধের উপর ঘা দেওয়া, সেটা কতকটা নির্ভর করে বস্তুর স্বরূপের উপর, আর কতকটা নির্ভর করে সেই বিশিষ্ট কবির বিচিত্র চিত্তগঠনের উপর। এ কথা সত্য যে, যে-জিনিষের সঙ্গে আমাদের হামেষা পরিচয় হয় এবং যাহা আমাদের চিত্তে অন্য বিশিষ্ট প্রয়োজন দ্বারে নিয়ত প্রবেশ করে, তার প্রতি অনেক সময় আমাদের রসবোধ সাড়াহীন হইয়া পড়ে, আর সে-জিনিষ সদাসর্ব্বদা আমাদের ঘিরিয়া থাকে না, তফাৎ হইয়া কেবলমাত্র রস-বোধের দ্বারপথেই প্রবেশ লাভ করে, তাহার আঘাতে মনটা চট করিয়া সাড়া দেয়। এই প্রভেদের কারণ ইহা নয় যে একটা প্রয়োজন ও আর একটা অপ্রয়োজন, ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, একটা অতিপরিচিত ও আর একটা অপরিচিত। অনতি-পরিচিতের একটা প্রবল আকর্ষণ মানুষের চিত্তের সব দিকেই দেখা যায়।

অতএব কবিবরের রসাবৃত যুক্তির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের চেষ্টা না করিয়া তাঁর প্রতিপাদ্যটিকে মোটামুটি আলোচনা করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব। তাঁর মতে যাহা সত্য তাই সার্থক নয়, আর কাব্যের প্রকৃত প্রয়োজন সত্যমাত্র লইয়া নয়, যাহা রসের দিক হইতে সার্থক তাহাই লইয়া। যাহা আমাদের প্রয়োজন সাধারণতঃ তাহা রসের দিক হইতে সম্পূর্ণ অসার্থক।

স্ত্রীপুরুষের মিলনের দুইটি দিক আছে একটি পশুভাবে, আর একটি মানুষভাবে, প্রেমের ভাবে। প্রথমটির প্রয়োজন যথেষ্ট আছে, তাহার সত্যতাও অবিসম্বাদিত, কিন্তু তাহা রসহিসাবে

অসার্থক। শুধু প্রেম অর্থাৎ যৌন-সম্বন্ধের মানসিক স্বরূপটাই রসবিচারে সার্থক হয় বা হইতে পারে। প্রেমের ভিতর একটা আব্রু আছে, কাজেই সেই আব্রুটা ভেদ করিয়া যৌনমিলনের পশুভাবের আলোচনা সাহিত্যে নিত্যবস্তু হইতে পারে না, ঠিক যেমন ভোজন-ব্যাপার লইয়া রসোদ্বোধনের চেষ্টা ক্ষণিক আমোদ সৃষ্টি করিলেও কোনও নিত্যবস্তু হইতে পারে না। সুতরাং কবিবরের সিদ্ধান্ত এই যে, বিদেশের আমদানী যে বে-আব্রুতা আজকাল সাহিত্যে দেখা দিয়াছে তাহা নিত্য নয়, নিত্য হইতে পারে না।

এই যুক্তি ধারার মধ্যে অনেকগুলি ফাঁক আছে। প্রথমতঃ প্রয়োজন অপ্রয়োজন দিয়া কাব্যহিসাবে সার্থকতা অসার্থকতার নির্ণয় হয় না একথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ যৌন সম্বন্ধের যে দিকটা পশুধর্ম্ম বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা রসের বিচারে চিরকালই অসার্থক এ-কথা ঠিক নয়। কবির কাব্য চিরদিনই কেবল মানসিক প্রেম লইয়া সীমাবদ্ধ না থাকিয়া দৈহিক ব্যাপারে আপনার সার্থকতা খুঁজিয়াছে; চুম্বন আলিঙ্গন ছাড়িয়া খুব কম কাব্যই প্রেমের চিত্ররচনায় সার্থকতা লাভ করিয়াছে। তা'ছাড়া কালিদাস তাঁর মেঘদূতে বা ঋতু সংহারে, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস তাঁদের পদাবলীতে সম্ভোগের যে বিচিত্র রসচিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা কোনও কাব্যামোদীই আজ বাতিল করিতে প্রস্তুত হইবে না।

কাব্যের মধ্যে দেহের গন্ধ থাকিলেই তাহা কাব্যের "নিত্য" রসে বঞ্চিত হইবে একথা যে সত্য নহে তাহার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের বহু রচনায় আছে। অথচ কেবলমাত্র যৌন-সম্বন্ধের শারীর ব্যাপার লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া পাঠকের

চিত্তের রিরংসার উপর বাণিজ্য করা যে নিত্য অনিত্য কোনও রূপরসই নয় তাহাও অস্বীকার করিতে পারি না। সুতরাং আসল কথা—এই দুইয়ের ভিতর সীমা-নির্দ্দেশ। রবীন্দ্রনাথ যে কোথায় সীমা-রেখা টানিতে চান তাহা ঠিক বুঝা গেল না। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এই যৌন সম্বন্ধের দৈহিক ও মানসিক গোটা স্বরূপটা লইয়া ইহার কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানেই অভ্রান্তভাবে চিরকালের তরে সীমা-রেখা টানিয়া দেওয়া যায় না। যে ব্যাপারটার রস-হিসাবে কোনও সার্থকতা নাই বলিয়া এক কবি তাহাকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়াছেন, আর এক কবি তাহা লইয়া অপূর্ব্ব রস রচনা করিয়াছেন। যৌনমিলনের যে ভাগটা রসহিসাবে অসার্থক বলিয়া রবীন্দ্রনাথ নামঞ্জুর করিয়াছেন, Theophile Gautier ও Maxim Gorky সেই ব্যাপার লইয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহাকে সামাজিক শীলতার দিক হইতে যাহাই বলিবার থাকুক, রসহিসাবে তার ঐশ্বর্য্য কেহ অস্বীকার করিবেন না। কালিদাস ও বৈষ্ণব কবিদিগের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং এ কথা যদি সত্য হয় যে, "সাহিত্যে যৌনমিলন নিয়ে যে তর্ক উঠেছে, সামাজিক হিতবুদ্ধির দিক থেকে তার সমাধান হবে না, তার সমাধান কলারসের দিক থেকে,"—তবে এই সব যে রসোদ্বোধন ব্যাপারে একেবারে চিরকাল অপাংক্তেয় থাকিবেই একথা সত্য নয়।

যাহা রসরচনা এবং যাহা কেবলমাত্র কদর্য ইন্দ্রিয়-বিলাস তার মধ্যে প্রকৃত সীমা নির্দ্দেশ, যৌন মিলন ব্যাপারটার অঙ্গ বিশ্লেষণ করিয়া তাহার ভিতর একটা লাইন টানিয়া করা যায় না। প্রভেদটা বাহিরের নয় ভিতরের। নগ্ন নারী-মূর্ত্তি মনোহর

রসমূর্ত্তি হইতে পারে, আবার কদর্য্য অশ্লীলতা হইতে পারে। Venus of Milo দেখিয়া অশ্লীলতার কথা বলিবে এমন মূঢ় কম আছে। অথচ ইহা অপেক্ষা অধিক আবৃত নারীমূর্ত্তিও কদর্য্য বলিয়া হেয় হইতে পারে। দুই-এর মধ্যেকার ভিতর আবরণ কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাহা ইহাদের ভেদের কারণ নয়, ইহাদের ভেদ ভাবের ভেদ। যাহা আমাদের রসবোধে সাড়া জাগায় সেটা আবৃত হউক অনাবৃত হউক, তাহা আর্ট, আর যাহা রসবোধে সাড়া দেয় না, দিতে চায়ও না, কেবল মানুষের পশু-প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে, তাহা আর্ট নয়। কি চিত্রে, কি গল্পে, কি কবিতায় আর্ট হিসাবে ভাল মন্দের ইহা ছাড়া অন্য কোনও মান নাই। এই যে প্রভেদ ইহা একটা গভীর আধ্যাত্মিক প্রভেদ, যাহার স্বরূপ প্রত্যেক রসজ্ঞ স্বীকার করিবেন, কিন্তু অরসিককে অন্য কোনও বাহ্য লক্ষণ দিয়া বুঝাইবার কোনও উপায়ই নাই।

এই কথা রবীন্দ্রনাথ নিজে বহুবার বলিয়া থাকিবেন, এবং আজও যে তিনি ইহা ছাড়া অন্য কিছু বলিতে চান তাহা আমি মনে করি না। কিন্তু ইহাই যদি সত্য হয়, তবে তিনি আব্রু ও বে-আব্রুর ভিতর যে বাহ্য ভেদ স্বীকার করিয়া একের রসের নিত্যতা ও অপরের রসবিচারে অসার্থকতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন, সে চেষ্টা একেবারেই অসার্থক।

ইংলণ্ডের সাহিত্যে ভিক্টোরীয়-যুগে চারিদিকে সম্ভ্রম বাঁচাইয়া আব্রু রক্ষা করিয়া রস-রচনার আয়োজন হইয়াছিল। সে সাহিত্য শ্লীলতার একটা বাহ্য সীমা স্বীকার করিয়া তার বাহিরের সব বস্তুকে রসরাজ্যের অধিকার হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিল। সে সীমা লঙ্ঘন করিয়া ফরাসী ও পরে ইউরোপীয়

অন্যান্য দেশের সাহিত্যিকগণ এই অপাংক্তেয় বিষয়গুলি হইতে অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, রস-সাহিত্যের এমন কোনও বাহ্য সীমা বাঁধিয়া দেওয়া একেবারে অসম্ভব। ইহাদের মধ্যে যাঁরা প্রকৃত রসস্রষ্টা তাঁরা যে সত্য সত্যই এই সব বিষয়ে উচ্চ অঙ্গের রস সৃষ্টির যথার্থ উপাদান আবিষ্কার ও সম্যক নিয়োগ করিয়াছেন অতি বড় শ্লীলতাবাদীও তাহা অস্বীকার করিবেন না। পক্ষান্তরে তাঁহাদের বিকৃত পদাঙ্কের অনুসরণে যে ইউরোপে বর্ত্তমান যুগে অনেক স্থলে একটা নিদারুণ উচ্ছৃঙ্খলতা, সাহিত্যের নামে বীভৎস অশ্লীলতা ও ব্যভিচার গজাইয়া উঠিয়াছে তাহাও কেহ অস্বীকার করিবেন না। এই সব অপসৃষ্টি ও প্রকৃত রস সৃষ্টির মধ্যে প্রভেদ কোনও বাহ্য সীমার নয়, প্রভেদ অন্তরের রসমূর্ত্তির।

বঙ্গসাহিত্যেও এই নূতন প্রেরণার একটা প্রতিঘাত দেখা দিয়াছে এ কথা সত্য। উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যে যে প্রদেশ শিষ্ট-সাহিত্যের সীমা-বহির্ভূত বলিয়া বর্জ্জিত ছিল, তার ভিতর প্রবেশ করিয়া একাধিক সাহিত্যিক নূতন রসসৃষ্টির আয়োজন করিয়াছেন। তা'র মধ্যে কতকটা যৌন-সম্বন্ধের পূর্ব্ব-নিষিদ্ধ দেশ হইতে সংগৃহীত। যাঁরা এ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রকৃত রস সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাঁদের সকল সৃষ্টিকে যদি রবীন্দ্রনাথ এই বাহ্য সীমা-নির্দ্দেশের দোহাই দিয়া অনিত্য বলিয়া ভাসাইয়া দিতে চান, তবে বিনীতভাবে নিবেদন করিতে হয় যে, তাঁর অশেষ প্রতিভা ও অতুলনীয় শক্তি সত্ত্বেও তাঁর এই নিষ্পত্তি চরম বলিয়া মানিয়া লইতে আমি অসমর্থ। চলিত যুগের সাহিত্য সম্বন্ধে এমন বিচার কোনও কালেই কেহ ষোল আনা অভ্রান্তভাবে করিতে পারেন নাই, রবীন্দ্রনাথের এ

সিদ্ধান্তও অভ্রান্ত না হইতে পারে। আজ সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যে স্থান, ইংরাজী সাহিত্যে একদিন জন্‌সন্ সেই স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সাময়িক সাহিত্য সম্বন্ধে জন্‌সনের মতামত ইতিহাস অভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করে নাই। রবীন্দ্রনাথের এ-মতও তেমনই একটা প্রকাণ্ড প্রতিভার একটা ব্যর্থ চেষ্টার পরিচয়রূপে ইতিহাসে স্থান পাওয়া অসম্ভব নয়।

রসসৃষ্টির মধ্যে কোন্‌টা নিত্য কোন্‌টা অনিত্য তাহা তার বিষয় লইয়া বা অন্য কোন উপায়েই অভ্রান্তভাবে নির্দ্দেশ করা যায় না। ঈশ্বর গুপ্তের পাঁটা ও তপ্‌সী মাছের কবিতা আজ আর চলে না, বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীল স্থানগুলিও অচল হইয়াছে,—সে যে তা'দের বিষয় নির্ব্বাচনের দোষে এ-কথা বলিলে অন্যায় হইবে। Lamb-এর Roast Pig সাহিত্যের একটা স্থায়ী সম্পদ, কালিদাসের মেঘদূত বা ঋতু সংহারে কিম্বা বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসে যদি কোনও রুচিবাগীশ অশ্লীল স্থান ছাঁটিয়া ফেলিতে চান, তা'তে রসজগতের একটা স্থায়ী ক্ষতি হইবে। একটা জিনিষ যে চলে নাই মরিয়া গিয়াছে তাহাতেই তার বিষয়-বস্তুর অসার্থকতা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হয় না। রবীন্দ্রনাথের যৌবনের অনেক কবিতাই এখন চল্‌তির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, যদিও আমাদের যৌবনকালে সেইগুলির চল্‌তি সব চেয়ে বেশী ছিল। তাহা হইতে এ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, তার বিষয়বস্তু রস-হিসাবে অচল—ইহাও বলা না যে, সে-কবিতা বা গানগুলিও সত্য সত্যই সার্থক রসরচনা নয়।

আর দুইটা কথা বলিয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করিব। নূতন সাহিত্যকে "বিদেশের আম্‌দানী" বলিয়া কবিবর কটাক্ষ করিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথের কাছে এ-কথা লইয়া কটাক্ষপাতের

প্রত্যাশা করি নাই। আলো যদি আমার অন্তরে আসিয়া থাকে, তাহা কোন জানলা দিয়া আসিয়াছে তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, যদি সে আলো সত্য সত্যই আমার অন্তরের ভিতরকার মণিরত্ন উদ্ভাসিত করিয়া থাকে। আকাশের আলো আরসী হইতে শুধু প্রতিফলিত হয়—এখানে আলোর যে প্রকাশ তার ভিতর আরসীর কোনও কৃতিত্ব নাই; কিন্তু সেই আলোয় যখন সরোবরে পদ্ম ফুটিয়া ওঠে তখন কেহ পদ্মকে এ-কথা বলিয়া নিগ্রহ করে না যে, তোমার ফোটাটা ধার করা। রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে অনেকটারই উদ্দীপনা আসিয়াছে পশ্চিমের সাহিত্য ও সমাজ হইতে। টম্‌সন্ সাহেব কথাটা বলিতে গিয়া একটা বাজে ও অসত্য কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, "রাজা ও রাণী" Doll's House-এর ছায়ায় রচিত। ইহাতে শ্রীযুক্ত বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। কিন্তু সমগ্রভাবে Ibsen বা Maeterlinck-এর প্রভাব যে তাঁর লেখায় আসিয়াছে সে-বিষয়ে শ্রীযুক্ত বাণীবিনোদ কি বলিবেন জানি না, অন্ততঃ কবি স্বয়ং তাহা অস্বীকার করিবেন না। তেমনি আরও অনেক লেখকের লেখাই তাঁর অন্তরের পদ্ম-কোরকে আঘাত করিয়াছে; তবে তিনি তাঁর গৃহীত আলোক শুধু ফিরাইয়া দেন নাই, আলো গিয়া তাঁর অন্তরে রূপের সৃষ্টি করিয়াছে। তাই বিলাতী বা অন্য যে প্রভাবই তাঁর ভিতর থাকুক তা'তে তাঁর গৌরবহানি হয় নাই।

যে সাহিত্যকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের এই সমরাভিযান, তাহাকে তিনি কেবল এক কথায় বিলাতের আমদানী বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। বিলাতী আধুনিক সাহিত্যের প্রভাব তার উপর আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা যে

আগাগোড়া শুধু বিলাতীর পুনরুদ্‌গীরণ এমন কথা কিছুতেই সত্য বলিয়া মানা যায় না। এই সাহিত্যের মধ্যে এমন অনেক লেখাই আছে যাহা নিঃশেষে দেশের জীবন ও সমাজের সত্য স্বরূপের রসমূর্ত্তি—যা'কে বিলাতের আমদানী বলা একটা নিষ্ঠুর পরিহাস। যদি রবীন্দ্রনাথ নাম গোত্র দিয়া তাঁর লক্ষিত বিষয়ের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেন, তবে তাঁর এ-কথার ভিতর যে অবিচার আছে তাহা দেখান যাইতে পারিত।

তা' ছাড়া এ-সাহিত্যের সম্বন্ধে তিনি এমন কথা বলিয়াছেন যাহা হইতে অনুমান হয় যে, এ-সাহিত্য কতকগুলি বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠিত সত্যকে আশ্রয় করিয়া, কোনও রূপরসের বিচার না করিয়া, বিজ্ঞানের সত্যকে সাহিত্যে চালাইবার চেষ্টা করিয়াছে। এ-কথা আমরা আগে অন্য লোকের মুখে শুনিয়াছি। এবং যখনই শুনিয়াছি তখনই বক্তাকে জেরা করিয়া জানিয়াছি যে, এ-কথা বলিবার কোনও উপযুক্ত ভিত্তি নাই।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি যে, একটি বক্তা আমার উপন্যাসগুলি criminology-র উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাঁর কথাটার ভিত্তি শুধু এইটুকু যে, আমার একখানি উপন্যাসে criminology-র নামটা উল্লেখ আছে, এবং সেই উপন্যাসে একটি নারীর চরিত্র সম্বন্ধে criminology-ঘটিত একটু আলোচনা আছে। বলা বাহুল্য যে, আমার বইখানার নায়িকা সে-নারী নয়—সে কেবল নায়কের চরিত্র-বিকাশের একটা উপায় মাত্র—অন্যথা সম্পূর্ণ অবান্তর, এবং সেই নারীর চিত্তের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া প্রকাশ করিবার কোনও চেষ্টাই আমি সে-গ্রন্থে করি নাই। সুতরাং আমার সে বই criminology-র দোহাই দিয়া উক্ত বিজ্ঞানের নিরূপিত সত্যের ভিত্তির উপর লেখা এ-কথার

কোনও ভিত্তিই নাই। এবং বলা বাহুল্য আমার অপর কোনও লেখাতেই criminology-র গন্ধ মাত্রও নাই। তবু সেই বক্তা সাধারণভাবে আমার লেখার উপর এই রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে আমার বইগুলি প্রধানতঃ criminology-র উপর প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ যে-উক্তি করিয়াছেন তাহা ব্যাপকতা হিসাবে ইহা অপেক্ষাও বিস্তৃত। ইহার যদি নামরূপ সম্বন্ধে পরিচয় তিনি দিতেন, তবে বোধ হয় ইহা প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হইত না যে, এ-কথারও ভিত্তি অতি ক্ষীণ ও অনিশ্চিত।

বাস্তবিক বর্ত্তমান বাঙ্গ্লা সাহিত্যে যে-সব অসাধারণ চরিত্রের অসাধারণ কার্য্য-কলাপ লইয়া কথা লেখা হইয়াছে, তাদের কোনও এক-আধটা সম্বন্ধে হয়তো এ কথা বলা চলিলেও, সাধারণভাবে তাদের সম্বন্ধে এ-কথা বলা চলে না যে, সেগুলি কোনও বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি সত্যের উপাদান লইয়া লেখা। যে-সব লেখা সাহিত্যপদবাচ্য, তার সম্বন্ধে সাধারণ-ভাবে এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, সেগুলি বিজ্ঞানের বই হইতে উপাদান কুড়াইয়া লেখা নয়, জীবনের প্রত্যক্ষ দর্শন ও আলোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ-কথা যিনি অস্বীকার করিতে চান, নির্দ্দিষ্ট বিষয় হইতে দৃষ্টান্ত দিয়া যদি তিনি তাঁর কথা প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন, তবে তার সম্যক উত্তর দিতে আমি প্রস্তুত।

তা' ছাড়া হট্টগোলের তলায় এ-দেশে হাটের যে একেবারে কোনও চিহ্নই নাই—এ-কথা কবি যেরূপ নিশ্চয়তার সহিত বলিয়াছেন, আমি সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি, তাঁর সে নিশ্চয়তার কোনও হেতু নাই। হইতে পারে হাটের খবর তাঁর দীর্ঘ প্রবাস ও নির্জ্জন-নিবাসের আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার

কাছে পৌঁছায় নাই, এবং হাটে এমন গণ্ডগোল এখনও জন্মায় নাই যা'তে তাঁর বিদেশের হাটে অভ্যস্ত কর্ণে কোনও সাড়া দিতে পারে, কিন্তু হাট জমিবার একটু চেষ্টা না হইতেছে এমন নয়।

তা' ছাড়া হাট জমিবার আগে হট্টগোল সাহিত্যের ইতিহাসে অনেকবার শোনা গিয়াছে। রুশো ও ভল্‌টেয়ার লিখিয়াছিলেন বলিয়াই ফরাসী-বিপ্লবের হাট জমিয়াছিল। এবং আজ বিশ্ব ব্যাপী ভাব-বিনিময়ের দিনে বিলাতে যেটা ঘটিয়াছে, সে সম্বন্ধে আমরা নিরপেক্ষ থাকিতে পারি কি? যে-হাট আজ পশ্চিমে বসিয়াছে তাতে আমার সওদা করিবার অধিকার কোনও প্রতীচ্যবাসীর চেয়ে কম নয়।

॥ সাহিত্য-সংগ্রাম ॥

ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৫

ময়মনসিংহের লোক হইয়া মেদিনীপুরের সাহিত্য-পরিষদে আমার মোড়লী করিবার দাবী সম্বন্ধে একটা কথা উঠিয়া আপনাদের বিব্রত করিতে পারে। কিন্তু দাবী আমার আছে এবং তার নজীর স্বয়ং Shakespeare. ময়মনসিংহ খুব বড় জেলা, মেদিনীপুরও বড় জেলা। তা ছাড়া ময়মনসিংহ ও মেদিনীপুর উভয়েরই নামের প্রথম অক্ষর 'ম'। There is an M in Monmouth and an M in Macedon। ইহার পর কারও সন্দেহ থাকিতে পারে কি, যে, আমি আপনাদের কুটুম্ব? তা ছাড়া আমাদের দেশে এক রৌদ্রে ধান শুকাইলে কুটুম্বিতা হয়; কোনও অজ্ঞাত, অশ্রুত এবং হয়ত অস্তিত্ববিহীন পূর্ব্বপুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক কল্পনা করিলে এত আত্মীয়তা হয় যে, তাতে বিবাহে বাধে। আর এ স্থলে কুটুম্বিতা হইবে না!

কিন্তু তবু আমি বলি, আপনারা কাজটা ভাল করেন নাই। মেদিনীপুর বোধ হয় অত্যন্ত শান্ত-শিষ্ট জায়গা। এখানকার সাহিত্য পরিষদ্ এতদিন পর্য্যন্ত দিব্যি প্রশান্তভাবে জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছে। আপনাদের আমাকে টানিয়া আনিয়া সেই প্রশান্ত জীবনের মধ্যে বিপ্লব বহিয়া আনা ভাল হয় নাই।

আমার একটা বিশেষত্ব সাহিত্য-জীবনেও আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। Falstaff বলিয়াছিলেন, তিনি cause of wit in others। আমিও ঠিক তেমনি অপর লোকের ভিতর অযথা বিপ্লব উদ্রেকের হেতু। এটা বোধ হয় আমার গ্রহের

ফল। আমি যত নির্ব্বিরোধী হই না কেন, আমাকে দেখিলে আশেপাশে বিরোধ ভীষণ গর্জ্জন করিয়া উঠে। তাই আপনারা আমাকে আনিয়া ভাল করেন নাই।

যাহা হউক আপনারা আমাকে এ অপ্রত্যাশিত সম্মান প্রদান করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। আপনাদের ইহাতে যে ক্ষতি হউক, আমার পক্ষে এটা একটা প্রকাণ্ড লাভ। সুদূরবর্ত্তী অনাত্মীয় অপরিচিতের নিকট এমন সমাদর লাভ করিয়া আমি যে আনন্দ লাভ করিয়াছি, বিনয়ের আড়ম্বর করিয়া আমি তার মর্য্যাদা-হানি করিব না।

বাঙ্গলার সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে আমার বিদায়ের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। যে কয়দিন এই রঙ্গালয়ে নাচিয়া গেলাম, তার স্মৃতিটুকুও ভবিষ্যতে থাকিবে কিনা জানি না। তাতে দুঃখ নাই। পুরস্কারের আশা মনে ছিল না, একথা বলিতে পারিনা; কিন্তু এ কথা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি যে, পুরস্কারের প্রলোভনে সাহিত্যের কারবার করিতে নামি নাই। বাঁশীর ডাক যখন কানে পৌঁছিয়াছিল, কুলের কথা ভাবিতে পারি নাই; পুরস্কার তিরস্কারের কথা মনে পড়ে নাই;—বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। সাধ্যমত সেবা দিয়া যত্ন দিয়া অন্তরের দেবতার পূজা করিয়াছি, প্রসাদ বিতরণ করিয়াছি আমার দেশবাসীর পাতে। দেবতার তৃপ্তি হইয়াছে কিনা দেবতাই জানেন। দেশবাসীর তৃপ্তি হইয়াছে কিনা তাহা জানিবার সৌভাগ্যও আমার বিশেষ হয় নাই। বরং অনেকের যে আক্রোশ জন্মিয়াছে তার ভূরি পরিচয় পাইয়াছি। যদি তাঁদের তৃপ্তি হইয়া থাকে, আমার চেষ্টায় তাঁরা যদি কিছু আনন্দ পাইয়া থাকেন, তবে আমার সেবা সার্থক হইয়াছে। যদি তাঁদের তৃপ্তি না হইয়া থাকে—আমার দুর্ভাগ্য।

আমার এই সংক্ষিপ্ত সাহিত্য-জীবনে যে জিনিষটা আমাকে পীড়া দিয়াছে, সেটা এই যে রসের বাজারে আজকাল কাঁকরের আমদানী বেশী। যাহা নিছক আনন্দ-দানের ব্যাপার, সেখানে বিরোধী মল্লদের তাল ঠোকাঠুকীতে আকাশ ভীষণতায় ভরিয়া গিয়াছে।

একবার একটা গানের মজলিস বসিয়াছিল। দেশের যত গণ্যমান্য গায়ক সবাইকে সে মজলিসে ডাকা হইয়াছিল। দেশের যত গান-পাগল লোক ছুটিয়া গিয়াছিল গান শুনিয়া আনন্দ পাইবে বলিয়া। লোকে লোকারণ্য, কিন্তু শান্ত স্তব্ধ—পাছে আনন্দের এত প্রচুর আয়োজনে বিন্দুমাত্র রসকণার অপচয় হইয়া যায় কোলাহলে। একজন বিখ্যাত কালোয়াৎ তানপুরা লইয়া বসিলেন। আর একজন তাঁর হাত হইতে তানপুরা কাড়িয়া লইয়া ঠাস করিয়া তাঁর গালে মারিলেন একটা চড়। কেন না তাঁর মতে তিনি বড় গায়ক—প্রথম গাইবার অধিকার তাঁর। আহত গায়ক তাল ঠুকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ;—তারপর গায়কে গায়কে বাদকে বাদকে মারামারি ঠোকাঠোকি, শ্রোতার দলে চেঁচামেচী ঘুসোঘুসি! একটা বিষম হট্টগোল লাগিয়া গেল।

মজ্‌লিস ভাঙ্গিলে বাড়ী ফিরিবার পথে প্রত্যেক দল এই কথা লইয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন যে, অপর সমস্ত দলকে খুব এক চোট দেওয়া হইয়াছে। যারা সুধু গান শুনিবার জন্য আসিয়াছিল, তারা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ফিরিয়া গেল।

বাঙ্গলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজকাল ঠিক এমনি একটা কাণ্ড চলিতেছে। যাঁরা রসিক, রসসৃষ্টি যাঁদের কাজ, তাঁরা সকলে মিলিয়া আজ একটা মহা হট্টগোল লাগাইয়া দিয়াছেন পরস্পরকে আঘাত করিতে! আজকার সাময়িক সাহিত্য পড়িলে মনে

আপনি প্রশ্ন উঠে, এ কি বাণীর কমল-বন, না কুরুক্ষেত্র? সাহিত্যের নাম লইয়া যাঁরা আজ এই বীভৎস তাল-ঠোকাঠুকি করিতেছেন, তাঁহারা হয়ত ভুলিয়া গিয়াছেন যে, সাহিত্যের অস্তিত্বের একমাত্র অধিকার এই যে সাহিত্য আনন্দ দেয়। তাঁরা যাহা করিতেছেন তাতে আনন্দ দেয় না,—রসজ্ঞের মনে সুধু পীড়া উৎপাদন করে। গ্রীসের পুরাণে বাগ্দেবী ছিলেন বর্ম্ম-চর্ম্ম অস্ত্র শস্ত্রে মণ্ডিত—কিন্তু আমাদের ভারতীয় শোভা তাঁর বীণা—তাঁর মূর্ত্তি শান্তির আধার।

এই যে সংগ্রাম আজ চলিয়াছে, ইহার ন্যায়ান্যায় বিচার করিব না। সত্য বা যুক্তি কার দিকে কতখানি আছে, সেটা এখন বিচারের বিষয় নয়। এখন সকল রসজ্ঞের একমাত্র চিন্তার বিষয় এই যে, কলারূপিনী বাগ্দেবীর পুণ্য মন্দির অসুন্দর কোলাহলে কলঙ্কিত হইতেছে; সে কলঙ্ক নিবারণ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

রসের বিচারে তর্কের অবসর আছে, সে কথা অস্বীকার করিতে চাই না; সকলের কাছে সব রস সমান ভাল লাগিতেই হইবে, এমন কথা কেহ বলিবে না। কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ তার বিচার হওয়াটাও অবশ্য দরকার; নতুবা রসের বাজার মেকী ও ভেজালে ভরিয়া যাইবে। কিন্তু সে বিচারের একটা সম্ভ্রান্ত পদ্ধতি আছে। দুঃখ এই যে, সে পথের পথিক বড় বেশী নাই। দুরূহ সে পথ,—অনেক অনুশীলন ও সাধনা সাপেক্ষ। সহজ অবন্ধুর নোংরা পথের যাত্রী জুটিয়াছে অনেক। আরও দুঃখ এই যে, যাঁদের হাতে এই সব আবর্জ্জনা দূর করিবার শক্তি ও অধিকার আছে, তাঁরাই ইহাদিগকে আপনাদের পক্ষপুটে আশ্রয় দিতেছেন।

এই সাহিত্যিক মল্লযুদ্ধের দ্বন্দ্বের বিষয় লইয়া বিচার-বিতর্কের

হয় তো যথেষ্ট হেতু আছে। উভয়পক্ষে অনেক যুক্তি হয় তো আছে, যার আপেক্ষিক গুরুত্ব সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা নির্ণয় করিতে হইবে। কিন্তু হট্টগোলটাই বিচারের পক্ষে সব চেয়ে প্রশস্ত নয়। যখন গোল বাধিয়া যায়, সেখানে বিচারের নিক্তি লইয়া সূক্ষ্ম তৌল-কার্য্য করিবার চেষ্টা না করিয়া সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন গোল থামান। এখন সেই দরকারটা সবার আগে। গোল থামিলেই বিচার চলিতে পারে। আস্তিন যতক্ষণ গুটান থাকে, ততক্ষণ বিচার চলে না। সাহিত্য আইনের ধারাগুলি তখন নির্ব্বীর্য্য—Silent legis inter arma.

বর্ত্তমান সাহিত্যিক ঝগড়ার বিষয় সম্বন্ধে বিচার আমি করিব না,—কোন্ পক্ষে সত্য কতটুকু তাহা নির্দ্ধারণ করিবার কোনও চেষ্টা করিব না। কিন্তু এ আলোচনায় যে পরিমাণ উত্তাপ ও অসহিষ্ণুতা দেখা যাইতেছে, তার যে কোনও প্রকৃত হেতু বা প্রয়োজন নাই, সে কথাটা একটু বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

ঝগড়াটা লাগিয়াছে বিশেষভাবে তরুণ দলকে লইয়া। এই তরুণ সাহিত্যিকরা সাহিত্যের মধ্যে না কি এমন একটা বিশ্রী ঢং আনিয়া ফেলিয়াছেন, যাহা সুধু সমাজের পক্ষে অহিতকর নয়, সাহিত্য-ধর্ম্মেরও বিরুদ্ধ ইহাই তাঁদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ। তা ছাড়া তাঁদের ভাষা, তাঁদের ভাব, তাঁদের দারিদ্র্য, তাঁদের তরুণত্ব—এ সবগুলিই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁদের অপরাধের হেতু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যাঁরা তরুণ যুবক তাঁরা যে তাঁদের তারুণ্য শিরায় শিরায় অনুভব করেন, আর কথায় বা কাজে প্রকাশ না করিয়া পারেন না, এটাও একটা অপরাধ।

সাহিত্য ও সমাজে এই দুরন্ত বিপ্লব যারা উপস্থিত করিয়াছে, এতবড় একটা প্রকাণ্ড শক্তি লইয়া যারা আসিয়াছে যে

বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রথী নারায়ণী সেনা লইয়া বধের আয়োজন করিয়াছেন—তারা কারা সেই কথা নির্ণয় করিবার ব্যর্থ চেষ্টা আমি দুই একবার করিয়াছি।

ঠিকানা যথেষ্ট পাই নাই; কিন্তু একটা কথা জানিয়াছি—আমি সে তরুণের দলে নই। বয়সের হিসাব করিলে কথাটা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু তরুণ বলিয়া যাঁদের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছে, তার মধ্যে প্রায় আমার বয়সের লোকও আছেন। তাই এ বিষয়ে স্বুধু বয়সের উপর নির্ভর করা নিরাপদ হইত না। কিন্তু এখন এ সম্বন্ধে আর সন্দেহ নাই যে, আমি তরুণ নই।

প্রথম কথা এই যে, এই তরুণ দলে যে শক্তিমান লেখক কতকগুলি আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদি না থাকিত, তবে তাদের আস্ফালনে বিচলিত হইয়া মহারথী হইতে পদাতিক পর্য্যন্ত ব্যূহবদ্ধ হইতেন না।

এ কথা যদি সত্য হয়, তবে তাদের দোষ সম্বন্ধে এত অধিক অসহিষ্ণুতা ভাল লক্ষণ নয়।

কেন না, তরুণের স্বভাবই ভুল করা। ভুল করিতে করিতে লোকে ঠিক কথাটা শেখে। কিন্তু ভুল করিলে যে শিশুকে ক্রমাগত বেত্রাঘাত করা হয়, সে কোনও দিনই মানুষ হয় না—তার ভুলও প্রায় সংশোধিত হয় না।

যদি তরুণেরা ভুল করিয়া থাকে, যদি তাদের অন্যায় কিছু হইয়া থাকে, তবে প্রবীণ যাঁরা তাঁদের কর্ত্তব্য সর্ব্বাগ্রে তরুণের গুণান্বেষণ করিয়া তার জন্য তাকে সমাদর করা, আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের ত্রুটি দেখান। কিন্তু নিঃসংশয় শক্তি ধারণ করিয়া বহু তরুণ লেখক আজ প্রবীণ বা প্রবীণের ছায়াপুষ্ট নবীনদের কাছে এই সমাদরের কণামাত্রও প্রাপ্ত হয় না, এটা বড় পরিতাপের বিষয়।

আমার দ্বিতীয় কথা এই যে, তরুণের প্রতি বিদ্বেষ কোনও জাতির পক্ষে স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। প্রবীণ কবি যত বড়ই হউন, যত আকাশচুম্বী তাঁর মহিমা হউক, তবু তিনি প্রবীণ,—বিধাতার বিধানে তাঁর জীবনের অবশিষ্ট পরিমাণে সংক্ষিপ্ত। প্রবীণ যখন চলিয়া যাইবেন, তরুণ তখন থাকিবে, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ তাদের হাতে। সন্তানের অপরাধটাকে বড় করিয়া দেখিয়া যে পিতা প্রত্যেক শক্তিমান বংশধরকে বধ করে, তার বংশ রক্ষা বা প্রতিষ্ঠার আশা করা মিথ্যা। সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে সন্তানের প্রতি এরূপ বিদ্বেষ বিরল। তাই তাদের বংশ থাকে ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আমাদের সাহিত্য-সমাজের যাঁরা ধুরন্ধর, তাঁরা যদি তরুণের প্রতি অতিরিক্ত বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হন, তবে সেটা সাহিত্যের ভবিষ্যতের পক্ষে অনুকূল বলিয়া মনে হয় না।

তা ছাড়া, আমার মনে হয় যে, যে-সব প্রবীণ সাহিত্যিক তরুণদের প্রতি অতিমাত্র ক্রোধ দেখান, তাঁদের মনে একটা স্বাভাবিক ভ্রান্তি আছে যে, তাঁরা আজ যেমনটি, চিরদিনই তেমনটি ছিলেন। আজ আমার জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি বিবেচনা ও শক্তি যতটা, ততটা যে কাল ছিল না তাহা নিশ্চিত; আমার তরুণ বয়সে তাহা আরও কম ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ এই সহজ সত্যটা স্মরণ রাখা আমাদের প্রায়ই কঠিন হয়। তাহা যদি না হইত, নিজেদের তরুণ বয়সের ঠিক ধারণা ও স্মৃতি যদি তাঁহাদের মনে থাকিত, তবে তাঁরা তরুণদের প্রতি এত কঠোর হইতে পারিতেন না, এ কথাটা আমার বিশেষভাবে মনে পড়িয়াছিল একজন প্রবীণ প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিকের লেখা পড়িয়া। তিনি নবীন লেখকদের অনভিজ্ঞতা ও কাঁচা হাতের উপর কত না

বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছেন। আমার মনে হয়, যদি তাঁর তরুণ বয়সের কোনও লেখা তাঁর সামনে থাকিত, তবে তিনি এত অপর্য্যাপ্ত বিদ্রূপ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন।

আর একটা কথা ঠিক বোধ হয় ইঁহারা মনে রাখিতে পারেন না যে, রসের বাজারে বৈচিত্র্য হয় নানাপ্রকারে। আমি যদি একজন প্রকাণ্ড প্রতিভাবান লেখক হই, আমার লেখার যদি তুলনা না থাকে, তাই বলিয়া আমার চেয়ে কম শক্তিমান যে কেউ সাহিত্য রচিতে পারিবে না, এমন কথা নাই। আর তার রচনায় আমার মত রসের প্রাচুর্য্য কি ঘনতা না থাকুক, তাতেও আনন্দের উপাদান থাকিতে পারে। কিন্তু এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁরা নিজের মানদণ্ডের পরিমাণে যাহা খাটো, তাকে ভাল বলিয়া বুঝিতেই পারেন না। সেটা যে ভাল, সে কথা তাঁদের নজরে পড়ে না; সেটা যে খাটো সেই কথাটাই তাঁদের পীড়া দেয়। উৎকর্ষ যাতে আছে, তাতে যেমন অন্য প্রকারে বৈচিত্র্য দেখা যায়, উৎকর্ষের তারতম্যে তেমনি বৈচিত্র্য থাকে। কিন্তু অনেকটা সমালোচনার এই মূল সূত্র যে যেটা ষোল আনা নয়, সেটা যে চৌদ্দ আনা সেটা দেখিব না। দেখিব যে সেটা দুই আনা কম। কথাটায় কিছু থাকিতে পারিত যদি চৌদ্দ আনা আপনাকে ষোল আনা বলিয়া চালাইতে চাহিত। কিন্তু তাকে চৌদ্দ আনার মর্য্যাদাও এঁরা দিতে চান না।

তরুণদের উপর চারিদিক দিয়া যে বিদ্রূপ ও তিরস্কারের বজ্র-বাণ ঝরিয়া পড়িতেছে, তাদের প্রধান কথাটা এই যে, তারা মানুষের ভিতর যৌন লালসাটাকে লইয়া অতিরিক্ত ঘাঁটাঘাঁটি করিতেছে! এ কথা সত্য কি মিথ্যা, সত্য হইলে কতটা সত্য, ইহা ভাল কি মন্দ, কি ভালমন্দ দুয়ের বার, সে কথার বিচার

আমি করিব না; কেন না, ঝগড়া করিতে আমি বসি নাই, ঝগড়া মিটাইবার একটা ক্ষীণ এবং হয়তো ব্যর্থ চেষ্টা আমি করিব।

ধরিয়া লইলাম কথাটা যথার্থ এবং কথাটার ভিতর দোষের কথা আছে,—রসের দিক দিয়াও বটে, সমাজের দিক দিয়াও বটে।

একটা কথা অবশ্য কেউ অস্বীকার করিবেন না—লালসা লইয়াও রসসৃষ্টি অসম্ভব নয়। এই যৌন বৃত্তি—পাশব বৃত্তিই বলুন তাকে—ইহা লইয়া যুগ-যুগান্তর ধরিয়া অপূর্ব্ব রসরচনা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং লালসাকে অবলম্বন করিয়া রসরচনা করিয়াছে বলিয়াই তরুণদের দোষ হইয়াছে এমন কেহ বলিবেন না।

অতএব নবীনদের যদি এ বিষয়ে কোনও দোষ থাকে, সে এই যে, তাঁরা লালসার আলোচনায় মাত্রা রক্ষা করিতে পারেন নাই,—জীবন ও সমাজের ভিতর এই প্রবৃত্তির যে স্থান, তাহা রক্ষা না করিয়া ইহার মর্য্যাদা অতিরিক্ত বাড়াইয়া দিয়াছেন।

ধরিয়া লইলাম ইহা সত্য। কিন্তু এ কথাও সমান সত্য যে, যৌন আকর্ষণটাকে জীবনের মধ্যে অতিরিক্ত বড় করিয়া যদি কেউ দেখে সে যুবক। যুবকের পক্ষে এটা স্বাভাবিক ত্রুটি—এবং তাহা মার্জ্জনীয় হ'ক বা না হ'ক, তাহাতে অতিমাত্র বিস্মিত হইবার কিছু হেতু নাই।

সুতরাং এ বিষয়ে তাঁদের যদি কিছু ত্রুটি হইয়া থাকে, তবে সেটা তাঁদের যৌবনের স্বাভাবিক অতিচার বলিয়া ধরিয়া লওয়াই উচিত। আর সেভাবে ইহার দিকে চাহিলে এগুলির প্রতি বিদ্বেষের তীব্রতা ঘুচিয়া গিয়া একটা উদার সহন-শীলতা আসিয়া পড়িবে। ইহাতে আমরা হয় তো হাসিব বা ব্যথা পাইব—কিন্তু

ক্রুদ্ধ হইব না। ত্রুটি যেখানে আছে সেটা চাপা দিবার প্রয়োজন নাই—চোখে আঙ্গুল দিয়া তাহা দেখাইবারও হয় তো প্রয়োজন আছে। কিন্তু তার জন্য সর্ব্বব্যাপী সমর-সজ্জার কোনও অজুহাত নাই। অথচ আজকালকার মাসিক কাগজের পাতায় পাতায় যে সাহিত্য সমালোচনা দেখিতে পাই, তার মধ্যে দেখিতে পাই, সুধু দুরন্ত ক্রোধ, তীব্র অসহিষ্ণুতা এবং শিষ্টতা-বহির্ভূত বিদ্রূপ। যাঁরা বয়সে প্রবীণ বা অতিপ্রবীণ, প্রতিষ্ঠায় গরিষ্ঠ, দেখিতে পাই যে, তাঁরাও এ বিষয়ে লিখিতে গিয়া সংযমের সীমা রক্ষা করিতে পারেন না।

তরুণদের আর একটা অপরাধের কথা শুনিতে পাই যে, তাঁরা আপনাদিগকে তরুণ বলিয়া ঘোষণা করিতে ব্যস্ত—তাঁরা যে তরুণ এইটাই যেন তাঁদের প্রাধান্য লাভের চরম ফারমান—এই কথাটা তাঁরা জানাইতে চান। আর তাঁরা বলেন যে, তরুণ বলিয়াই তাঁরা প্রাচীনের নির্দ্দিষ্ট সকল বিধি-নিষেধের অতীত—বুড়োদের মাপ কাটিতে তাদের বিচার করা চলিবে না। এমন কথা কোনও তরুণ লেখক ঠিক বলিয়াছেন কি না আমি জানি না; কিন্তু ধরিয়া লইলাম, এই কথাই তাঁরা দিন রাত বলিতেছেন। কিন্তু এটাও যে সহজ যৌবন ধর্ম্ম।

বয়সে যতই ভাটি পড়িতে থাকে জগতের কাছে নানাদিকে খোঁচা খাইয়া আমরা নিজেদের খাঁটি ওজনটা বুঝিতে থাকি। কিন্তু উদ্দাম যৌবনের স্বভাব এই যে, তারা সীমার পরিমান করে না। সীমা যে কোথাও আছে, সেটা না জানাই তাদের স্বভাবগত ধর্ম্ম। তাই তাদের কল্পনা হয় সীমাহারা, আকাঙ্খা আকাশ-চুম্বী, আর নিজের শক্তি ও মর্য্যাদার উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অতল ও অটল। তাই স্পর্দ্ধিত যৌবন, বয়সের কাছে মাথা নত করিয়াই

থাকুক বা মাথা খাড়া করিয়াই দাঁড়াক, তার মনের ও মুখের কথা এই যে, বুড়োরা এ জগৎটাকে ঠিক চালাইতে পারিতেছে না, চালাইতে পারে তাহারা। এই যে স্বভাব সিদ্ধ স্পর্দ্ধা, এটা যদি আমাদের তরুণদের লেখার ভিতর ফুটিয়া উঠিয়াই থাকে, তাতে কি আমাদের পক্ক কেশ কণ্টকিত হইয়া উঠিবে? যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও সীমাতিক্রমী স্পর্দ্ধা যৌবনের স্বভাব-ধর্ম, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধের পক্ষে সেটা লজ্জার কথা। যাঁরা তরুণ বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিতে পারেন না, তাঁদের অন্তর যতই নবীন থাকুক, তাঁদের ক্রোধ যদি তাঁদের মর্য্যাদা ও সম্ভ্রমকে লঙ্ঘন করে, তবে সেটা লজ্জারও কথা, দুঃখেরও কথা।

তরুণদের যে সব অপরাধের তালিকা সাহিত্য সমালোচনায় দেখা যায়, তার সবগুলি কি আমরা সংসারের ক্ষেত্রে আমাদের ঘরে ঘরে দেখিতে পাই না! আমাদের নিজেদের যৌবনে আমরা যাহা দেখিয়াছি ও অনুভব করিয়াছি, আমাদের ছেলেদের ভিতর রোজ যেটা আমরা অনুভব করি, সেই সহজ যৌবন-ধর্ম্ম যদি তরুণের ভিতর সাহিত্য-ক্ষেত্রে ফুটিয়া উঠিয়া থাকে, তবে আমরা বুড়োরা কি লাঠি লইয়া তাদের তাড়া করিয়া নিজেদের সম্ভ্রম-হানি করিব?

যে জ্ঞানী, প্রবীণ, সে ইহাতে আত্মহারা হইবে না। উপদেশ ও আচরণ দিয়া সে তাহাদিগকে শিক্ষা দিবে, ভুল করিলে চোখে আঙ্গুল দিয়া তাহা দেখাইয়া দিবে। আর সঙ্গে সঙ্গে অশেষ স্নেহ সহকারে সে তরুণের গুণরাশি বাছিয়া লইয়া তার সমাদর করিবে।

কিন্তু এ ভাব বাঙ্গালীর সাহিত্য-সমালোচনায় কোথায়? প্রবীণ সাহিত্যিক যাঁরা, তাঁদের চোখে কোথাও তরুণের লেখার

দোষ পড়িলে তাঁরা অস্থির হইয়া যান—গুণ খুঁজিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁদের হয় না। না হউক, তবু যেটুকু চোখে পড়িয়াছে তারি জোরে তাঁরা সাধারণ ভাবে তিরস্কার করেন। এমন অনেক লেখক এই তরুণদের ভিতর আছেন, যাঁরা অনেকগুলি বই লিখিয়াছেন—কেউ কোনও দিন তার সমালোচনা করেন নাই। তার গুণ থাকিলে মুখ ফুটিয়া তাহা বলেন নাই, দোষ খুঁটিয়া দেখান নাই। কিন্তু হঠাৎ হয়তো তার কোনও লেখা কারও চোখে পড়িয়া গিয়াছে, যার ভিতর হয়তো একটা বিশেষ দোষ আছে; অমনি তাহার জাতিগুষ্টি সহ সকলের উপর তিরস্কার ও বিদ্রূপ বর্ষণ হইতে লাগিল; কিন্তু তখনও দোষটা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখান হইল না।

প্রবীণ যেখানে ক্রোধে আত্মহারা, নবীন যে সেখানে মাত্রা রক্ষা করিয়া কথা কহে না তাহা বলাই বাহুল্য। কথায় কথা বাড়িয়া যায়। গালির উত্তরে গালি আসে; বিদ্রূপের জবাবে বিদ্রূপ। এমনি করিয়া পুঁথি বাড়িয়া চলিয়াছে। রসসৃষ্টি পড়িয়া থাকুক, রসালোচনা, রস গ্রহণ পড়িয়া থাকুক—উপস্থিত কাজ এই লড়াইয়ে জেতা—ইহারই জন্য যেন সবাই প্রাণপণ করিয়া লাগিয়াছেন।

কাজেই সাহিত্যের ফুল-বাগানে মল্লভূমি বসিয়া গেছে। বাছা বাছা ফুলগুলি সব পায়ের তলায় গুঁড়াইয়া যাইতেছে। উদগ্রাহ-মল্ল সাহিত্যবীরগণ নির্ব্বিকারে রূপের ঝরণা যে সব ফুল তাই ছিঁড়িয়া কাটিয়া গুঁড়াইয়া তার পেটের ভিতরের কুরূপ উৎকীর্ণ করিয়া দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পরিয়াছেন।

শঙ্কিত বীণাপাণি বুঝি ধীরে ধীরে তাঁর সাধের বন হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া অশ্রুমোচন করিতেছেন।

আজ সবার একথা বলিবার দরকার হইয়াছে,—এ কেলেঙ্কারী শেষ কর। থামাও তোমাদের ঝগড়া! পাঠকের আজ বিচারকের আসন গ্রহণ করিয়া বলিবার দরকার হইয়াছে যে, আমরা রসের বাজারে খুন্তি বা কোদাল কিনিতে আসি নাই, মাটি খুঁড়িয়া কেঁচো বাহির করার কেরামতি দেখিতে চাইনা। সেই মাটির বুকভরা সৌন্দর্য্য যেখানে ফুল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, আমরা শুধু তাই চাই। আর কোনও বেসাতী এ হাটে বিকাইবে না।

বিদ্রূপে কি রস নাই? কে বলে নাই? কিন্তু ব্যঙ্গ এক, আর ব্যঙ্গ-রস আর এক বস্তু।

কাম হইতেও রস জন্মে। কিন্তু মুস্কিল এই যে, তাতে অতি সহজে ভেজাল দেওয়া চলে। কাম আমাদিগকে একটা বিচিত্র তৃপ্তি দেয়। প্রকৃত আদি রসের সঙ্গে সেই প্রাকৃত তৃপ্তির আনন্দটা অনেক সময় লোকে তফাৎ করিয়া দেখিতে পারে না। কাদা হইতে পদ্ম ফোটে; তাতে আনন্দ দেয়। কাদা শুধু ঘাঁটা ঘাঁটি করিয়াও এক রকম আনন্দ হয়। দুইটার ভিতর প্রভেদ অনেক। কামের পাঁক হইতে তেমনি কাব্যরস জন্মিতে পারে; কিন্তু শুধু কামের আলোচনায়ও আবার এক রকম রস সৃষ্টি হয়। বিচক্ষণ শিল্পী সে প্রভেদ ধরিতে পারে।

তেমনি ব্যঙ্গ হইতে রস হয়। কিন্তু ব্যঙ্গ করিয়াই একটা অপরিচ্ছন্ন আনন্দ আছে। প্রকৃত ব্যঙ্গরস সৃষ্টি করিতে পারে কলাকুশলী। তার স্বরূপ উপভোগ করিতে পারে সেই, যার ভিতর হাস্যরস চাখিবার শক্তি আছে। কিন্তু ব্যঙ্গ করিয়াও যে নোংরা আনন্দ, তাহাকে প্রকৃত ব্যঙ্গরস বলিয়া অনেক অপটু কারিগর ভুল করে; অবিচারী জনসাধারণও তাকে উপভোগ করিয়া মনে করে ব্যঙ্গরস উপভোগ করিতেছি।

যেখানে প্রকৃত রস আছে, সে রচনা আমার শিরোধার্য্য—তা হউক সে ব্যঙ্গ বা আদিরসঘটিত। কিন্তু রসের যেখানে অসম্ভাব, সে কাম-কথা বা ব্যঙ্গ সমান ঘৃণার বস্তু!

আমি যে ব্যঙ্গ-রচনার কথা বলিতেছি তাহা শেষের শ্রেণীর। ইহার আতিশয্যে সাময়িক সাহিত্য কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে। রস-রচনার বিধিদত্ত অধিকার লইয়া যাঁরা জন্মিয়াছেন, তাঁরা শক্তির সাধনা ছাড়িয়া যে এইরূপে দুই হাতে শুধু আপনাদের শক্তির অপচয় করিতেছেন, এইটাই দুঃখের বিষয়।

আমি যুদ্ধ করিতে বসি নাই—আমি সুধু শান্তির প্রয়াসী। আমি জানি যে, যে সব কথা আমি বলিয়াছি, ইহার অনেক কথায় লোকের মনে নানা প্রশ্ন জাগিয়া উঠিবে, বিদ্রোহ গজাইয়া উঠিবে, অনেকে তর্ক করিবার জন্য কোমর বাঁধিবেন। একথা অনেকে বলিবেন যে, আমি তরুণদের প্রতি যে অসহিষ্ণুতা ও অবিচারের প্রতিবাদ করিতেছে, সেই অসহিষ্ণুতা ও অবিচার আমি করিতেছি তাদের ব্যঙ্গকারীদের। এ সব মিটাইবার কথা নয়—ঝগড়ার কথা। অনেকে বলিবেন যে, যাদের আমি লক্ষিত করিয়াছি, তাদের নাম গোত্র দিয়া তাদের রচনার আলোচনা করিয়া আমাকে দেখাইতে হইবে।

এ কথা উঠিতে পারে। যাঁরা ব্যঙ্গ করিয়াছেন বা তিরস্কার করিয়াছেন, তাঁদের নিন্দা করা বা দোষ দেখান যদি আমার উদ্দেশ্য হইত, তবে আমি এ আমন্ত্রণ অস্বীকার করিতাম না। বিশিষ্ট আলোচনার দ্বারা আমার সাধারণ প্রতিপাদ্য প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু ইহাদের নিন্দা করাটা আমার লক্ষ্য নয়। আমার লক্ষ্য ইহাদিগের যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করা। তাহা করিতে গিয়া যদি আমি এমন কিছু বলিয়া থাকি, যাতে তাঁদের

অনির্দ্দিষ্ট সাধারণ লক্ষণ দ্বারা কোনও তিরস্কার করা হইয়াছে, তবে আমি করজোড়ে তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

মানুষের সব কারবারে, সামাজিক ও নৈতিক জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে একটা চরম সত্য আছে। সেটা এই যে, মানুষ গতিশীল। এই গতির ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন। সে পরিবর্ত্তনের বিধি অতিক্রম করিবার শক্তি কোনও সমাজ বা সামাজিক অনুষ্ঠানের নাই—সাহিত্যেরও নাই। সামাজিক আচার, অনুষ্ঠান, মত ও বিশ্বাস, আদর্শ, রুচি, ভাষা প্রভৃতি এমন কিছুই নাই, যাহা শাশ্বত ও চিরন্তন। দেশভেদে এসব ভিন্ন হয়। সুস্থ যে সমাজ সে সমাজ এই সব পরিবর্ত্তনের প্রতি বিমুখ হইয়া একেবারে দুয়ার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য যখন যে পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হয়, সে তাহা অনায়াসে গ্রহণ করে। তাহাতেই সমাজ সুস্থভাবে বৃদ্ধিলাভ করে। যেখানে পরিবর্ত্তনের সম্মুখে সংস্কার একটা অলঙ্ঘ্য প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া আপনার প্রাচীন ধারণা সকল আঁকড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া থাকে, সেখানে সমাজ, হয় জীবনের রসধারা হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, নতুবা নিষিদ্ধ মতামত শক্তি সঞ্চয় করিয়া একদিন একটা প্রকাণ্ড বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া সে অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পুরাতন সমাজকে ওলট পালট করিয়া দেয়।

রসের জগতের এই গতি ও বৈচিত্র্যের নিয়ম ষোল আনা খাটে। রসের প্রকৃতি ও চরিত্র গতিশীল। সে গতিটা আমরা সব সময় বুঝিতে পারি না; কেন না, সহজ সুস্থ সমাজে সবার গতি হয় প্রায় এক সঙ্গে। তাই অনবরত চলিতে থাকিলেও আমরা মনে ভাবি যে, আমরা সবাই ঠিক একই স্থানে বসিয়া

আছি। কিন্তু গতি আছে। আজকার সাহিত্যের সঙ্গে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের সাহিত্য, আর তার সঙ্গে তার পঞ্চাশ বৎসর আগের সাহিত্য তুলনা করিলে আমরা এই গতি লক্ষ্য করিতে পারি। সে গতির কতকটা সহজ-লক্ষ্য, কতকটা অলক্ষ্য। রসের নূতন উপকরণ, নূতন অবয়ব অনবরত সৃষ্টি হইয়া মানবের আনন্দ বিধান করিতেছে। সুতরাং সম্পূর্ণ নূতন একটা কিছু দেখিলেই যদি আমরা বিচলিত হইয়া তার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াই, তবে সেটা আমাদের পক্ষে আত্মহত্যার তুল্য হইবে। আমাদের মন সর্ব্বদা উদার ভাবে নূতন ভাব, নূতন প্রক্রিয়া গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুখ করিয়া রাখিতে হইবে—সুস্থভাবে পরিবর্ত্তন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। তার জন্য যেমন একদিকে প্রয়োজন সকল সংস্কারের অন্তরালে প্রকৃত রসবস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তেমনি প্রয়োজন অশেষ সহনশীলতা—সকল নূতন মত ও নূতন ধারা অবিকৃত চিত্তে বিচার করিবার মত ধৈর্য্য ও প্রশান্ততা।

যদি এই সুস্থ ভাব আমরা দেখাইতে না পারি, তার ফল হইবে এই যে, প্রত্যাহত নূতন পন্থা শক্তি সঞ্চয় করিয়া আমাদের রস-সাহিত্যের গোড়া ধরিয়া টান মারিবে—সব সংস্কার সব আচার মঙ্গলামঙ্গল বিচার না করিয়া চুরমার, ওলট পালট করিয়া দিবে।

ইংলণ্ডের ইতিহাসে দেখিতে পাই, সেখানে কি সামাজিক, কি রাষ্ট্রনৈতিক, কি সাহিত্যিক, বিপ্লব বড় বেশী হয় নাই। কেননা ইংলণ্ড সর্ব্বদা আপনাকে নূতনের গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে—নূতনকে সুস্থভাবে বরণ করিয়া আপনার জীবনের সঙ্গে সমীকৃত করিয়া লইয়াছে। ফ্রান্সে তাহা হয় নাই।

তাই নূতন যখন সেখানে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে, তখন সে সমাজের সব অনুষ্ঠান চুরমার করিয়া দিয়া আপনার অধিকার প্রচার করিয়াছে। বিপ্লবের দোষ এই যে, সমাজের সবগুলি গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায়; সমাজের অঙ্গগুলি টুকরা টুকরা হইয়া পড়ে। তার সেই ভাঙ্গন হইতে জোড়া দিয়া নূতন সুস্থ জীবন গড়িতে অনেক সময় লাগে।

সুতরাং নূতন সাহিত্যের নূতন ধারার মধ্যে যদি দোষের কথা থাকে, তাকে বর্জ্জন করা যেমন প্রয়োজন, তার ভিতর বরণ করিবার যদি কিছু থাকে, তাকে বরণ করিয়া লওয়াও ঠিক তেমনি প্রয়োজন। নূতনের বিচারে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন একটা সর্ব্বংসহ সহিষ্ণুতা, প্রশান্ত রসজ্ঞান ও সুস্থ সমতাযুক্ত জীবন। যেখানে ইহার পরিবর্ত্তে দেখিতে পাই নিদারুণ অসহিষ্ণুতা, প্রচলিত সংস্কারের অন্ধ অনুবর্ত্তিতা, এবং যে কিছু সে গণ্ডীর বাহিরে তাহা নির্ব্বিচারে ধ্বংস করিবার জন্য একটা প্রচণ্ড উগ্রতা—তখন শঙ্কা হয় যে, আমাদের সাহিত্যের জীবন বুঝি সুস্থ নয়, বুঝি ইহা গতিশীলতায় বিমুখ হইয়া ধ্বংস পথের পথিক হইতে বসিয়াছে।

নূতন যা কিছু তাই ভাল হয় না। বরং নূতনের ভিতর মন্দ কিছু থাকাই স্বাভাবিক। কেন না নূতন নূতন, অপরীক্ষিত পরীক্ষার দ্বারাই দোষমোচিত হয়, নূতন সংস্কৃত হইয়া স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। কিন্তু নূতন চাল দুষ্পাচ্য বলিয়া যে নূতন ধান কাটিয়া পাড়িয়া ঘরে তুলিয়া না নেয়, সে গৃহস্থকে বুদ্ধিমান বলিয়া বিবেচনা করা যায় না।

নূতনকে সর্ব্বদা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে আমি বলি না—আমার আপত্তি নূতনের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ, তার প্রতি একটা

নির্ব্বিচার বিরুদ্ধতায়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, সাহিত্যের জগতে তরুণের এক মানদণ্ড ও প্রবীণের আর এক মানদণ্ড নাই। কিন্তু আজকালকার সমালোচনায় দেখি, বিভিন্ন মানদণ্ড রোজই নিযুক্ত হইতেছে। যে লেখা তরুণের কোটায় পা দেয় না, তার প্রতি বিচারে দেখি অশেষ সহৃদয়তা, তার দোষ সম্বন্ধে অসামান্য উদারতা ও অন্ধতা। আর যাহা তরুণ পদবী লাভ করে, তার বিচারে দেখি অসামান্য কঠোরতা, তার সত্য বা কল্পিত, অণুবীক্ষণের দ্বারা দৃষ্ট বা অদৃষ্ট সামান্য ত্রুটিকে বাড়াইয়া তার ধ্বংসের আয়োজন।

কবির মত আমিও চাই যে তরুণকে সহজ ও সাধারণ রসের মানদণ্ড পরিমাপ করিয়া তার গুণাগুণ বিচার করা হউক। আমার দুঃখ এই, জীবনের প্রতি এই সমদৃষ্টি আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যে এত বিরল।

আর কথা বাড়াইব না। অনেকে হয় তো আমার কথায় ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। অনেকে হয় তো ভাবিতেছেন, আমি ঝগড়া থামাইবার নাম করিয়া ঝগড়া করিতেছি—শান্তির নামে বিপ্লব আনিতেছি। কিন্তু ঝগড়া করা আমার লক্ষ্য নয়, বিরোধের ইন্ধন যোগাইতে আমি আসি নাই। আমার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শান্তি।

মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মিলন ও শাখা সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ।

॥ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন ॥

মাজু—হাওড়া, ১৮শ অধিবেশন ১৩৩৫ সাল।

এক গ্রামে এক যাদুকর গিয়াছিল। সে তার বিজ্ঞাপনে বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছিল যে, তার নানা আশ্চর্য্য কাণ্ডের ভিতর, সে তার থলির ভিতর হইতে একটা জীয়ন্ত বাঘ বাহির করিবে! এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার জন্য দলে দলে লোক ছুটিয়া আসিল, রাশি রাশি টিকিট বিক্রী হইল, প্রেক্ষাগৃহ ঠাসাঠাসি হইয়া ভরিয়া গেল।

এখন, যাদুকরেরা সত্য সত্যই কোনও জিনিষ হাওয়া হইতে সৃষ্টি করিয়া বাহির করে না তাহা আপনারা জানেন। যে জিনিষ বাহির করে, সেটা তার কাছেই কোথাও লুকান থাকে। এই যাদুকরেরও পোষা একটা বাঘ ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই দিনই বাঘটা কেমন করিয়া পলাইয়া গেল।

প্রেক্ষাগৃহ লোকে লোকারণ্য, খেলা দেখিবার জন্য দর্শকেরা উগ্র ব্যাকুলতায় ক্রমে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু বাঘ কিছুতেই খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। যাদুকর মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল।

শেষে সে খেলা দেখাইতে আরম্ভ করিল। সবই হইল, কেবল —যখন বাঘ বাহির হইবার কথা, তখন সে থলি হইতে বাহির করিল—এক বিড়াল। দর্শকগণ তো চটিয়া লাল। যাদুকরের যা দুর্দ্দশা তারা করিল তাহা বলিবার নহে।

মাজুর সাহিত্য সম্মিলনের উদ্যোক্তাদের দশাটা অনেকটা সেই যাদুকরের মত, আর আপনাদের অবস্থা সেই দর্শকদের মত। এঁরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে আজকার এই সভায় সভাপতি

হইবেন সাহিত্য-শার্দ্দূল শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে দেখিবেন আশা করিয়া আপনারা আসিয়াছেন, আর এঁরা উপস্থিত করিয়াছেন—আমাকে। সেই প্রসিদ্ধ যাদুকর তার দর্শকদের বলিয়াছিল যে বিড়ালও ব্যাঘ্রবিশেষ, প্রাণীতত্ত্বের এক পর্য্যায়ে তাদের স্থান। এঁরাও হয় তো আপনাদের বলিবেন যে আমিও, শরৎ বাবুর মত, ঔপন্যাসিক। সে কথায় দর্শকেরা ভোলে নাই—আপনারা ইঁহাদিগকে ক্ষমা করিবেন কি না জানি না।

কিন্তু ইঁহাদের যার যে দোষ থাক, আমার কোনও অপরাধ নাই। আমি আজ সকালে যখন বাড়ী ছাড়িয়া আসি তখন পর্য্যন্ত আমি কল্পনা করিতে পারি নাই যে আমাকে আজ শরৎ বাবুর জন্য কল্পিত সিংহাসন অধিকার করিতে হইবে। জানিলে, হয় তো অন্ততঃ গায়ের উপর দুটো ডোরা কাটিয়া একটু জাঁক করিয়া বাঘের মত চেহারা করিয়া আসিতাম, কিম্বা আসিতাম না। কিন্তু আসিয়া পড়িয়াছি—এবং আমার নগ্ন তুচ্ছতাকে আবৃত করিবার কোনও আয়োজনই করি নাই।

সভাপতির যেটা অপরিহার্য্য কার্য্য, সেই অভিভাষণও আমার নাই। আমি আপনাদিগকে যাহা বলিয়া পরিতুষ্ট করিব এমন কোনও অভিভাষণ প্রস্তুত করিবার অবসর আমি পাই নাই। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে একেবারে শূন্য হাতে আসি নাই। সাহিত্য শাখায় পাঠের জন্য একটি প্রবন্ধ আনিয়াছিলাম, তাহাই আপনাদের নিকট পাঠ করিব। সেইটিই সাহিত্য শাখার সভাপতির অভিভাষণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া আপনাদের দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মিটাইতে হইবে।

সাহিত্যিকের কাজ অনেকটা বিয়ের ক'নে সাজাইবার মত।

তাঁর মানস কন্যাটিকে কন্যার সজ্জায় এমন করিয়া সাজাইয়া বাহির করিতে হইবে, যেন সবার মন মুগ্ধ হইয়া যায়।

কিন্তু সবার পছন্দ এক রকমের নয়। তাই হয় নানা রকমফের। একজন চান মেয়েকে সেকেলে ভারি গহনায় ঢাকিয়া ঝল্‌মলে বেনারসী চেলী পরাইতে। আর একজন একেলে,—তাঁর চোখে লাগে হাল্‌কা গয়না—দু'চার খানা পাথর বসান—আর সাদা জমীর উপর খুব ফিকে রংয়ের শাড়ী, যাতে সবটা মিলাইয়া একটা নরম মাধুরী, একটা স্বপ্নের আমেজ আনে। আর একজন হয়ত এসব কিছুই চান না। গয়না বা শাড়ীর বাহারে মেয়ের স্বভাবসুন্দর শোভা অভিভূত না করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে চান সেই শোভাটাকেই,—তার সব পরিচ্ছদকে অভিভূত করিয়া যেন রূপটাই বড় হইয়া উঠে। আটপৌরে শাড়ী পরাইয়া হাতে বড়জোর দু'গাছা সরুচুড়ী পরাইয়া—তাঁরা তাঁদের স্বয়ং-সুন্দরী মানস-কন্যাকে আসরে আনিতে চান। এঁদের কাহাকেও নিন্দা করা যায় না।

বসনভূষণের রুচির মধ্যে যেমন জোর করিয়া একটার চেয়ে আর একটাকে বড় বলা যায় না, ভাষার সজ্জা সম্বন্ধেও তেমনি কোনও একটা প্রণালীর পক্ষেই স্থায়ী বা সনাতন সৌন্দর্য্যের দাবী করা যায় না। যে প্রকৃত রূপজ্ঞ সে আটপৌরে শাড়ীপরা বঙ্গবধূ আর জড়োয়া মোড়া রাজকন্যার ভিতর রূপের কমি বেশী দেখে না। দেখে তার প্রকাশের প্রস্থানভেদে রূপ বৈচিত্র্য। তেমনি ভাষার রসে যে বিশেষজ্ঞ সে তার বিবিধ ভঙ্গীর প্রত্যেকটির ভিতরেই রসের আস্বাদন করিতে পারে।

সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে রামায়ণের ভাষার রসসমৃদ্ধির তুলনা নাই। কিন্তু সে রস প্রধানতঃ ভাবের রস, ভাষার রস তার সরল

সৌষ্ঠব। ভাবের পরিপূর্ণ রসটা শ্রোতার অন্তরে জাগাইয়া তুলিবার পক্ষে যাহা পর্য্যাপ্ত রামায়ণের ভাষায় তার চেয়ে বেশী কিছু নাই। ভাষার অলঙ্কার রামায়ণে একরকম নাই বলিলেও চলে।

কালিদাসের ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রকমের। তাঁর ভাষা শুধু ভাবের বাহন মাত্র নয়, তার একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। ইহাতে কবি ও পাঠকের অন্তরের ভিতর সেতু নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। সে সেতুর ভিতর কারুকার্য্য আছে। পাঠক শুধু কবির অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁর অনুভূতির স্বাদলাভ করেন না, পথে চলিতে সে পথের শোভাটুকুও তাঁর চোখে লাগে। বাল্মীকি যেখানে সোজা পথ কাটিয়া গিয়াছেন, পথের রেখাটির অনাড়ম্বর সরলতা ছাড়া অন্য কোন সৌষ্ঠবের আয়োজন করেন নাই, কালিদাস সেখানে একটি বিচিত্র তোরণ চারুচিত্রাঙ্কিত কুসুমাস্তরণে শোভিত করিয়াছেন। বাল্মীকির কবিতা যেন একটা অনাড়ম্বর বিবাহের আসর, সেখানে অনবদ্যা কন্যালাভই একমাত্র আনন্দের উপাদান। কালিদাসের আসরে যেন তার পাশে গান বাজনার আয়োজন আছে, ভূরিভোজনের যোগাড় আছে। তবে কালিদাস ও বাল্মীকির মধ্যে আর একটা প্রভেদও আছে। রামায়ণের রসাস্বাদনের জন্য প্রয়োজন শুধু অনুভব-শক্তির; কালিদাসের রসাস্বাদনের অধিকার আছে শুধু পণ্ডিতের। তবু যে অধিকারী তার পক্ষে কালিদাসের কবিতার অন্তরে প্রবেশ করিতে কোন অন্তরায় নাই, তাঁর ভাষা পথ আগলাইয়া দাঁড়ায় না; রসিকের যাত্রাপথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বন্দীর মত সে পথ সঙ্গীতে মুখরিত করিয়া তোলে, নিজের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু পথ আটকায় না। মাঘের কাব্যের ভাষাটা আরও বেশী ঘোরাল।

সে শুধু কবি ও শ্রোতার মধ্যে সম্বন্ধ পথ অলঙ্কৃত করিয়া সন্তুষ্ট নয়; তার মাঝ পথে একটা রত্নখচিত তিরস্করিণীর মত পথ আগলাইয়া আছে, তাকে অবহেলা করিয়া যাওয়া চলে না, কিন্তু তাতে বাধাও জন্মে না। দুদণ্ড তার শোভার দিকে চাহিতে হইবে, এই বিচিত্র ব্যূহ কৌশল ভেদ করিয়া তার কেন্দ্রের রত্ন আহরণ করিতে হইবে।

কিন্তু জয়দেবের কবিতার ভাষা কবি ও পাঠকের ভিতর দরোয়ানের মত দাঁড়াইয়া আছে। ভাষাকে অগ্রাহ্য করিয়া ভাবের কুঠুরিতে প্রবেশ করে কার সাধ্য? বাল্মীকি বা কালিদাসের তুলনায় জয়দেবের ভাবের যেমন দৈন্য, ভাষার ছটা তেমনি অধিক। ভাষার লালিত্য ও অলঙ্কার চিত্তকে এমন পরিপূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিয়া দেয় যে, ভাবের কোঠায় কতটুকু পুঁজি আছে সে খবর লইবার অবসর পাঠকের আদৌ হয় না।

ভাবের ঐশ্বর্য্যই কবিতার গৌরব; ভাষা তাহার বাহন মাত্র। তবু ভাবকে ভাষায় ফুটাইতে গিয়া কল্পনাকুশল কবির চিত্তে আনুষঙ্গিক ভাবে আরও কতকগুলি ভাব ফুটিয়া উঠে। রূপশব্দ ভাবালঙ্কারে ভাবের বিকাশ অলঙ্কৃত হইয়া উঠে।

কবির ভাবের ঐশ্বর্য্য ফুটিয়া উঠে অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যে। সুকবির হাতে সে অলঙ্কার তার মূল ভাবের রসবৃদ্ধি করে, তাহার কোনও হানি করে না। কিন্তু অলঙ্কারের বিপদ এই যে তার শোভা অনেক সময় অলঙ্কৃতের সৌষ্ঠবকে আবৃত করে। পটু আর্টিষ্ট অলঙ্কারগুলির সুনিপুণ বিন্যাসে অলঙ্কৃতের রূপ বাড়ান, কিন্তু যে শুধু কারিগর, আর্টিষ্ট নয়, সে মসগুল হইয়া যায় অলঙ্কারের কারিগরিতে, সমগ্র বস্তুটির রূপের সঙ্গে সমন্বয় না করিয়া সে অলঙ্কারের পর অলঙ্কার চাপাইয়া যায়, সেই অলঙ্কারের

ভিতর অশেষ কারচুপি করিয়া যায়। জয়দেব ছিলেন সেই শ্রেণীর কারিগর। জয়দেবের ভিতর কবিত্ব ছিল। তাঁর কাব্যের অনেক স্থানে প্রকৃত কবিত্বের আস্বাদ আমরা পাই, কিন্তু গীত-গোবিন্দের অধিকাংশ স্থলে শিল্পালঙ্কারের সূক্ষ্ম কারিগরির উপর তার এত বেশী দৃষ্টি যে তার চাপে ভাব মারা গিয়াছে। অনেক স্থলে অলঙ্কারগুলি ছাঁটিয়া ফেলিলে তার ভিতর কবিত্বের বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

কবিচিত্ত আপনাকে প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতায় সহজ ভাবে যাহা সৃষ্টি করে, অলঙ্কার সেখানে রসের সমৃদ্ধি সাধন করে।— যেখানে ভাষা ভাবের সহজ বাহন সেইখানেই তাহা সার্থক, কিন্তু যেখানে তার ভিতর চেষ্টার পরিচয় নাই, সেইখানেই কাব্যরস ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। কবির ভাব ও তার প্রকাশের ভিতর যেখানে এই চেষ্টার ব্যবধান থাকে সেইখানেই কাব্য রসিকের পীড়াদায়ক হইয়া পড়ে। যদি তাহা না হয়, কাব্য যদি কবিচিত্তের সহজ প্রকাশ হয়, তবে সে প্রকাশের উপাদান নিরাভরণই হউক বা সালঙ্কারই হউক তাহা সুন্দর হইবে। যে কবি মূল ভাবের ঐশ্বর্য্যে ভরপুর হইয়া অনাড়ম্বর আন্তরিকতার সহিত তাঁর ভাব প্রকাশ করেন, তাঁর কবিতা সুমধুর হয় আন্তরিকতার গুণে। যে কবির কল্পনার সমৃদ্ধি প্রকাশের মুখে স্বভাবতঃ নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া উঠে তাঁর রচনাও সুন্দর ও সহজ হয়। তাজমহলের সূক্ষ্ম অলঙ্কারবহুল রূপ সকলকে মুগ্ধ করে, কিন্তু নাগিনা মসজিদের বিরলাভরণ সৌন্দর্য্যও তুচ্ছ নহে। যারা আর্টিষ্ট নয়, শুধু কারিগর, তাহাদের হাতের সূক্ষ্ম কারুকার্য্যবহুল অনেক সৃষ্টি দেখা যায় যাহা সমগ্র ভাবে একেবারে নিরর্থক। ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ রাজমিস্ত্রীদের পরিকল্পিত সূক্ষ্ম কারুকার্য্য বহুল

অনেক বাড়ী দেখিয়া এই কথাটাই মনে হয় যে ইহারা কারিগর—আর্টিষ্ট নয়।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষার রূপটা কেমন হওয়া উচিত, কোন্ রূপটা ভাল, ইহা লইয়া বহু আলোচনা হইয়াছে। যাঁরা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁরা সব সময় সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে এই সরল সত্যটা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। অনেক সমালোচক ভাষার প্রধান স্রষ্টাদের তুলনা করিয়া বিচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন কার আদর্শটা বেশী সুন্দর, কোন্‌টা ভবিষ্যৎ সাহিত্যের আদর্শ হওয়া উচিত।

স্কুলে ছাত্রদের ভাষা শিক্ষা দিতে এরূপ বিচারের অনেকটা সার্থকতা আছে, কিন্তু সাহিত্য যাঁরা সৃষ্টি করিবেন তাঁদের ভাষার নমুনা এমন করিয়া ছকিয়া দিবার চেষ্টা যেমন স্পর্দ্ধিত, তেমনি নিরর্থক। যাঁরা এমন চেষ্টা করেন, তাঁরা ভুলিয়া যান যে, যাঁর প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টির অধিকার থাকিবে তিনি ষোল আনা পরের ভাষার কথা লিখিতে পারিবেন না। কবির ভাষা তাঁর বিশিষ্ট চরিত্র ও কল্পনার ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ, তাহার ভিতর স্বাতন্ত্র্য থাকিবেই। তা' ছাড়া আর একটা কথা ইহাঁরা হিসাবের ভিতর আনেন না যে, ভাষার ভালমন্দ বিচারের ভিতর মামূলের অনেকটা বিশিষ্ট অধিকার আছে। বেশ ভূষার যেমন ফ্যাসান আছে,—একদিন যেটা লইয়া হৈ চৈ পড়িয়া যায়, আর একদিন যেমন সেটা তুচ্ছ হইয়া পড়ে,—ভাষার ভঙ্গী সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই খাটে। একদিন ইংলণ্ডে Euphuesএর ভাষার কি রেওয়াজই হইয়াছিল!—স্বয়ং সেকসপিয়ার পর্য্যন্ত তার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি পান নাই।

যিনি কবি, যিনি স্রষ্টা, তাঁর মুখে সহজে যে ভাষা আসে

সেই তাঁর পক্ষে শ্রেষ্ঠ ভাষা ; তার ভিতর দিয়াই তাঁর প্রতিভা সার্থকতা লাভ করিতে পারে, কোনও ধার করা ভাষায় তার সার্থকতা লাভ হইতে পারে না। কোন্ ভাষা সুন্দর সেটা ভাষার প্রকৃতি বা অলঙ্কারের উপর যতটা নির্ভর করে, তার চেয়ে বেশী নির্ভর করে লেখকের উপর। ভাষার যে ধারা ধরিয়া লোকোত্তর প্রতিভাসম্পন্ন কবি সেই ভঙ্গীর অশেষ শক্তির পরিচয় দেন, সেই ধারাই অনুকারীর হাতে পড়িয়া নির্ব্বীর্য্য ও প্রাণহীন হইয়া পড়ে—এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

ভাষার প্রাণ যে শুধু শব্দে নয়, এই কথাটা আমরা স্মরণ করি না বলিয়াই প্রতিভাবান লেখকের ভাষার বাহ্য লক্ষণগুলি দিয়া তাঁর শক্তির উৎস নির্ণয় করিবার চেষ্টা করি। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র বা প্রমথ চৌধুরীর ভাষার শক্তি বা উৎকর্ষ বাহ্য লক্ষণের গুণ নয়—তাঁদের প্রাণের গুণ। এঁদের বিশিষ্ট শক্তি ও চরিত্র এই ভাষায় সহজে প্রকাশ লাভ করিয়াছে বলিয়াই এ ভাষা সুন্দর, সমৃদ্ধ,—শক্তিমান। ভাব যাহাতে সুন্দর ও শক্তিমান হইয়া প্রকাশ হয় তাহাই ভাষা। তার শুধু একটা বাঁধা পথ নাই—বহু পথ আছে। প্রত্যেক শক্তিমান লেখক তাঁর আপন ধারা খুঁজিয়া বাহির করেন।

অনেক পণ্ডিত তর্ক তুলিয়াছেন যে সাহিত্যের ভাষা কথ্য ভাষা হইবে, না একটা পোষাকী ভাষা হইবে—সংস্কৃতবহুল হইবে, না সংস্কৃতবর্জ্জিত হইবে—তার ক্রিয়াপদগুলির স্বরূপ কথ্যভাষার মত হইবে, না বিদ্যাসাগরী ভাষার মত হইবে ? কিন্তু এ তর্কের কোনও মানে নাই।

ভাষার ভিতর শক্তির আকর যতগুলি আছে সবগুলি কোনও লেখকই কাজে লাগাইতে পারেন না। তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ

প্রতিভা ও চরিত্র অনুসারে তার মধ্যে এক বা একাধিক উৎস হইতে শক্তি সংগ্রহ করেন।

আর শক্তির আকর ছড়ান আছে চারিদিকে। সংস্কৃত ভাষা ও অলঙ্কার শাস্ত্রে বহু উপাদান আছে যার সুনিপুণ প্রয়োগে ভাষার অশেষ শক্তি ও সমৃদ্ধি হইতে পারে। সংস্কৃত শব্দসম্পদের অপটু প্রয়োগে যেমন ভাষা আড়ষ্ট হইয়া যায়, তার নিপুণ প্রয়োগে যে তাহা তেমনি শক্তিমান হইতে পারে, বর্ত্তমান যুগে তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ দিয়াছেন তাঁরাই যাঁরা কথ্যভাষার সবচেয়ে বড় ভক্ত—রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী। প্রমথবাবুর ভাষার ভিতর হইতে শক্ত সংস্কৃত কথাগুলি ছাঁটিয়া ফেলিলে যাহা থাকে, তার পরিমাণ খুব বেশী নয়, অপ্রচলিত অনেক সংস্কৃত কথা তিনি বিপুল শক্তি ও রস সমৃদ্ধির সহিত ব্যবহার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের লেখার ভিতর পদে পদে সংস্কৃত কাব্য ও উপনিষদের ভাষার প্রত্যক্ষ প্রভাব এতটা সুস্পষ্ট যে তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

আবার আর একদিকে, চল্‌তি কথার ভিতর যে কত অসংখ্য শক্তি ও রসের কেন্দ্র ছড়ান রহিয়াছে তার যথেষ্ট পরিচয় বাঙ্গলা সাহিত্য আজও ভাল করিয়া পায় নাই। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথবাবু এই শক্তির ভাণ্ডার হইতে উপাদান আহরণ করিয়া অনেক ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইহার প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু সমস্ত দেশবাসীর আটপৌরে জীবনের সমস্ত রস যে ভাষার ভিতর সঞ্চিত আছে, তার রসের সাগরের ভিতর এঁরা দু'চারটা ডুবুরী বইত কিছুই নন! আমাদের চল্‌তি ভাষা বিশিষ্টভাবে অনুশীলন করিলে ইহার চারিধার হইতে যে কত রাশীকৃত হীরার টুকরা খুঁটিয়া বাহির করা যাইতে পারে, তার আর একটা সামান্য পরিচয় দিয়াছেন শৈলজানন্দ। গ্রাম্য

লোকের ভাষার প্রাণটাকে নিবিড় ভাবে আয়ত্ত করিয়া তাহা হইতে রসের প্রচুর উপকরণ তিনি বাহির করিয়াছেন।

সংস্কৃত ও চল্‌তি ভাষা দুয়ের বাহিরেও কথার রস সঞ্চারের যথেষ্ট উপকরণ পড়িয়া আছে, শক্তিমান সাহিত্যিক তাহা হইতে অশেষ সম্পদ সংগ্রহ করিতে পারেন। আরবী ও ফারসী কথায় যে ভাষা কতদূর সমৃদ্ধি ও লালিত্য লাভ করিতে পারে তার পরিচয় উর্দ্দু ভাষা ও সাহিত্য। আর আজকার দিনে, শুধু আরবী ফারসী কেন, ইংরেজী, ফরাসী প্রভৃতি জগতের সমস্ত ভাষার ভিতর রস সঞ্চারের উপাদান সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

অনেকের বিশ্বাস, বিদেশীয় ভাষা হইতে কথা বা কথার ভঙ্গী সংগ্রহ করিলে বাঙ্গলায় সেটা বিসদৃশ হইয়া পড়িবে। ইংরাজী নবিসের লেখা বাঙ্গলার ভিতর শুধু ইংরাজীর ভাষান্তর করিয়া লেখা যে সব অদ্ভুত কথা অনেক সময় দেখা যায় তাহাই এ সম্বন্ধে চরম প্রমাণ বলিয়া সকলে মনে করেন। কিন্তু এ সব অদ্ভুত উদাহরণ কেবল রচয়িতার অক্ষমতার পরিচয় দেয়, বিদেশী ভাষা হইতে শব্দ বা ভঙ্গী বা পদযোজন বা imagery যে বাঙ্গলায় চালান যায় না ইহাতে তাহা প্রমাণ হয় না। যার শক্তি আছে তার হাতে বিদেশী ভাষা হইতে উপাদান সংগ্রহে ভাষার যে শক্তি বৃদ্ধি হইতে পারে তার বহু পরিচয় রবীন্দ্রনাথের লেখায় আছে। ইংরাজী ভাষায় কথার বা পদযোজনার ভঙ্গী বা imagery রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখায় যত আহরণ করিয়াছেন তত বোধ হয় আর কেহ করেন নাই আর আরবী ও ফারসী লব্‌জ্‌ যদি হিন্দুস্থানী ভাষায় এমন শক্তি ও সৌষ্ঠবের আকর হইতে, পারে তবে বাঙ্গলায় তাহা হইতে না পারিবার কোনও হেতু নাই। সম্পূর্ণ বেমানান ভাবে আরবী বা ফারসী কথা জুড়িয়া দিলে রচনা কিম্ভূতকিমাকার

হইতে পারে; কিন্তু ভাষার প্রাণ ও সুরের সঙ্গে যার সম্যক পরিচয় আছে, আহৃতের সমীকরণের শক্তি যাঁর আছে, সে লেখক, সে আরবী ফারসী শব্দ অবিকৃত ভাবে গ্রহণ করিয়া ভাষার সৌষ্ঠব হানি না করিয়া তাহাকে সমৃদ্ধ করিতে পারেন, তার পরিচয় দিয়াছেন কবি সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত, আর আজকাল কবি নজরুল ইস্‌লাম ও মোহিতলাল। তা ছাড়া শব্দগুলি অবিকৃত আহরণ না করিয়াও বিদেশীয় ভাষার ideology বাঙ্গলা ভাষায় আত্মসাৎ করিলে তাতে রসের সমৃদ্ধি অনায়াসে সাধিত হইতে পারে। বাহির হইতে ভাষার সম্পদ সহজ ভাবে গ্রহণ করিয়া যে তাহা নিজস্ব করিয়া লইতে পারে সেই ইহা হইতে তার ভাষার রস সঞ্চার করিতে পারে। যে সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে না, বিদেশীয় শব্দ বা পদযোজনরীতি যে আপনার করিয়া লইতে পারে না, শুধু চেষ্টা করিয়া অনুকরণ করে, তারই লেখায় ইহা বেমানান ও অশোভন হইয়া দেখা দেয়।

শক্তিমান লোকের হাতের গোড়ায় চারিধারে ছড়ান আছে ভাষার রস ও সমৃদ্ধির অজস্র উপাদান। এই অফুরান ভাণ্ডার হইতে নিজ নিজ শক্তি ও সাধনা অনুসারে তাঁরা উপকরণ সংগ্রহ করেন। সংস্কৃত ভাষার ভিতর ডুবুরী হইয়া না নামিলে কিছুতেই ভাষা সুরসাল হইবে না, এ কথা যেমন অসত্য, বাঙ্গলার চল্‌তি ভাষা ভিন্ন অপর কোথাও এত রসের বাহুল্য পাওয়া যাইবে না, এ কথাও তেমনি অসত্য। ভাষাটা শক্তিমান বা রসভূয়িষ্ট হইবে কি না, তাহা নির্ভর করে লেখকের ব্যক্তিত্বের উপর। লেখক যদি শক্তিমান হন তবে তিনি বিচিত্র রস সৃষ্টি করিতে পারিবেন, তাঁর শব্দের পুঁজি সংস্কৃত হইতেই আসুক, আর চল্‌তি কথা হইতেই আসুক বা আরবী ফারসী হইতেই আসুক।

সংস্কৃত ঘেঁসা বাঙ্গলা ও চল্‌তি বাঙ্গলার কল্পিত বিরোধ লইয়া এই যে তর্ক ইহা খুব নূতন নয়, আর প্রকৃত প্রস্তাবে তর্কটা প্রথম যে এদেশেই উঠিয়াছে এমনও নয়। বিরোধটা সংস্কৃত ও চল্‌তি ভাষায় নয়, বিরোধ তুটি ভিন্ন style লইয়া। আর এ তর্ক চলিয়া আসিতেছে নানা দেশে, সকল যুগে, সুদূর অতীত কাল হইতে। সেকালের গ্রীসের সাহিত্যে এ বিরোধ দেখিতে পাই ইউরিপিডিস্ ও আরিষ্টফেনিস্ এর যুগে। ইস্কাইলাসের ভাষা ছিল গুরুগম্ভীর, বড় বড় কথা, গালভরা বিশেষণ, আর জটিল অলঙ্কার ছিল তার আভরণ। ইউরিপিডিস্ এই সব আভরণকে কৃত্রিম বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া তাঁর সময়ের সহজ চল্‌তি কথায় সাদামাঠা ভাবে তাঁর নাটক লিখিয়াছিলেন। হোমারের দেব-দেবী ও দেব-মানবদের লইয়া নাটক লিখিয়াছেন ইস্কাইলাস্; ইউরিপিডিস্ এই সব অতিমানবদের বাতিল করিয়া সহজ নরনারী লইয়া নাটক লিখিয়াছেন চল্‌তি সরল ভাষায়। এই লইয়া সেকালে যে তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল তার একটা চিত্র আরিষ্টফেনিসের Frogs এ আছে।

ইস্কাইলাস ও ইউরিপিডিসের তর্কের ভিতর যে সমস্যা দেখিতে পাই, সেই সমস্যাই দেশে দেশে, নানা যুগে, নানা ভিন্ন আকারে দেখা দিয়াছে। নানা যুগে নানা সাহিত্যের ইতিহাসে এই সমস্যা লইয়া সাহিত্যিকেরা দল বাঁধিয়াছেন। তাঁহাদের ঝগড়া শুধু ভাষার আকার লইয়া নয়, সাহিত্যের দ্বারা ভাব প্রকাশের সমগ্র প্রণালী লইয়া। একদল প্রাচীন-পন্থী আর একদল নূতন-পন্থী, একদল সাহিত্যের ভাব ও ভাষার কঠোর ভব্যতা ও নিয়মের পক্ষপাতী, আর একদল নিয়ম ভাঙ্গিয়া সাহিত্যে সহজ জীবনের প্রকাশের পক্ষপাতী; একদল কঠোর নিষ্ঠা ও সাধনা দ্বারা ভাষার

ও কল্পনার ভিতর একটা চাঁচাছোলা সুসংস্কৃত সৌষ্ঠবের পক্ষে, আর একদল তার ভিতর জীবনের স্বচ্ছন্দলীলা ফুটাইয়া তোলার পক্ষে। সাহিত্যে যুগে যুগে বিভিন্ন আকারে এই যে প্রকারভেদ লইয়া তর্ক—ইহার মূলে আছে মানুষের চরিত্রের ভিতর একটা প্রকাণ্ড ভেদ।

মানুষের জীবন, প্রাণ ও শাসনের—উচ্ছ্বাস ও নিয়মের সমবায়। প্রাণ ছাড়া কালচার বা আর্ট কিছুই হয় না। কিন্তু নিয়ম ছাড়া প্রাণ সুন্দর বা সৌষ্ঠবযুক্ত হয় না। মানুষের মধ্যে একদল লোক আছেন যাঁরা স্বভাবতঃ প্রাণটাকে গৌণ ও নিয়মকে প্রধান বলিয়া গণ্য করেন, আবারআর একদল আছেন যাঁরা নিয়মের চেয়ে প্রাণকে বড় করেন। এই প্রভেদ হইতে সাহিত্যে, আর্টে, সঙ্গীতে যুগে যুগে বিভিন্ন আকারে যে মত বিরোধ দেখা দেয় তাকে এক কথায় ক্লাসিক ও রোমান্টিকের বিরোধ বলিয়া প্রকাশ করা যায়। ক্লাসিসিজ্‌মের ঝোঁকটা নিয়মের দিকে, সনাতন বিধিনিষেধে বাঁধা বিকাশপন্থার দিকে; রোমান্টিসিজ্‌মের ঝোঁক প্রাণের দিকে, প্রাচীন নিয়মের বন্ধন ভাঙ্গিবার দিকে।

ক্লাসিক ও রোমান্টিকের এই বিরোধ ইউরোপের কালচারের ইতিহাসে নানাস্থানে নানাভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহার মূলের কথাটা আরও ব্যাপক। ইহা শুধু আর্টের বিকাশ-প্রণালীর বিষয়ে বিশিষ্ট মতান্তরে নিবদ্ধ নয়, ইহা আর্টের সাধনায় সমস্ত ইতিহাসব্যাপী। এই একই বিরোধ নানা স্থানে নানা আকারে দেখা দিয়াছে। ল্যাটিন ফ্রেঞ্চ ছাড়িয়া চসার যখন ইংরাজী লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁর চেষ্টার ভিতরও দেখিতে পাই ক্লাসিসিজ্‌মের বিরুদ্ধে রোমান্টিসিজ্‌মের এই বিদ্রোহ। সংস্কৃত ছাড়িয়া পালির আবির্ভাব, সংস্কৃত ও ইংরাজী ছাড়িয়া

বাঙ্গলায় সাহিত্য রচনা—এ সবই পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রাণের বিদ্রোহের পরিচয়।

সকল দেশের সব সাহিত্যের ভিতরই প্রাণের সঙ্গে পদ্ধতির এই বিরোধ যুগভেদে বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পাইয়াছে দেখিতে পাই। কিন্তু এই বিরোধের গোড়ার কথা তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে ইহার মূলে আছে মানুষের জীবন ও ভাষার ভিতরকার গতি ও বৃদ্ধি। ভাষা একটা সজীব পদার্থ, ইহার একটা স্বাভাবিক গতি ও বৃদ্ধি আছে। ভাষার এই সহজ পরিণতির ইতিহাস শুধু সাহিত্যের ভিতর আবদ্ধ নয়, ইহা সাহিত্যের বহির্ভূত সমাজের জীবনের একটা প্রকাশ মাত্র। ব্যক্তিব জীবনের মত সমাজের জীবনও একটা অবিচ্ছিন্ন পরিবর্ত্তনের স্রোত। সমাজের জীবনের পরিণতিমুখে তার প্রতি অঙ্গ, প্রতি রীতি ও অভ্যাস যেমন ক্রমে বদলাইয়া যায়, লোকের মুখের ভাষাও তেমনি বদলায়! একযুগে যে ভাষা লোকের ভাব-প্রকাশের পক্ষে পর্য্যাপ্ত আর একযুগে তাহা হয় নিতান্ত অপ্রচুর—তাই সমাজ তার জীবনের প্রয়োজন অনুসারে ভাষাকে বাড়াইয়া কমাইয়া লয়। চল্‌তি ভাষায় এই যে পরিণতির স্রোত, সাহিত্য তার ভিতর অল্প বিস্তর প্রভাব বিস্তার করে সত্য, কিন্তু বেশীর ভাগ পরিবর্ত্তনটা হয় সাহিত্যের বাহিরে। প্রায়ই এমনি হয যে সমাজের জীবনে ও ব্যবহারে একটা নূতন ধারার ব্যবহার সম্পূর্ণ সমীকৃত হইয়া গেলেই তাহা সাহিত্যে স্থান পায়। তবে বিশেষ প্রতিভাবান সাহিত্যিকের লেখার ভঙ্গীও অনেক সময় চল্‌তি ভাষার ভিতর স্থান পাইয়া যায়।

মোটের উপর একথা বলা যায় যে লোকসমাজে ভাষার পরিবর্ত্তন যতটা হয়, সাহিত্যের ভিতর পরিবর্ত্তনটা তত দ্রুত হয় না। কেন না সাহিত্য যতই স্বচ্ছন্দচারী হউক না কেন, তার ভিতর

নিয়মের শাসন অনেকটা থাকিয়া যায়—কিন্তু লোকের জীবনে কথাবার্ত্তার ভিতর অতটা বাঁধা বাঁধি কোন দিনই হয় না। সাহিত্য চলে অনেক পরিমাণে আদর্শ অনুকরণ করিয়া—প্রশংসিত সাহিত্যের অনুসরণ করিয়া তার পদ্ধতি রীতির ঘাট বাঁধা হইয়া যায়; কিন্তু চল্‌তি কথার কোন বাঁধা ঘাট নাই, লোকের সহজ সুর-বোধই তার একমাত্র নিয়ামক। তাই চল্‌তি ভাষা যত বদলায়, সাহিত্যের ভাষা তত বদলায় না।

যুগে যুগে ভাষার আকার লইয়া যে বিরোধ দেখিতে পাই—ক্লাসিক ও রোমান্টিকে যে বিরোধ নানা আকারে নানা যুগে দেখিতে পাই, এই ব্যাপার হইতেই তার উৎপত্তি হয়।

আদি কবি যখন সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন তিনি একটি পোষাকী ভাষা মাথা হইতে বাহির করেন নাই! তিনি লিখিয়াছিলেন, তাঁর যুগের যেটা চল্‌তি ভাষা সেই ভাষায়। চল্‌তি ভাষাকে তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভার দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া গড়িয়া পিটিয়া তিনি তাঁর ভাবের বাহন করিয়াছিলেন।

তারপর যারা লিখিল তারা তাঁর ভাষাকে আদর্শ করিয়া অল্প বিস্তর তার অনুকরণ করিয়া গেল। এমনি করিয়া সাহিত্যের ভাষার একটা পদ্ধতি দাঁড়াইয়া গেল, তার ব্যাকরণ, অভিধান ও অলঙ্কারের শাস্ত্র গড়িয়া উঠিল।

বাল্মীকি যখন রামায়ণ লিখিয়াছিলেন, তখন তিনি যে ভাষায় লিখিয়াছিলেন তাই ছিল লোকের প্রাণের সহজ ভাষা। একটু চাঁচাছোলা, একটু 'সংস্কৃত', কিন্তু মূলে সে ছিল লোকেরই ভাষা। কালিদাস যখন লিখিয়াছিলেন, তখন সংস্কৃত সাধারণের চল্‌তি ভাষা ছিল না—চলতি ভাষা ছিল প্রাকৃত, কিন্তু তখন সংস্কৃত ছিল ভদ্রের ভাষা, কালচারের জ্যান্ত ভাষা, তা ছাড়াও

কালিদাসের যুগের প্রাকৃত ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার পার্থক্য যথেষ্ট থাকিলেও প্রাকৃত ভাষীর পক্ষে সংস্কৃত গ্রহণ খুব কঠিন ছিল না; কেননা উভয় ভাষার ভিতর প্রভেদটা তখনও খুব প্রকাণ্ড ছিল না। জয়দেব যখন লিখিয়াছিলেন তখন তাঁর আটপৌরে ভাষা ছিল সেকালের বাঙ্গালা, যার সঙ্গে সংস্কৃতের জ্ঞাতিত্ব কুরসীনামা না দেখিয়া বোঝাই যায় না। বাল্মীকির সংস্কৃত তার সহজ ভাবানুভূতির স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। কালিদাসের যুগে প্রাকৃত তার অধিকার প্রচার করিলেও ভদ্রসমাজের পক্ষে সংস্কৃত ছিল সহজ ভাবপ্রকাশের ভাষা। তাই বাল্মীকি বা কালিদাসের কবিতা সংস্কৃত হইলেও তাহাতে স্বচ্ছন্দ ও সহজভাবে ভাব-প্রকাশের বাধা হয় নাই; কিন্তু জয়দেবের সংস্কৃত কৃত্রিম, চেষ্টা-কৃত—তাহা তাঁর ভাবস্ফূর্ত্তির সহজ বাহন নয়। জয়দেব চেষ্টা ও যত্নের দ্বারা তাঁর কৃত্রিম ভাষায় এমন একটা লালিত্য সঞ্চার করিয়াছেন যে, তার কৃত্রিম ভাবটা অনেকটা চাপা পড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু ভাষার সঙ্গে ভাবের অন্বয় করিয়া দেখিলে এই কৃত্রিমতা সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে।

ভাষাটা যতক্ষণ ভাবের সহজ অভিব্যক্তি থাকে, ততক্ষণ তাহা অলঙ্কৃত হউক বা নিরলঙ্কারই হউক, সংস্কৃতই হউক আর অসংস্কৃতই হউক, তাহা সাহিত্যের ভাষা হইতে পারে।

সকল সাহিত্যের গতি অনুশীলন করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সাহিত্যের গতি সহজ চলতি ভাষার ব্যাকরণ অভিধান ও ভাবপ্রকাশের রীতির দিকে। এক আধটা গুরুতর সন্ধিস্থলে সাহিত্যের ইতিহাসে এই গতিটা একটা তীব্র প্রতিবাদ লইয়া হাজির হয়, তখন বিরোধ স্পষ্ট হইয়া উঠে; কিন্তু তাছাড়া সহজ অননুভূতভাবে এই গতি নিরন্তর চলিয়াছে। সাহিত্য নিয়ত

শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে জীবন্ত সমাজের অভিব্যক্তি যে চল্‌তি ভাষা তার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়া। ইহা হইতেই যুগে যুগে সাহিত্য সজীব পরিণতি লাভ করিতেছে।

কিন্তু এ কথা বিশদভাবে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়া আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি করিতে চাই না।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন—১৮শ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।
সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—১৩৩৫।

॥ প্রগতি ॥

প্রগতি লেখক-সঙ্ঘের এই প্রথম বইখানি প্রকাশিত হইল। এই সঙ্ঘের সম্বন্ধে অনেকের একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে। সেটা সাধারণতঃ সঙ্ঘের অনুকূল নয় এবং সম্পূর্ণ সত্যও নয়। হয়তো এই সংগ্রহগ্রন্থ হইতে সে ধারণা কতকটা সংশোধিত হইবে। সঙ্ঘ কী চায়, ইহার মূল সূত্র কী, তার পরিপূর্ণ ধারণা ইহাতে পাওয়া যাইবে না, কিন্তু একটা আভাস পাওয়া যাইবে।

প্রগতি-লেখক-সঙ্ঘ সাহিত্য ও সমাজে প্রগতিকামী—সে অভীপ্সিত প্রগতি সাধনের পক্ষে সঙ্ঘের উপায় সাহিত্য। যে সাহিত্যের পুষ্টি ও সমৃদ্ধি সঙ্ঘ কামনা করেন তাহা সমাজের প্রগতির অনুকূল হইবে, কিন্তু তাহা সাহিত্য হওয়া চাই—সাহিত্য রসভূয়িষ্ঠ হওয়া চাই।

সার্থক সাহিত্য প্রগতিশীল হইতে বাধ্য। প্রগতি ছাড়া সাহিত্যই হয় না। যাহা গতানুগতিক, যাহা কেবলমাত্র পুরাতনের বিজৃম্ভন, তাহাতে কাব্য-কুশলতা যতই থাকুক তাহা সাহিত্য বলিয়া স্থায়ী প্রতিষ্ঠা কোনও দিনই পায় না। গতানুগতিকের বাঁধা খাত ছাড়িয়া যিনি কোনও নূতন পথ—রসের নূতন ধারা আবিষ্কার করিতে পারেন তাঁহারই সাহিত্য রচনা সার্থক হয়।

কোনও এক লোকোত্তর প্রতিভাশালী লেখক একটি নূতন পন্থা অনুসরণ করিয়া সাহিত্য রচনায় সার্থকতা লাভ করিলে সঙ্গে সঙ্গে বহুতর ব্যক্তি তাঁর সে পথ ধরিয়া তাঁরই অনুকরণে সাহিত্য রচনা করেন। তার মধ্যে যাহা শুধু অনুকরণ, যার ভিতর নিজস্ব নূতন কিছুই নাই, তাহা মুহূর্তে বিলুপ্ত হইয়া যায়, নূতন যাহা, যার ভিতর রসবস্তু নূতন কিছু বিকাশ থাকে, তাহাই চিরকাল স্থায়ী

হইয়া থাকে। রস-সাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলেও আমরা দেখিতে পাই, যে সে সাহিত্যের প্রগতিশীল না হইয়া উপায় নাই। কেননা সে সাহিত্যের উপজীব্য মানব-জীবন সমাজ-জীবন। ম্যাথু আর্নল্ড জীবন জিজ্ঞাসা (criticism of life) বলিয়া কবিতার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সকল এপিগ্রামের মত তাঁর এই সূত্রাকার উক্তিটিও সত্য নয়, আংশিক সত্য মাত্র কিন্তু ইহার ভিতর একটা খাঁটি সত্যের প্রকাশ আছে। কথা-সাহিত্য সম্বন্ধে এ কথা আরও নিশ্চয়তার সহিত বলা যায় কেননা কথা-সাহিত্য মানব-জীবন লইয়াই লেখা। জীবনের একটা রসরূপ প্রকাশই কথা-সাহিত্যের লক্ষ্য। মানব-জীবন এমন বিচিত্র, এমন জটিল, তার ভিতর রসের এত অফুরন্ত উপাদান অপর্যাপ্ত পরিমাণে ছড়ান আছে যে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া লোকে সে রসের পরিচয় দিয়া তার রসসমৃদ্ধি নিঃশেষ করিতে পারে নাই, কোনও দিন পারিবে না।

এই মানব-জীবন, সমাজ-জীবন, ইহা স্থাণু নয়—চঞ্চল। যাহা অতীত, তার মধ্যে যাহা চিরন্তন তাহা লুপ্ত হয় নাই, কিন্তু সেই অতীতের অভিজ্ঞতা, নিত্য সমৃদ্ধ ও রূপান্তরিত হইয়া উঠিতেছে প্রতি মুহূর্ত্তের নব সৃষ্টিতে; প্রতিদিন মানব সমাজ নব জন্ম লাভ করিতেছে। তার অনুভূতি, তার আশা আকাঙ্ক্ষা, তার দৃষ্টি ক্ষেত্র নিয়ত রূপান্তরিত ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যুগে যুগে সাহিত্য সেই রূপান্তরিত জীবনের নূতন রসমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া সার্থক হইতেছে।

চলিষ্ণু সমাজ ও মানবচিত্তের এই প্রগতির সঙ্গে তাল রাখিয়া যে সাহিত্যিক রসরচনা করেন তিনিই সার্থকতা লাভ করেন। সমাজের নবজীবনের নূতন বার্ত্তা যে না জানে নবযুগের নূতন প্রাণের পরিচয় যে দিব্য চক্ষে না দেখিতে পারে, শুধু অতীত

কৃতীদের রচনার মুখে জীবনের স্বাদ গ্রহণ করিয়া যে সাহিত্য রচনা করিতে যায় তার রচনা হয় অসার্থক।

সেক্সপীয়ার পড়িয়া, কালিদাস পড়িয়া, ইউরিপিডিস পড়িয়া আমরা তৃপ্তি পাই—চণ্ডীদাসের পদাবলীতে অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করি। কেন না এই সব মহামনীষির মধ্যে কেউ গতানুগতিক ছিলেন না—জীবনের পরিচয় তাঁরা পরের মুখে ঝাল খাইয়া পান নাই। প্রত্যেকে তাঁর নিজের যুগের সমাজ ও মানবজীবন সাক্ষাৎ দৃষ্টিতে দেখিয়া তার রসমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু আজ যদি কোনও সাহিত্যিক ঠিক সেক্সপীয়ারের শ্রেষ্ঠ একখানি নাটকের মত একখানি নাটক লেখেন, কিম্বা চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠ একটি পদের অনুকরণ করেন তবে তাঁর অনুকৃতির কৌশলের লোকে যতই তারিফ করুক, তাঁর লেখা সাহিত্য পদবাচ্য হইবে না। কেন না আজকের যে সাহিত্য তাহা সার্থক হইতে হইলে আজকের দিনে মানবজীবনের সাক্ষাৎ অনুভূতির উপর তাকে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। মানবজীবনের যে রসমূর্ত্তি আজকের অভিজ্ঞতায় আমরা লাভ করিতে পারি তার পরিচয় যে সাহিত্যে না পাই তাহা সাহিত্য নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র তার লোকাতীত প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন যে সাহিত্যে তাহা রসিক সমাজ চিরদিন মাথায় করিয়া রাখিবে। কিন্তু যে সাহিত্যিক আজ উপন্যাস লিখিতে বসিয়া গোবিন্দলাল বা নগেন্দ্রনাথ, কুন্দনন্দিনী বা ভ্রমরের মনের ক্ষেত্রের বাহিরে পদক্ষেপ করিতে পারে না তাঁর উপন্যাস লিখিয়া সার্থকতা লাভের আশা বিড়ম্বনা। কেন না আজ যে পুরুষ বা নারী আছে তার জীবন, চিন্তা, অনুভূতি বা দৃষ্টিক্ষেত্র গোবিন্দলাল, নগেন্দ্রনাথ, কুন্দ বা ভ্রমরের জীবন, চিন্তা, অনুভূতি বা দৃষ্টিক্ষেত্র নয়। আজকের গল্প

লেখককে আজকের সমাজের ও মানবজীবনের সাক্ষাৎ অনুভূতি লাভ করিয়া তারই রসচিত্র আঁকিতে হইবে ; আজকের কবি রসিক চিত্তে যদি আঘাত করিতে যান তবে তাঁর আজকের জীবনের সাক্ষাৎ অনুভূতি হইতে করিতে হইবে রস সঞ্চয়।

বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি প্রজ্ঞামূল সাহিত্য যেমন নিত্য নূতন আবিষ্কারের দ্বারা আপনাকে সজীব ও সুপ্রতিষ্ঠ করে, সাহিত্যও তেমনি, নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল মানব-জীবনের ভিতর চক্ষু ডুবাইয়া রসের নিত্য-নূতন খনির সন্ধান করিয়া সজীব থাকে।

কাজেই সাহিত্য মাত্রেই প্রগতিশীল ; প্রগতি ও সাহিত্যের সম্বন্ধ নিত্য।

তবু প্রগতি লেখক সঙ্ঘের "প্রগতি"র উপর ঝোঁকটা নিরর্থক বা অতিরিক্ত নয়।

"প্রগতি" কথাটার সম্বন্ধে লোকের মতভেদ আছে। সংসারের বেশীর ভাগ লোক গতানুগতিক। বাঁধা খাতে চলিবার নিশ্চিন্ত-তাই বেশীর ভাগ লোকে এত পছন্দ করেন, যে নূতন পথ মাত্রকেই বিপথ মনে করিয়া তাঁরা চঞ্চল হন।

নূতন পথে চলিবার আকাঙ্খা বা সাহস যাদের আছে, তাদের মধ্যেও মতভেদের অভাব নাই। আমার পথই একমাত্র পথ, আর সব বিপথ, এমনি একটা ধারণা ইহাদের অনেকের মনে থাকে। তাই একজন যাহাকে প্রগতির পথ মনে করেন, অপরে তাহাকে অনেক সময়ই অধোগতির পথ বলিয়া বিবেচনা করেন। প্রগতি লেখক সঙ্ঘের প্রত্যেকে যে প্রগতির বিশিষ্ট স্বরূপ সম্বন্ধে একমত, ইহা হইতে পারেনা। তবু তাঁদের ভিতরে প্রগতির সাধারণ রূপ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে কতকটা মিল আছে।

প্রগতির একটা সাধারণ লক্ষণ চলিত-সংস্কার হইতে মুক্তি।

যাহা কিছু চলিয়াছে তাহাই চিরদিন চলিবে, প্রগতিশীল সাহিত্যিক এ ধারণা রাখেন না। ভিন্ন ভিন্ন লেখক সংস্কারের ভিন্ন ভিন্ন অংশের বিরূদ্ধে বিদ্রোহ করেন, কিন্তু তাঁদের সাধারণ লক্ষণ সংস্কার-মুক্তি।

চলিত-সংস্কারের বিরোধিতা মাত্রেই প্রগতি সূচিত করেনা। চোর, ডাকাত, খুনে, দাঙ্গাবাজ প্রভৃতি বিশেষরূপে সংস্কারবিমুক্ত, কিন্তু তারা প্রগতির দূত নয়। প্রগতিকামী সংস্কার শুধু ভাঙ্গে না, সে তার স্থানে কিছু গড়িতে চায়। তার চক্ষে স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হইয়াছে জীবন ও সমাজের একটা নূতন ও পূর্ণতর আদর্শ, সেই আদর্শের কাছে বর্ত্তমান সংস্কার যেখানে খাটো, প্রগতিকামী সেইখানেই সংস্কার ভাঙ্গিয়া নূতন আদর্শের অনুকূল সংস্কার গড়িতে চায়।

প্রগতি লেখক সঙ্ঘের লক্ষ্য সেই সাহিত্যের পুষ্টি ও অভ্যুদয় যাহা সমাজ ও জীবনের একটা বৃহত্তর, পূর্ণতর আদর্শের আলোকে বর্ত্তমানকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে চায়।

সে আদর্শ সবার এক নয়। এক একজন হয়তো সমাজ-জীবনের এক একটা অঙ্গ লইয়া ভাঙ্গা গড়া করিতে চান। কেহ চান নীতিশাস্ত্রের নব সংস্কার করিতে, কেহ চান সমাজের আর্থিক অবিচার অনাচারের প্রতিবিধান করিতে, কেহ চান রাষ্ট্রিয় নীতির ভাঙ্গা গড়া করিতে। ইহাদের সকলের মধ্যে একটি মাত্র সাধারণ লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, যাহা প্রগতি লেখক সঙ্ঘ আপনাদিগের নিজস্ব বলিয়া দাবী করেন। সে সাধারণ লক্ষণ এই যে, যে আদর্শই যাঁহার লক্ষ্য হউক, সে আদর্শের লক্ষণ—স্বাধীনতা—ব্যক্তি ও সমাজের পূর্ণতম স্বাধীনতা। যাহা কিছু মানবের মানবত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ লাভের অন্তরায় তাহা বিদূরিত

করিয়া মানবত্বের পূর্ণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে প্রকৃত পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা প্রয়োজন সেই স্বাধীনতা প্রগতি-সাহিত্য সঙ্ঘের লক্ষ্য।

যাঁরা সাহিত্য রচনা করেন তাঁরা সকলে আদর্শবাদী নাও হইতে পারেন, তাঁদের চক্ষে আদর্শের এই পূর্ণরূপ নাও প্রকাশিত হইতে পারে। কোনও আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা লইয়া সকলে সাহিত্য রচনা না করিতে পারেন। কিন্তু যে সাহিত্যিকের চিত্তের স্বভাব ও গতি এই আদর্শের অনুকূল, যাঁর রচিত সাহিত্য হয়তো তাঁর অজ্ঞাতসারেও এই আদর্শের রঙে রঙীন, প্রগতি লেখক-সঙ্ঘ তাঁহাকেই তাঁহাদিগের সমধর্ম্মী বলিয়া সাদরে আলিঙ্গন করিয়া লইবেন। মানব-সমাজ ও সংস্কৃতির অগ্রগতির যাহা কিছু অনুকূল, সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার আদর্শের যাহা কিছু সহায়ক, তাহাই প্রগতি সাহিত্য বলিয়া সঙ্ঘ স্বীকার করিবেন।

বলিয়াছি, মানব-সমাজ প্রগতিশীল। সঙ্ঘ স্বীকার করিবেন সমাজের উপচীয়মান জীবন প্রতিদিন অতীতের জীবন ও অভিজ্ঞতার উপর নূতন সৃষ্টির অঙ্কুর ফুটাইয়া তুলিতেছে এবং তাহা হইতে নিত্য নবজীবন স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু মানবের এই প্রগতির পদে পদে করিতে হয় সংগ্রাম; অতীতের সংস্কার, অসামাজিকের বিদ্রোহ প্রভৃতি ধ্বংসের অনুচর সমাজের বাঁচিবার ও বাড়িবাব নিয়ত প্রচেষ্টাকে রুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিষ্পেষিত করিবার জন্য লড়াই করিতেছে। আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্য-স্থলেও প্রগতিশীল সমাজের বিরুদ্ধ শক্তির অভাব তো নাই-ই নিত্য নূতন শত্রু মাথা তুলিয়া মানবের প্রগতি চেষ্টাকে বিধ্বস্ত করিবার উদ্যোগ করিতেছে।

মানুষ প্রকৃতির বুক ফুঁড়িয়া বাহির করিয়াছে সম্পদ্ তাহার জীবন সুখ সমৃদ্ধ করিবে বলিয়া, সেই সম্পদ ধনিকের অর্থ লিপ্সার

ফলে আজ কোটি কোটি মানবের কত না দুঃখ কত না অকল্যাণের হেতু হইয়াছে। বিজ্ঞান মানবের প্রধান গৌরব, মানবের কল্যাণ সাধনের শ্রেষ্ঠ যন্ত্র, সেই বিজ্ঞান আজ ধ্বংসের সেবায় বদ্ধপরিকর। সমাজ বাঁধিয়াছিল মানুষ জীবন পূর্ণতর ও অধিকতর আনন্দময় করিবার জন্য, সেই সমাজের বন্ধন আজ কঠিন নিগড় হইয়া তার মনুষ্যত্বকে নিষ্পেষিত করিতে চাহিতেছে।

অত্যাচার অনাচার দৃপ্ত পদক্ষেপে মেদিনী কম্পিত করিতেছে, নিপীড়িত মানব তার পদতলে নিষ্পেষিত হইতেছে। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে হিংস্র শক্তি আজ আন্দোলন করিয়া মানবের মানবত্ব ধ্বংস করিয়া তাহাকে ভোগ ও বিলাসের ক্রীতদাস করিতে স্পর্দ্ধা করিতেছে।

দিকে দিকে আজ ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে পীড়িত ও শঙ্কিত মানবের করুণ আর্তনাদ, তাদের বাঁচিবার, সার্থকতা লাভ করিবার ব্যাকুল আবেদন।

মানবের মানবত্বকে আশঙ্কিত ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে হইলে সর্ব্ব মানবের সংহত চেষ্টার প্রয়োজন। মানবের সকল শক্তির আজ প্রয়োজন হইয়াছে সংহত হইয়া এই দুর্দ্ধর্ষ ধ্বংস প্রচেষ্টার গতিরোধ করিবার। যাহার বাহুতে বল আছে, চিত্তে আছে যার ধীশক্তি ও ভাবুকতা, কণ্ঠে আছে যার বাগ্মিতা, লেখনী যার শক্তিমান—সকলের সমবেত চেষ্টার আজ প্রয়োজন, মানবের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও প্রগতিকে দৃপ্ত শক্তির মূর্ত্ত অকল্যাণের হস্তে আসন্ন ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার।

সেই ব্রতের উদযাপন কল্পে প্রগতি লেখক সঙ্ঘ একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

দল বাঁধিয়া সাহিত্য রচনা হয় না। প্রগতি করিব এই

প্রতিজ্ঞা করিয়াও সব সময়ে সুসাহিত্য রচনা করা চলে না। দল বাঁধিয়া প্রগতি সাহিত্য রচনা করিব এ উদ্দেশ্য এ সঙ্ঘের নাই। সঙ্ঘের সভ্যগণের উপর প্রগতির দাবী ধরিয়া বাঁধিয়া প্রচার করিতেও সঙ্ঘ চাহেন না। কিন্তু যাঁরা প্রগতিকামী সাহিত্যিক তাঁহাদিগকে সমস্ত্রে গ্রথিত করিয়া, প্রগতি সাহিত্যের সম্যক প্রচার আলোচনা ও গবেষণা করিয়া, পরস্পর আনুকূল্যের দ্বারা প্রগতি-লেখক-সঙ্ঘ সাহিত্যে নিয়ত প্রগতির অনুকূল অবস্থা ও আবহাওয়ার সৃষ্টি করিবার ভরসা রাখেন। ইহাই সঙ্ঘের লক্ষ্য ও ব্রত।

"প্রগতি" ১৩৪৪ এর ভূমিকা

॥ রবীন্দ্র-জয়ন্তী* ॥

বাঙ্গালার আজ মহাসৌভাগ্য। যাঁহার গৌরবে আজ এ দেশ গৌরবান্বিত, আমরা সেই কবির সপ্ততি বৎসরের উৎসব করিতেছি। এ সৌভাগ্য এ অভাগা দেশের কদাচিৎ ঘটে। যে সব মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া এ দেশের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন, তাঁরা প্রায়ই অকালে বিদায় লইয়াছেন—সত্তর বৎসর প্রায় কেহই অতিক্রম করেন নাই। আজ এ দুর্নিয়মের দুইটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাঙ্গালার অশেষ সৌভাগ্য সূচনা করিতেছে। একটি রবীন্দ্রনাথ, আর অপরটি তাঁরই অভিন্নহৃদয় সুহৃদ্ জগদীশচন্দ্র।

আরও সৌভাগ্যের কথা এই যে সত্তর বৎসর বয়ঃক্রমে রবীন্দ্রনাথ স্থবির বা নিষ্ক্রিয় নহেন; তাঁর প্রতিভা আজও পরিপূর্ণ গৌরবে দেদীপ্যমান। আজ আমরা যাঁর পূজায় সমবেত হইয়াছি, সে রবি অস্তাচলগত ক্ষীণ-দীপ্তি ভাস্কর নহেন, আজও তাঁর প্রতিভা মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের পরিপূর্ণ দীপ্তিতে ভাস্বর। কালের নিয়মে তাঁর শরীরে আজ হয় তো বার্দ্ধক্যের চিহ্ন স্পর্শ করিয়াছে, কিন্তু অন্তর যে তাঁর আজও "যৌবন বেদনা রসে উচ্ছল", তাঁর অনুভূতি ও প্রকাশের শক্তি যে আজও যৌবনের মতই প্রবল ও দ্যুতিমান, সে কথা তিনি না বলিয়া দিলেও আমরা অনায়াসে অনুভব করিতে পারিতাম।

তাই আজ সমস্ত বঙ্গদেশ, সমস্ত ভারত, সমস্ত জগৎ বাঙ্গালার এই গৌরব-রবির আনন্দ-কল্লোলময় স্তবগানে মুখর হইয়া

* মজঃফরপুরে—সভাপতির ভাষণ

উঠিয়াছে, দিকে দিকে রবীন্দ্র-জয়ন্তীর মঙ্গলগাথা ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। মিথিলার কেন্দ্রস্থলে আপনারা তাঁর যে জয়ন্তী-উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন, তাহাতে আমাকে যোগদান করিতে আমন্ত্রণ করিয়া আমাকে মহাসম্মান ও আনন্দ দান করিয়াছেন। আপনাদিগকে আমি কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব জানি না।

বিহার আমার কাছে বিদেশ নয়। আমার শৈশবের অনেক-গুলি বৎসর এই প্রদেশে কাটিয়াছে। মজঃফরপুরের অনতিদূরে মোতিহারীতে আমার শৈশবের যে কয়টি আনন্দময় বৎসর কাটিয়াছে তার স্মৃতি যে আমার অন্তরে বিলুপ্ত হয় নাই, যাঁরা আমার উপন্যাসগুলি পড়িয়াছেন তাঁরা সে কথা স্মরণ করিতে পারিবেন। সাহিত্য-সাধনায় আমি কোনও কৃতিত্ব লাভ করিতে পারিয়াছি কি না জানি না, কিন্তু যদি আমার সে সৌভাগ্য হইয়া থাকে; তবে আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিব যে. আমার সে সফলতার প্রথম বীজ উপ্ত হইয়াছিল এই দেশে। মোতিহারী স্কুলে পড়িবার সময়ই সাহিত্য-রচনার কল্পনা আমার মস্তিষ্কে প্রথম প্রবেশ করে—সেইখানেই আমি আমার প্রথম কবিতা রচনা করি। কি লিখিয়াছিলাম স্মরণ নাই, স্মরণ করিবার প্রয়োজনও নাই, কেন না স্মরণ করিয়া রাখিবার মত কিছু তখন লিখি নাই। কিন্তু বেশ স্মরণ আছে যে, লিখিবার কল্পনা ও ব্যর্থ চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল এই দেশেই। সুতরাং বিহার প্রদেশের আহ্বান আমার কাছে পরম লোভনীয় হইয়াছিল এ কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু এ তো শুধু বিহারের আহ্বান নয়—এ আহ্বান আপনাদের মুখপাত্র হইয়া পাঠাইয়াছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে

একজন সেই মহীয়সী নারী যাঁর নাম বঙ্গভারতীর সভায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া গিয়াছে, বঙ্গসাহিত্যের মুকুটমণি-মালিকায় যিনি একটি পরম ভাস্বর রত্ন। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর কাছে এ আহ্বান আমার পক্ষে এতবড় সম্মান যে আমি ইহাতে যদি একটু অসঙ্গতরূপ গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকি তবে হয় তো আপনারা আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।

আপনাদের রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসবে সভাপতিত্ব করিতে নিমন্ত্রিত হইয়া তাই আমি নানা কারণে সম্মানিত, গর্ব্বিত ও উল্লসিত হইয়াছি।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিয়া আমি আপনাদিগকে এমন কোনও কথা বলিতে পারিব না যাহাতে আপনাদের তাক্ লাগিয়া যাইবে। তবু রবীন্দ্রনাথকে আমি যেমন ভাবে বুঝিয়াছি, এবং তাঁর গৌরব আমার চোখে যেমন করিয়া লাগিয়াছে, সে সম্বন্ধে গোটা কয়েক কথা আপনাদের কাছে আলোচনা করিব।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমি যখন প্রথম পড়িয়াছিলাম—সে আজ অনেক দিনের কথা—তখন আমার সব চেয়ে বেশী বিস্ময় ও আনন্দ হইয়াছিল এই দেখিয়া যে, আমার মনের ভিতর যে সব অস্পষ্ট অনুভূতি উঁকি ঝুঁকি মারে, সেই সব কথা তিনি অপূর্ব্ব সুন্দর ভাষায় সুস্পষ্ট করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। কৈশোরে ও যৌবনে যখন তাঁর "মানসী" ও "সোণার তরী" পড়িয়াছিলাম, তারপর অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে যখন তাঁর "চিত্রা" পড়িয়াছিলাম, তখন ঠিক এই কথা মনে হইয়াছিল অনেকগুলি কবিতা পড়িয়া। তারপর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শনশাস্ত্রের বোঝা মাথায় লইয়া যখন বাহির হইলাম, তখন "নৈবেদ্য" পড়িয়া দেখিতে

পাইলাম যে, যে-সব তত্ত্ব লইয়া এত মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করিয়াছি তার কি সরস সুন্দর সুস্পষ্ট প্রকাশ "নৈবেদ্যে"র কবিতায়। তারপর সে বিস্ময় কাটিয়া গেল, কিন্তু তৃপ্তি রহিয়া গেল। যখনি যাহা, পড়িয়াছি তখনই অনুভব করিয়াছি কবি যেন আমার মনের কোন অস্পষ্ট অনুভূতি টানিয়া বাহির করিয়া তাকে অপরূপ ভাষায় এক লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি দান করিয়াছেন তাঁর কবিতায়।

এইটিই কবির কাজ, এইখানেই কাব্যের সার্থকতা, ইহাতেই তার মাধুর্য্য। কবি এমনি করিয়া সবার মনের ভাষা ফুটাইয়া বলিতে পারেন বলিয়াই তাঁর লেখা তাঁর পাঠকের চিত্ত হরণ করে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্য-জীবনে, বিভিন্ন বয়সের অনুভূত নানা বিচিত্র বেদনা এমনি করিয়া সুপটু তুলিকার পেলব স্পর্শে সূক্ষ্ম রেখায় চিত্রিত করিয়া বিশ্বমানবের সর্ব্ববিধ বিচিত্র অনুভূতি এমন পরিপূর্ণভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন যে, সকল দেশের সকল মানুষ ইহার ভিতর কোথাও না কোথাও তার মনের সব কথারই প্রকাশ দেখিতে পায়। শিশু পায় শিশু-চিত্তের ভাব ও চিন্তার প্রকাশ, যৌবন পায় যৌবনের তীব্রতম ও সূক্ষ্মতম অনুভূতির পরিচয়, পরিণত-বয়স্ক পায় তাদের গভীরতর চিন্তা ও অনুভূতির সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি। প্রতি মানবের মনের গোপন কন্দরে যেখানে যে ক্ষীণ অশ্রুত শব্দটি আছে, তাহা যেন রবীন্দ্রনাথের লেখনী মুখে মাইক্রফোনের ভিতর নিঃশ্বসিত ক্ষীণ শব্দের মত পরিপুষ্ট হইয়া সারা বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জগতের কোনও কবিই মানব-চিত্তকে এরূপ ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না। এতটা অন্তর্দৃষ্টি, এতটা সহানুভূতি, এতখানি দরদ, এত পরিপূর্ণ রূপবোধ, এমন অপরূপ বিকাশপটুত্ব দিয়া খুব অল্প কবিই মানব-চিত্তের দলগুলি বিকশিত

করিয়া তার অন্তরের সকল শোভা পরিস্ফুট করিয়া দেখাইয়াছেন। যাঁরা করিয়াছেন তাঁদের ভিতরেও অনুভূতির এতখানি ব্যাপকতা এত অপরূপ বৈচিত্র্য থাকা সম্ভব হয় নাই, কেন না রবীন্দ্রনাথের মত দীর্ঘ সাহিত্য-জীবন ভরিয়া মানব-চিত্তের সবগুলি স্তর এমন পরিপূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার সৌভাগ্য সকলের হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ অনেক কিছু—অনেক রকমে অনেক কর্ম্মে তিনি আপনাকে আমাদের কাছে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সকল কর্ম্মে, জীবনের সকল প্রকাশে তিনি আদ্যোপান্ত কবি, রূপ রসের তিনি উপাসক।—যাহা কিছু তিনি করিয়াছেন সকলই তিনি রূপরসে মণ্ডিত করিয়াছেন। তাই দর্শন ও পলিটিক্সের মত বিষয়কেও তিনি কাব্যরসে মণ্ডিত করিয়াছেন। তাঁর দর্শন কঠোর তত্ত্বের সমষ্টি নয়, তাঁর অনুভূত সত্যের রসরূপ তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁর পলিটিক্স সমাজ-জীবনের একটি সৌষ্ঠব-যুক্ত, শোভা ও মঙ্গলময় কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর বিশ্বরাষ্ট্রের কল্পনা মানবচিত্তের মূলগত শিবসুন্দরের রসমূর্ত্তির প্রকাশ!

এই কবির দৃষ্টি ও অনুভূতি লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—চিরদিন কবির দৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছেন প্রকৃতিকে, জগৎকে, জীবনকে। তাঁর সেই দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবন তার রূপরসময় মূর্ত্তিতে তাঁর জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রূপে দেখা দিয়াছে;—সেই বিভিন্ন রূপের একটা সামান্য পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

কৈশোরের কবি প্রকৃতির শুধু রূপরসে ভরপুর। রূপময়ী সে প্রকৃতি শুধু নয়, তাহা প্রাণময়ী—তার রূপের ও প্রাণের খণ্ড খণ্ড প্রকাশ তাঁর মুগ্ধ চিত্তে যে ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন তাঁর আবেগময় ভাষায়। ক্রমে তাঁর

দৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে প্রকৃতির সমগ্র রূপ, তার সমগ্র প্রাণ। সেই অনুভূতির গৌরবে মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে পরিণত যৌবনের রচনা। তার প্রকাশ "সোণার তরী" ও "চিত্রার" বহু কবিতায় আছে। দু'একটি দৃষ্টান্ত দিব। 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় কন্যার কণ্ঠে 'যেতে নাহি দিব' বলিয়া আবদার শুনিয়া কবি—

চলিতে চলিতে পথে হেরি দুই ধারে
শরতের শস্যক্ষেত্র নত শস্যভারে
রৌদ্র পোহাইছে। তরুশ্রেণী উদাসীন
রাজপথপাশে, চেয়ে আছে সারাদিন
আপন ছায়ার পানে। বহে খর বেগ
শরতের ভরা গঙ্গা। শুভ্রখণ্ডমেঘ
মাতৃদুগ্ধ পরিতৃপ্ত সুখনিদ্রারত
সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মত
নীলাম্বরে শুয়ে। দীপ্ত রৌদ্রে অনাবৃত
যুগ যুগান্তর ক্লান্ত দিগন্ত বিস্তৃত
ধরণীর পানে চেয়ে ফেলিনু নিঃশ্বাস।
কি গভীর দুঃখ মগ্ন সমস্ত আকাশ,
সমস্ত পৃথিবী। চলিতেছি যতদূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্ম্মান্তিক সুর
"যেতে আমি দিব না তোমায়।" ধরণীর
প্রান্ত হ'তে নীলাভ্রের সর্ব্বপ্রান্ততীর
ধ্বনিতেছে চিরদিন অনাদ্যন্ত রবে
"যেতে নাহি দিব। যেতে নাহি দিব।" সবে
কহে "যেতে নাহি দিব।" তৃণ ক্ষুদ্র অতি

তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী
কহিছেন প্রাণপণে, যেতে নাহি দিব।"
আয়ুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব' নিব'
আঁধারের গ্রাস হ'তে কে টানিছে তারে
কহিতেছে শতবার "যেতে দিব নারে।"
এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্ত্য ছেয়ে
সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন "যেতে নাহি দিব।"—

"বিশ্বনৃত্য", "বসুন্ধরা" প্রভৃতির মধ্যে এমনি সমগ্র প্রাণময়ী প্রকৃতির রসমূর্ত্তি কবি প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আর একটি কবিতামাত্র আমি উদ্ধৃত করিব। "সন্ধ্যা"য় কবি বলিয়াছেন—

গৃহকার্য্য হ'ল সমাপন,
কে ওই গ্রামের বধু ধরি বেড়াখানি
সম্মুখে দেখিছে চাহি, ভাবিছে কি জানি
ধূসর সন্ধ্যায়।
অমনি নিস্তব্ধ প্রাণে
বসুন্ধরা দিবসের কর্ম্ম অবসানে,
দিগন্তের বেড়াটি ধরিয়া, আছে চাহি
দিগন্তের পানে :

* * * *

ধীরে যেন উঠে ভেসে
ম্লান-ছবি ধরণীর নয়ন নিমেষে
কত যুগ যুগান্তের অতীত আভাস
কত জীব জীবনের জীর্ণ ইতিহাস।

যেন মনে পড়ে সেই বাল্য নীহারিকা
তার পরে প্রজ্বলন্ত যৌবনের শিখা
তার পরে স্নিগ্ধ শ্যাম অন্নপূর্ণা লয়ে
জীবধাত্রী জননীর কাজ, বক্ষে লয়ে
লক্ষ কোটী জীব—কত দুঃখ কত ক্লেশ,
কত যুদ্ধ, কত মৃত্যু নাহি তার শেষ,
ক্রমে ঘনতর হ'য়ে নামে অন্ধকার,
গাঢ়তর নীরবতা,—বিশ্ব পরিবার
সুপ্ত নিশ্চেতন। নিঃসঙ্গিনী ধরণীর
বিশাল অন্তর হ'তে উঠে সুগম্ভীর
একটি ব্যথিত প্রশ্ন ক্লিষ্ট ক্লান্ত সুর
শূন্যপানে—"আরো কোথা?" "আরো কতদূর?"

সমগ্র পৃথিবী সমগ্র প্রকৃতির সঙ্গে এখন কবি মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তার প্রাণের গভীরতম কথা যেন তাঁর হৃদয়ে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু ইহাই তাঁর প্রকৃতির পরিচয়ের শেষ স্তর নয়। "নৈবেদ্য" ও "গীতাঞ্জলি"র কবিও প্রকৃতির রূপরসে ভরপুর, সমগ্র প্রকৃতি তাঁর অন্তরে রসের সঞ্চার করিতেছে। কিন্তু সে প্রকৃতি শুধু প্রকৃতি নয়, নিজস্ব একটি প্রাণের অনুভূতিতে তিনি বিভোর নন, এই স্তরে প্রকৃতি ভগবানের রূপ, তার অশেষ রূপলাবণ্যের ভিতর কবি দেখিতেছেন সেই রূপরসের অশেষ সৌন্দর্য্য। "শ্রাবণ ঘন গহন-মোহে" তিনি তাঁর "গোপন চরণ" দেখিতে পান। এখনও—

শালের বনে থেকে থেকে
ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে

জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে
মাঠের পরে
কিন্তু তাহা দেখিয়া কবি ভাবেন—
মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে
নৃত্য কে করে!

গীতাঞ্জলির ছত্রে ছত্রে এই ভাব—প্রকৃতির অপরূপ শোভার অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে সে শোভার উৎসের সন্ধান পাইয়াছেন কবি তাঁর জীবন দেবতার রসে রূপে। তার দৃষ্টান্ত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

কবির হৃদয়ের এই অনুভূতির পর কবির ভিতর আবার নবজীবনের স্পর্শ দেখিতে পাই "বলাকায়"। "নৈবেদ্য", "খেয়া" "গীতাঞ্জলি"তে তাঁর যে জীবন তার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বুঝি কবি বলিয়াছেন,

"চলেছিলাম পূজার ঘরে সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য।
খুঁজি সারা দিনের পরে কোথায় শান্তিস্বর্গ;
এবার আমার হৃদয়ক্ষত ভেবেছিলেম হবে গত
ধুয়ে মলিন চিহ্ন যত হব নিষ্কলঙ্ক।
পথে দেখি ধূলায় নত তোমার মহাশঙ্খ!
আরতি দীপ এই কি জ্বালা, এই কি আমার সন্ধ্যা?
গাঁথবো রক্তজবার মালা? হায় রজনীগন্ধা!
ভেবেছিলাম যোঝা যুঝি মিটিয়ে পাব বিরাম খুঁজি
চুকিয়ে দিয়ে ঋণের পুঁজি লব তোমার অঙ্ক।
হেনকালে ডাকলো বুঝি নীরব তব শঙ্খ॥

কবি ফিরিলেন। যৌবনের পরশমণি আবার তাঁর প্রাণে স্পর্শ করিল, নূতন জীবনের বাণী, প্রাণের বিদ্রোহের বাণী তিনি

শুনাইলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রকৃতির অনুভূতির স্বরূপ বদলাইয়া গেল। এখনও প্রকৃতি তাঁহার চোখে ভগবানের প্রকাশ; কিন্তু শান্তির ভগবান সে নয়—সে কর্ম্মের ভগবান, যুদ্ধের ভগবান। প্রকৃতির ভিতর প্রাণের বিপুল প্রকাশ যে,—

ঝড়ের মাতন! বিজয় কেতন নেড়ে
অট্টহাসে আকাশখানা ফেড়ে

প্রমত্ত হইয়া ছুটিয়া বেড়ায়, তাহাই তাঁর দৃষ্টিকে মুগ্ধ করিল। তিনি আকৃষ্ট হইয়া চাহিলেন হংসবলাকার পানে "ঝঞ্ঝা-মদরসে মত্ত" যাহাদের পাখা—

রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।

প্রকৃতির অনুভূতির দিক দিয়া কবির জীবনের এই ক্রমবিকাশের স্তরের পরিচয় আমরা পাই চারিদিকে।

প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ প্রেমের কবি। প্রেমের অপূর্ব্ব মধুময় অনুভূতির সূক্ষ্ম পর্দ্দাগুলি তিনি এত সুপ্রচুর রসের সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে, তাঁর এই স্তরের কবিতাগুলি প্রতি যুবক যুবতীর একান্ত প্রিয়তম হইয়া চিরদিন বাঁচিয়া রহিবে। কিন্তু প্রেমের খণ্ড খণ্ড সূক্ষ্ম অনুভূতিতেই তাঁর কবিতা পরিনিষ্ঠা লাভ করে নাই। তার একটা বিরাট সমগ্র-মূর্ত্তি তিনি কল্পনা করিয়াছেন—সে কল্পনার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ তাঁর 'উর্ব্বশী'। সকল যুগের সকল প্রিয়া তাঁর দিব্য-দৃষ্টির সম্মুখে সম্মিলিত হইয়া উঠিয়াছে "উর্ব্বশীর" নব কলেবরে, আর সেই বিশ্বপ্রেয়সীর যে অপূর্ব্ব স্তব-গান তিনি গাহিয়াছেন প্রেমের সাহিত্যে তাহা চিরদিন অমর হইয়া থাকিবে।

এই স্তরে তাঁর প্রেম যেমন গভীরতায় তেমনি গৌরবে মহীয়ান হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বে প্রেমের স্থান তাঁর কাছে পরম গৌরবময়—ভগবৎ প্রেমের কাছেও তাকে তিনি খাটো করিয়া দেখিতে পারেন না। তাই "বৈষ্ণব-কবিতা"য় তিনি বলিয়াছেন—

আমাদেরি কুটীর কাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা চরণে
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ। এই প্রেম গীতিহার
গাঁথা হয়ে নরনারী মিলন মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করে, প্রিয়েরে দেবতা।

এখনও তিনি বৈষ্ণব-কবির প্রেমের কবিতার গভীরতর সাধনার অধিকারী নহেন। যেখানে

এ গীত উৎসব মাঝে
শুধু তিনি আর তাঁর ভক্ত নির্জ্জনে বিরাজে ;

সেখানে তিনি "দাঁড়ায়ে বাহির দ্বারে।" কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে তিনি আর বাহির দ্বারে দাঁড়াইয়া নন, অন্তরের মজলিসে তাঁর প্রবেশ ঘটিয়াছে। 'গীতাঞ্জলির' গানে গানে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে সেই বৈষ্ণব কবিতার অন্তরের সুর—তাঁর প্রেম পূর্ণতর গভীরতর পরিণতি লাভ করিয়াছে—দেবতাকে তিনি প্রিয়রূপে লাভ করিয়াছেন। তাঁর এই অপূর্ব্ব

সরস নিবিড় ভগবৎ প্রেমানুভূতির একমাত্র তুলনা আছে বৈষ্ণব কবিতায়, আর কোথাও আছে বলিয়া জানি না।

তাঁর জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ, কবির mission সম্বন্ধে তাঁর আদর্শ, বিভিন্ন স্তরে বিভিন্নরূপে তাঁর চক্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরিণত যৌবনে "পুরস্কার" কবিতায় তাঁর প্রাণের এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন।

ধরণীর তলে, গগনের গায়
সাগরের জলে অরণ্য ছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায়
রঙীন করিয়া দিব।
সংসার মাঝে ছ'য়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
ছ'য়েকটি কাঁটা করি' দিব দূর
তার পরে ছুটি নিব।
সুখ হাসি আরও হবে উজ্জ্বল
সুন্দর হবে নয়নের জল
স্নেহসুধামাখা বাসগৃহতল
আরো আপনার হবে।
প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে
আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভ'রে
আরেকটু স্নেহ শিশুমুখ পরে
শিশিরের মত রবে।
না পারে বুঝাতে আপনি না বুঝে
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে,

কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে
মাগিছে তেমনি সুর ;
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদায়ের আগে দু'চারিটা কথা
রেখে যাব সুমধুর।

শুধু এইটুকু। জগৎ ও জীবনের সুন্দর ও মধুর রূপ ফুটাইয়া তোলা, ইহাই এ স্তরে কবির জীবনের আকাঙ্ক্ষা !

কিন্তু এইটুকুতে তাঁর তৃপ্তি শীঘ্রই লুপ্ত হইয়া গেল। প্রাণের ভিতর একটা আকুল ক্রন্দন ক্রমে ধ্বনিত হইয়া উঠিল, গভীর বেদনার সুরে সেই দিন কবি গাহিলেন, "এবার ফিরাও মোরে।"

"এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে রঙ্গময়ি ! দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর ! ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।

* * *

বলিলেন—

যে দিন জগতে চলে' আসি,
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু খেলাবার বাঁশি।
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হ'য়ে আপনার সুরে
দীর্ঘ দিন দীর্ঘ রাত্রি চলে' গেনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসার সীমা। সে বাঁশীতে শিখেছি যে সুর
তাহারি উল্লাসে যদি গীতশূন্য অবসাদপুর
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সংগীতে

কর্ম্মহীন জীবনের একপ্রান্ত পারি তরঙ্গিতে
শুধু মুহূর্ত্তের তরে, দুঃখ যদি পায় তার ভাষা,
সুপ্তি হ'তে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি, তবে ধন্য হবে মোর গান
শত শত অসন্তোষ, মহাগীতে লভিবে নির্ব্বাণ।

মানবের দুঃখ দৈন্য অবিচারের ব্যথায় জর্জ্জর দুঃখীর দুঃখানুভূতির অশ্রু ও তাহা নিবৃত্ত করিবার আকুল প্রতিজ্ঞাপূর্ণ এই অপূর্ব্ব মধুর কবিতা কবির জীবনের এক মহাসন্ধিস্থলে লিখিত। ইহ তাঁর কবি-জীবনের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার একটা প্রকাণ্ড বিপ্লবের সূচনা করিল। "দু'চারিটি কথা রেখে যাব সুমধুর" বলিয়া কবি আর সংসার হইতে ছুটি লইয়া পরিতৃপ্ত নন। মানবের সেবার একটা বৃহত্তর বিপুলতর আদার্শ তাঁব চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছে— সে আদর্শ তাঁর সাহিত্য-জীবন ও কর্ম্ম-জীবন অশেষ ফলপ্রসূ করিয়া দিয়াছে।

তাঁর জীবনের এমনি আর একটা বৃহৎ সন্ধিস্থল আসিয়াছিল অনেক দিন পরে। কবি তখন পঞ্চাশোর্দ্ধে আপনাকে নিবেদিত করিয়া দেবতাকে নৈবেদ্য ও গীতাঞ্জলি দিতেছেন, জীবন খেয়ার পারের কড়ি সংগ্রহ করিতেছেন। সেই সময়ে তাঁর কাছে আসিল একটা বৃহৎ আহ্বান—নূতনভাবে সাড়া দিয়া তাঁহার বীণা আবার নূতন সুরে অভিনব মূর্চ্ছনায় ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

এতদিন রবীন্দ্রনাথ বরাবরই ছিলেন বাঙ্গালার কবি, বাঙ্গালীর কবি। যাদের সুখদুঃখের কথা অমর সঙ্গীতে গাঁথিয়া রাখিবার জন্য তিনি সাধনা করিয়াছিলেন, নব নব প্রেরণা ও উদ্দীপনা দিয়া তিনি যাঁদের সঞ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তারা

সকলেই বাঙ্গালী। কিন্তু এক শুভ মুহূর্ত্তে কবি ইয়োরোপ যাত্রার অবসরে গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ করিয়া বিশ্বের দরবারে তাঁর সঙ্গীত শুনাইলেন, চারিদিকে জয়ধ্বনি বাজিয়া উঠিল, বাঙ্গলার কবি বিশ্বের দরবারে জয়মাল্য লাভ করিয়া তাঁর জন্মভূমিকে গৌরবান্বিত করিলেন। তখন তিনি অনুভব করিলেন যে তাঁর সেবার আকাঙ্ক্ষা রাখে শুধু বাঙ্গলার মাঠে ঘাটে বা প্রাসাদের বাঙ্গালী নরনারী নয়, বিশ্বের নরনারী। তাদেরও প্রাণের ভাষা, তাদেরও আশা ও আকাঙ্ক্ষা তাঁর কাব্যে ধ্বনিত করিয়া তুলিবার জন্য তারা তাঁর মুখ চাহিয়া আছে।

ইহার পর হইতে রবীন্দ্র-সাহিত্যে যে একটা প্রকাণ্ড রূপান্তর দেখিতে পাই, তার ভিতর তাঁর কবি-জীবনের আদর্শের একটা নূতন বিস্তার, বিশ্বের বিপুল প্রাণের একটা নূতন প্রেরণা ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁর উপন্যাসে, কবিতায়, নাটকে, প্রবন্ধে এই বিশ্বসেবার সুর নানা বিচিত্র রূপে ধরা দিয়াছে।

জীবনে তাঁর সন্ধ্যা আসিয়াছে ভাবিয়া কবি আরতির প্রদীপ জ্বালিয়াছিলেন। এখন দেখিলেন সন্ধ্যা কোথায়? ইয়োরোপের আকাশে সব দিন সূর্য্যাস্তেই তো সন্ধ্যা আসে না—তার পরেও থাকে দীর্ঘ দিবসের আলো, কর্ম্মের প্রচুর অবসর। সেখানে বসিয়া কবি অনুভব করিলেন, আরতির প্রদীপ জ্বালার সময় তাঁর এখনো আসে নাই, তাঁর সম্মুখে আছে অশেষ কাজ। "ফাল্গুনী"তে তিনি জগৎকে শুনাইলেন যে জগতের যে বিরাট বুড়োর ভয় সেটা নিতান্তই ভুল—সে বুড়ো নেই। গাহিলেন

আয় রে তবে, মাত রে সবে আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।

তিনি সবুজকে, কাঁচাকে বরণ করিলেন, জীবনে যৌবনকে নূতন করিয়া উদ্বোধন করিয়া লইলেন।

গীতাঞ্জলির যে সুর, তাহা তাঁর এখনকার জীবনেও লুপ্ত হয় নাই—সে যে লুপ্ত হইবার নহে, কিন্তু তাঁর সেই ভগবৎ প্রেমের ভিতর প্রাণের একটা বিপুল স্পন্দনের অনুভূতি জাগিয়া উঠিয়াছে। অন্ধ বাউলের গানের যে ভগবান তার সঙ্গে গীতাঞ্জলির ভগবানের প্রভেদ আছে। গীতাঞ্জলির ভগবান শান্তির দেবতা, ফাল্গুনীতে তিনি কর্ম্মের দেবতা—এগিয়ে চলার দেবতা। তিনি প্রলয় নাচনে উন্মত্ত নটরাজ।

এই নূতন অনুভূতি, নূতন প্রেরণার ফলে কবির কাব্য নূতন রসে, নূতন অর্ঘে, নূতন প্রাণে পরিপূর্ণ ও সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। এক দিকে তিনি ফাল্গুনী ও বলাকায় প্রাণের মাতনভরা আবেগ-ভরা আনন্দের গান গাহিলেন, "আধমরাদের ঘা দিয়ে" বাঁচাইবার জন্য কোমর বাঁধিলেন, সবুজ পত্রে লেখা গল্প উপন্যাস ও পরবর্ত্তী বহু প্রবন্ধে আমাদের দেশব্যাপী নির্জ্জীব অসাড় প্রাণশূন্যতাকে কঠোর আঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিলেন, আবার অপর দিকে পাশ্চাত্য জগতের সমাজ-সমস্যার নিবিড় বেদনায় পীড়িত হইয়া, সেখানে যন্ত্রদানবের নিষ্পেষণে আনন্দময় প্রাণশক্তির ম্রিয়মাণ অবস্থায় চঞ্চল হইয়া জগৎকে আনন্দ ও মুক্তির বাণী শুনাইলেন 'মুক্ত ধারা'য় 'রক্তকরবী'তে।

তাঁর কবি-জীবনের ভিতর যাহা কিছু শাশ্বত, যাহা কিছু সুন্দর তার কিছুই তাঁর এ অবস্থায় বিলুপ্ত হয় নাই। প্রকৃতির শোভায় তাঁর যে বিভোর আনন্দ তাহা এখনো ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁর সকল কবিতায়, সকল লেখায়। প্রেমের যে বিচিত্র অনুভূতি ও সরস ব্যাখ্যান তাহা এখনও তাঁর লেখনীতে তেমনি

সতেজ ও জীবন্ত আছে—তার সবচেয়ে নূতন ও সুন্দর পরিচয় তাঁর "শেষের কবিতা"। ভগবৎ প্রেমে তাঁর যে তন্ময়তা নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলিতে প্রকাশ, তাহা এখনো পরিপূর্ণ গৌরবে দেদীপ্যমান—কিন্তু সমস্ত আজ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। গৌরবান্বিত হইয়াছে একটা নূতনতর অর্থ ও গভীরতায়, সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে নবীন প্রাণের একটা অপূর্ব্ব স্পন্দনে।

Nothing of him that is lost
But is transformed into Something
rich and grand.

সত্তর বছর বয়সে আজ তাঁর কবি-জীবন, সাহিত্যিক জীবন, ভাবুক জীবন, ভক্ত জীবন সকলই সমৃদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, নূতন ভাবে সঞ্জীবিত হইয়া রহিয়াছে নূতন জীবন প্রেরণায়। তিনি দীর্ঘ জীবন ভরিয়া আমাদের কাছে "নিতুই নব"—নিত্য সুন্দর, নিত্য মহান। কালের গতি তাঁর দেহের শক্তি হয় তো খর্ব্ব করিয়াছে, কিন্তু তাঁর চিত্তের শক্তি গৌরব ও সজীবতা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধই করিয়াছে। বার্দ্ধক্য তাঁর দেহের সিংহদ্বারে আঘাত করিয়া জর্জ্জরিত করিতে পারে, কিন্তু অন্তরের মণিকোঠায় তার জীবনশোষক বিষ এক ফোঁটাও প্রবেশ করাইতে পারে নাই।

বাঙ্গলার পক্ষে, ভারতের পক্ষে, জগতের পক্ষে এটা মহা সৌভাগ্যের কথা। তাই আমরা তাঁর সপ্ততিবর্ষোৎসবে অপরিমিত আনন্দের সহিত যোগদান করিয়া এই সৌভাগ্যের সুদীর্ঘ বিস্তার কায়মনোবাক্যে কামনা করিতেছি।

ভারতবর্ষ—ফাল্গুন ১৩৩৮

॥ কথা-সাহিত্যে শরৎচন্দ্র ॥

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বর্ত্তমানের সাহিত্য। কিন্তু তাঁর চেয়ে অল্প বয়সের অনেক লেখক ও লেখিকা এখন কথা-সাহিত্যে নূতন নূতন সৃষ্টি করিয়া বঙ্গভারতীর অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। এক হিসাবে তাঁহারা তাঁহার পরবর্ত্তী যুগের। তাঁহাদের সকলের মধ্যেই কিছু না কিছু বিচিত্রতা আছে। কার কতটা আছে, কার কি দোষগুণ তাহা হয়তো নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, লক্ষ্যও বোধ হয় আমরা ঠিক করিতে পারি নাই। কিন্তু এই সকল কৃতী সাহিত্যিকের মধ্যে একজন এমন বিশিষ্ট ভাবে মাথা উঁচু করিয়া আছেন এবং এমন স্পষ্টভাবে তিনি কথা-সাহিত্যে বিশিষ্ট নূতন সম্পদ দান করিয়াছেন যে তাঁহার কথা উল্লেখ না করিলে এ প্রবন্ধ গুরুতর অপূর্ণতাদোষে দোষী হইবে। তিনি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শরৎবাবু অনেক উপন্যাস লিখিয়াছেন, আরও অনেক লিখিতেছেন। তাঁহার হাতে যাহা বাহির হইয়াছে তার ভিতর বৈচিত্র আছে। নানাদিক দিয়া তাঁর উপন্যাসের আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। আমি তাঁহার উপন্যাসগুলির একটি দিক মাত্র দেখাইবার চেষ্টা করিব।

ইউরোপে কথা-সাহিত্য Scot, Dickens, Thackeray ছাড়িয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। George Meredith, Henry James, Thomas Hardy, Robert Louis Stevenson, H. G. Wells প্রভৃতি কৃতী লেখক কথা-সাহিত্যে নূতন নূতন পন্থার সৃষ্টি করিয়াছেন। Zola, Guy de Maupassant,

Anatole France, Galetier, Tolstoy, Turgenev, Dostoevsky, Maeterlinck, Ibsen, Bjoursen, Strindberg, Bernard Shaw প্রভৃতি বহু বহু কৃতী লেখক নানা দিক দিয়া কথা ও নাট্য সাহিত্যের বৃদ্ধি ও পরিণতি সম্পাদন করিতেছেন। বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালী কথা-সাহিত্যিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের এই সব নূতন ধারার সঙ্গে সুপরিচিত। তাহাদের কলাবিকাশ, তাহাদের আদর্শ, তাহাদের ভাব প্রেরণা ইঁহাদের ভিতর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করিতেছে। কাজেই আজকার উপন্যাস যে গতযুগের বাংলার উপন্যাস হইতে ভিন্ন হইবে সে আর বিচিত্র কি? কিন্তু বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য সাহিত্য বাংলার সাহিত্যিক-দের উপর ঠিক প্রত্যক্ষভাবে কোনও বিশিষ্ট প্রভাবের চেয়ে পরোক্ষভাবে সমষ্টিভাবেই বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইহার ফলে বর্ত্তমান যুগের বাংলা কথা-সাহিত্য জীবনের সঙ্গে খুব নিবিড়ভাবে পরিচয় করিয়া সাহসের সহিত তাহা প্রকাশ করিতেছে। দেশের ও সমাজের ভিতর যে সকল শক্তি অনুস্যূত থাকিয়া ক্রিয়া করিতেছে সেগুলি বিশিষ্ট অবস্থা ও চরিত্রের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়া একদিকে দেশকে ও মানবকে ভাল করিয়া জানাইবার চেষ্টা করিতেছে এবং অন্যদিকে অল্প-বিস্তর একটা উন্নত আদর্শের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে। ইহা কেবল বাংলা সাহিত্যের নয়, আজকার বিশ্ব-সাহিত্যের একটা বিশেষত্ব। বাংলা কথা-সাহিত্যের সঙ্গে এইরূপ বিশ্বসাহিত্যের একটা অঙ্গাঙ্গিযোগ সাধিত হইয়াছে।

শরৎচন্দ্রের কথার ভিতর পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব কেহই দেখাইতে পারিবে না। তাঁর প্রাণটা খাঁটি বাঙালীর প্রাণ, আর তিনি আঁকিয়াছেন খাঁটি বাঙালীর জীবন। বাঙালী

গৃহস্থ পরিবারের জীবন তাঁর মত আর কেহ আঁকিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না। কিন্তু তিনি শুধু আলো আঁকেন নাই, ছায়াও আঁকিয়াছেন, আর ছায়ার ভিতর আলোর সন্ধান দিয়াছেন। এই হিসাবে তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের শিষ্য যে তিনি তাহাদের নিকট পাইয়াছেন চিত্রাঙ্কনে এক কঠোর সত্যনিষ্ঠা। তিনি আদর্শবাদী নহেন। সমাজকে কোন বিশিষ্ট আদর্শের দিকে পরিচালিত করিবার উদ্দেশ্য লইয়া তিনি কোনও গল্প লেখেন নাই। তাঁর লেখার ভিতর সমাজের আলোচনা আছে, মাঝে মাঝে তীব্র ঝাঁঝাল সমালোচনা আছে; তাঁর কল্পিত মানব চরিত্রের ভিতর হইতে আমরা হয়তো অনেক উপদেশ লাভ করিতে পারি, কিন্তু সে কেবল তাঁর চরিত্র-চিত্রগুলি সত্য বলিয়া। সত্য মানুষের জীবন হইতে আমরা যেমন উপদেশ লাভ করিতে পারি, শরৎ-চন্দ্রের বই হইতে তার চেয়ে বেশী উপদেশ পাই না। বাস্তব জীবনের এই অনাড়ম্বর চিত্র শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের প্রাণ।

এ বিষয়ে তারকনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সাদৃশ্য আছে। শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্র তারকনাথের চেয়ে বিস্তৃত, কেন না তিনি দেখিয়াছেন বেশী, লিখিয়াছেন বেশী; কিন্তু ক্ষেতের মাটি তাঁদের এক—বাঙালীর সমাজ, বাঙালীর জীবন। কিন্তু তারকনাথ যেখানে সেই ক্ষেত চষিয়া, নিপুণ পাচকের হাতে সুমিষ্ট ডাল ভাত তরকারী বঙ্গবাণীর পাতে পরিবেশন করিয়াছেন, শরৎচন্দ্র সেখানে মাটি খুঁড়িয়া বঙ্গভারতীর গলায় রত্নের মালা পরাইয়াছেন। সাধারণ জীবনের ভিতর আমাদের চারিদিকে সাধারণ লোকের ভিতর যে রূপকথারই মত অসাধারণ, অদ্ভুতের উপাদান আছে তাহা তাঁহার মত দিব্যদৃষ্টিতে আর কোনও বাঙ্গালী লেখকই দেখিতে পান নাই। তাঁর ভিতর এই দিব্যদৃষ্টি আছে বলিয়াই

তিনি এই সমুদয় অসাধারণ বিষয়ের তলদেশ পর্য্যন্ত সন্ধান করিয়া তার অন্তরের কথা এমন সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাবে বলিয়া গিয়াছেন যে তাহার ভিতর "স্বর্ণলতার" সরলতার সঙ্গে রূপকথার অলৌকিকত্বের অপূর্ব্ব সমন্বয় হইয়াছে।

শরৎচন্দ্রের ভিতর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সুস্পষ্ট। তাঁর ভাষা তাঁর নিজস্ব, কিন্তু তিনি ইহা আহরণ করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের আবহাওয়ার ভিতর। তাঁর উপাখ্যান রচনা ও বর্ণনার প্রণালীও তাঁর নিজস্ব; তবু তিনি খুব বিশেষ ভাবে রবীন্দ্রনাথের নিকট ভাবের ইতিহাস গাঁথিবার সঙ্কেতটা শিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও তাঁর পাত্র পাত্রীদের মনোভাবকে বিশদ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁর শ্রীকান্তের অনেকটা "নৌকাডুবি" বা "গোরার" মত ভাব বিশ্লেষণপূর্ণ। কিন্তু তিনি এই বিশ্লেষণ এমন ভাবে করিয়াছেন যে তাহাতে তাঁহার বিশেষত্ব প্রতি অক্ষরে সুপরিস্ফুট।

কিন্তু যে প্রকারে তিনি সাধারণ জীবনের ভিতর অসাধারণত্বের উপাদান সন্ধান করিয়া মানুষের স্বাভাবিক অদ্ভুতত্বের পিপাসার সঙ্গে সঙ্গে অলৌকিকের প্রতি অপ্রত্যয়ের যুগপৎ পরিতৃপ্তি সম্পাদন করিয়াছেন সেইটাই শরৎচন্দ্রের সাহিত্য চেষ্টার সবচেয়ে বড় ফল। তাঁহার এই কৃতিত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁর শ্রীকান্ত। ইহার ভাষাও যেমন আড়ম্বরশূন্য হইয়াও শোভা সম্পদে মণ্ডিত, কাহিনীটিও তেমনি সহজ আবেষ্টনে বেষ্টিত হইয়াও অপূর্ব্ব কৌতুহলোদ্দীপক। "শ্রীকান্তের" ভিতরে যে সকল পাত্রপাত্রী আছে তাহারা কেহই আমাদের অপরিচিত নয়, আর যে সব ঘটনা ইহাতে আছে তেমন ঘটনা চারিদিকে ঘটিতেছে, কিন্তু এই অনাড়ম্বর চেষ্টাবিহীন সরল উপাখ্যানের ভিতর সহজভাবে শরৎবাবু

ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত, রাজলক্ষ্মী, অভয়া—ইহাদের প্রত্যেকটির চরিত্রের ভিতর এমন একটা অসাধারণত্ব আছে যাহাতে তাহাদের কাহিনী রূপকথার রাজপুত্রের কথার মতই চমকপ্রদ। ইহার কেহই সাধারণ নয়, প্রত্যেকটিই সাহিত্যের অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

সাধারণের ভিতর অসাধারণ ফুটাইয়া তোলা কেবল শরৎচন্দ্রের নিজস্ব নহে, বর্ত্তমান যুগ-সাহিত্যের এটা একটা সুপরিচিত উপায়। বাংলা সাহিত্যেও, শরৎবাবু বিশেষ খ্যাতি লাভ করিবার পূর্ব্ব হইতেই এমন চেষ্টা দুই চারিটা হইয়াছে। সে সব চেষ্টার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতে হয় শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর "দিদি" ও "শ্যামলী"। কিন্তু শরৎচন্দ্রের ভিতর এই ক্ষমতা এতই প্রখর ও অসাধারণ যে ইহার সুন্দর পরিচয় তাঁর প্রথম লেখা "বড় দিদি" হইতে আজিকার লেখা "দেনা-পাওনা" পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সমান ভাবে ফুটিয়া রহিয়াছে। সহজ ও সাধারণ আবেষ্টনের ভিতর এতগুলি বিশেষ ভাবে দেদীপ্যমান অসাধারণ চরিত্র আর কেহ আঁকিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না। "বিরাজ বৌ" শরৎবাবুর একখানা অনাড়ম্বর সংসার-চিত্র। সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের দৈনিক জীবনের অতি সাধারণ তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া এ গল্প। কিন্তু ইহার ভিতর বিরাজের যে চরিত্র তিনি আঁকিয়াছেন তাহা আগাগোড়া অসাধারণ। অসাধারণ বলিয়া যে আমাদের অপরিচিত তাহা নয়—আমাদের ঘরের কোনেই "বিরাজ বৌ" এর বাস, কিন্তু সেই চির পরিচিতের ভিতর "বিরাজ বৌ" সম্পূর্ণ নূতন, সম্পূর্ণ অসাধারণ। সে হিন্দুর ঘরের মেয়ে, কায়মনোবাক্যে সতী। তবু সে স্বামীর গৃহ হইতে বাহির হইয়া বিলাসী জমীদারের সঙ্গে গৃহত্যাগী হইল। এমন একটা অসম্ভব ব্যাপার যাহার দ্বারা

সম্পূর্ণ সম্ভব হইতে পারে তেমনি করিয়াই বিরাজ বৌকে তিনি আঁকিয়াছেন।

কিরণময়ী ও সাবিত্রী যে অসাধারণ সে কথা আর বলিয়া দিতে হইবে না। তারা দুজনেই ভালবাসে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য ভালবাসা! সাবিত্রীর ভালবাসা কেবল তাহার বাঞ্ছিতকে আপনা হইতে দূরে সরাইতে ব্যস্ত, আপনাকে পরিপূর্ণ রূপে বিলুপ্ত করিয়া তার প্রেমাস্পদের মঙ্গল চেষ্টায় সে ব্যস্ত, অথচ সে সাধারণ পতিপরায়ণা বাঙ্গালীর মেয়ের আদর্শের মত মেরুমজ্জাশূন্য প্রাণী নয়, তার প্রতিটি কথা ও কাজের ভিতর চরিত্রের বল যেন ছুটিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ঠিক তেমনি জোর আছে কিরণময়ীর চরিত্রে। প্রথম হইতেই সে তেজস্বিনী। উপেন্দ্রকে ভালবাসিয়া সে তেজে মন্দা পড়িল, উদ্দাম অশ্ব লাগাম পরিয়া সংসার করিতে লাগিয়া গেল, কিন্তু তার ভিতর জ্বলিতে লাগিল একটা তীব্র প্রেম যার আকাঙ্ক্ষিত একেবারেই অলভ্য বলিয়া সে আগাগোড়াই জানে। তাকে লাভ করিবার চেষ্টাও সে কখনও করে নাই। ইহা হইতে সাধারণ পরিণতি যাহা কিছু হইতে পারে সে সবের ধার দিয়াও এ গল্প যায় নাই। কিরণময়ী উপেন্দ্রকে এত বেশী ভালবাসিত বলিয়াই দিবাকরের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল। কতকটা এমনি বিনোদিনী গৃহত্যাগ করিয়াছিল মহেন্দ্রের সঙ্গে। কিন্তু বিনোদিনীর লক্ষ্য ছিল বেহারী; মহেন্দ্রকে সে বেহারীকে লাভ করিবার উপায় স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। আর কিরণময়ী তেমন কোনও আশা না করিয়া, নিরাশায় না ডুবিয়া কেবল একটা উদ্দাম উন্মত্ততায় দিবাকরকে লইয়া চলিয়া গেল, ভীরু অনিচ্ছুক দিবাকরকে পাপের কালিমায় লেপিয়া দিতে বিধিমতে চেষ্টা করিল—কিরণময়ী উপেন্দ্রকে ভালবাসে বলিয়া।

এই অদ্ভুত ব্যাপার সম্ভব হইয়াছে কেবল কিরণময়ীর অপরূপ চরিত্রের কল্পনায়।

"বিন্দুর ছেলের" বিন্দুটি অসাধারণ, "রামের সুমতির" রাম অসাধারণ, "একাদশী বৈরাগী" অসাধারণ ; শরৎ বাবুর প্রায় সমস্ত গ্রন্থই অসাধারণত্বে বোঝাই। এমন কি বারোয়ারী উপন্যাসের যে কয় পরিচ্ছেদ তিনি লিখিয়াছেন সেই স্থানেই গল্পটা একটা স্বতন্ত্র বিশিষ্টরূপ ধারণ করিয়াছে ও নায়িকার হঠাৎ মেরুমজ্জা গজাইয়া সে অসাধারণ হইয়া উঠিয়াছে।

অদ্ভূত ও সৃষ্টিছাড়ার যে আকাঙ্ক্ষায় কথা সাহিত্যের উৎপত্তি তাহা পরিণতি লাভ করিয়াছে এইরূপ সাহিত্যে যাহার ভিতর অস্বাভাবিক কিছুই নাই, deus ex machina পর্য্যন্ত নাই, নিতান্ত সহজ সাধারণ স্বাভাবিক ঘটনা-পরম্পরায় এ কাহিনী গড়িয়া উঠিবে, কিন্তু সেই ঘটনা-পরম্পরার ফল অনাড়ম্বর সমাজ-চিত্র হইলে চলিবে না। বর্ত্তমান যুগের কথা সাহিত্যিক সম্ভব জগতের ভিতর অসাধারণ ও অলৌকিককে যথাসম্ভব ফুটাইয়া তুলিতে চান : সহজ জীবনের ভিতর রোমান্সের রোমাঞ্চ ঘটাইতে চান, সাধারণ জীবনে অসাধারণের উপাদান আহরণ করিয়া। তার জন্য তাঁরা নিত্য নৈমিত্তিক জীবনকে গভীর ও নিবিড়ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, জীবনের ক্ষেত্র তাঁরা অণুবীক্ষণের দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছেন অন্তরের গভীরতম তলদেশে তাঁহারা ডুবুরী নামাইয়া দিয়াছেন, অন্ধকার মণি কোঠায় আলো জ্বালাইয়া দিয়াছেন।

আলোকে যারা অনভ্যস্ত, তন্দ্রার ঘোরে যারা মশগুল হইয়া আছে, অন্ধকারে যারা বাণিজ্য করে, সবার মধ্যে চেঁচামেচির সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কমলমণির আবির্ভাবে নগেন্দ্রের

অট্টালিকায় যেমন অস্থায়ী বাসিন্দাদের সোরগোল পড়িয়া গিয়াছিল, তেমনি সোরগোল অনেক দিকে পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু এমন তো চিরদিনই হইয়াছে। সত্য যখন আসে সে কোনও দিনই নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আসিতে পারে না। অন্ধকারের রাজ্যে আলোর রেখা যখন দেখা দেয় তখন যে চারিদিকে চেঁচামেচি লাগিয়া যায়, সে যে কেবল আনন্দেরই কলরব এমন নয়, তার ভিতর বেদনারও আর্ত্তনাদ আছে।

আজ বাংলা সাহিত্যের চারিধারে কতক সম্মতির কতক প্রতিবাদের কলরব শোনা যাইতেছে ইহাতেই প্রমাণ করে যে সত্য আসিতেছে,—যে আলোতে অনেকের চোখ ধাঁধিয়া উঠিয়াছে, যে আলো সত্য শিব সুন্দরেরই অপূর্ব্ব দ্যুতি—আর্টের আত্ম-প্রকাশ, জীবনের নববিকাশ।

—নৈহাটী সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ হইতে

॥ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে আমার বন্ধু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। জীবিত থাকিতে তিনি প্রত্নবিদ্‌গণের মধ্যে অগ্রণী বলিয়া অসাধারণ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, সাহিত্যিক মহলে এবং কলিকাতা সমাজের বহু স্তরে প্রচুর সম্মান ও সমাদর লাভ করিয়াছিলেন।

মহেঞ্জোদাড়োর আবিষ্কার করিয়া তিনি ভারতীয় প্রত্নবিদ্যায় একটা বিপুল আলোড়ন আনিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার এই কীর্ত্তির জন্য বাঙালীর গৌরব করিবার অধিকার আছে। যাঁহারা নানাবিধ সাধনার দ্বারা বাঙালীর গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহাকে স্মরণ করা বাঙালীর কর্তব্য।

কিন্তু ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই এই কৃতী পুরুষের স্মৃতি বাঙালীর চিত্তে এত মলিন হইয়া উঠিয়াছে যে, অধিকাংশ বাঙালী হয়ত তাঁহার নামই জানে না। ইহা পরিতাপের বিষয়, কিন্তু ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। যাঁহারা স্মরণের যোগ্য তাঁহাদের তাড়াতাড়ি বিস্মৃত হইবার পটুত্ব আমাদের অসাধারণ।

আমার এই পরলোকগত বন্ধুর বিদ্যার পরিমাণ ও কীর্তির প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করিবার শক্তি আমার নাই—কেন না, প্রত্নতত্ত্বে আমি বিশেষজ্ঞ নই। কিন্তু তিনি আমার পরম বন্ধু ছিলেন। অনেকদিন তাঁহার সঙ্গে থাকিয়াছি, হাসিয়াছি, কাঁদিয়াছি; তাহাতে আমি তাঁহাকে যতখানি জানিয়াছি, তাহার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।

ইংরেজী ১৮৮৭ কি ৮৮ সন।

আমার বাবা বগুড়া হইতে বদলী হইয়া বহরমপুরের ডেপুটি

ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া আসিলেন। তাঁহার বিশেষ পরিচিত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট উমেশচন্দ্র সেনের বাড়িতে তাঁহার সঙ্গে আমি যাইতাম। সেখানে উমেশবাবুর পুত্র আমার সমবয়সী হারাণের সঙ্গে ভাব হইয়াছিল।

প্রায় পাশের বাড়িতেই থাকিতেন উকিল মতিবাবু, রাখালদাসের পিতা।

একটি বিশেষ দর্শনীয় বালক—আমাদের চেয়ে কয়েক বছরের ছোট—মতিবাবুর বাড়ি হইতে বাহির হইত পথে খেলিতে। হারাণের সঙ্গে তাহার ভাব ছিল, তাই আমারও সামান্য একটু পরিচয় হইয়া গেল।

বালকটি দর্শনীয় ছিল প্রধানত তাহার দেহের প্রসারের জন্য। আমি ও হারাণ দুইজনেই ছিলাম রোগা টিনটিনে, তাই এই বিশেষ স্থূলকায় বালকটি বিশেষভাবে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল।

ইহাই ছিল রাখালের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। এই পরিচয় বিশেষ নিবিড় হয় নাই, কেননা, রাখাল ছিল আমাদের চেয়ে বেশ ছোট। ঐ বয়সে বয়সের সামান্য ন্যূনতাও অন্তরঙ্গতার অন্তরায় হয়। তাহা ছাড়া, ইহার পরই আমি কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হইয়া পড়িতে আরম্ভ করি। তাহার পর সাড়ে তিন বৎসর আমি বহরমপুরে ছিলাম, যখন চলিয়া আসিলাম, তখনও রাখাল স্কুলে ভর্তি হয় নাই। বয়সে ছোট, পড়ে কম, স্কুলে পড়েই না যে ছেলে, তাহার সঙ্গে প্রয়োজনমত মুরুব্বিয়ানা করা যায়—বন্ধুত্ব হয় না।

অন্তরঙ্গ না হইবার আরও কারণ ছিল। আমি ঠিক রাখালদের পাড়ায় থাকিতাম না, একটু দূরে থাকিতাম।

পাড়াতেই আমার সঙ্গে মেলামেশা ও খেলাধূলা করিবার অনেক ছেলে ছিল, তাই পাড়া ডিঙাইয়া তাহার সঙ্গে বেশী ভাব করিবার অধিক সম্ভাবনা ছিল না।

আর, আমি এবং রাখাল দুজনেই তখন ঘরের গণ্ডীর বাহিরে বড় যাইতাম না। রাখালেরা বড়লোক, তাহার বাপ প্রতিষ্ঠাবান্ উকিল এবং মাও বড় মানুষের মেয়ে, এ-কথা জানা ছিল। তা ছাড়া, রাখাল ছিল বাপ-মার একমাত্র ছেলে। মায়ের একটু বেশী বয়সে তাহার জন্ম হয়; তাহার জন্য দৈব প্রচেষ্টা ছাড়াও সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাধর কবিরাজের ঔষধের প্রয়োজন হইয়াছিল, এই প্রসিদ্ধি ছিল। কাজেই সে ছিল পিতামাতার নয়নের মণি। এমন ছেলেকে বাড়ির ভিতর বা আশেপাশে পাহারা দিয়া না রাখিয়া যার-তার সঙ্গে মিশিবার সুযোগ দিতে বাপ-মা স্বভাবতই কার্পণ্য করিতেন।

আমিও অনেকটা সেইরকম ছিলাম। বাবা ধনী না হইলেও সে-কালের ডেপুটি ছিলেন। সে-কালে ডেপুটিদের মান-মর্যাদা এত অধিক ছিল যে, সাধারণের সঙ্গে মেলামেশা তাঁহাদের পক্ষে সহজ হইত না। তদুপরি তাহার অল্পকাল পূর্বেই আমার বড় দুই ভাই পর পর মারা যাওয়ায় আমিও তখন বাপ-মার একমাত্র পুত্র। এইসব কারণে আমিও প্রায় রাখালেরই মত যত্ন ও আদরের বেষ্টনীর ভিতর বন্দী ছিলাম। তাই আমাদের দেখা-শোনা হইত কালেভদ্রে।

আমি যখন তখনকার ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি, তখন বাবা বদলী হইয়া আমাকে লইয়া বারাসতে গেলেন। আমাদের সংযোগের যে সূত্রটি ছিল, তাহা সুদৃঢ় হইবার আগেই ছিঁড়িয়া গেল।

বহরমপুর ছাড়িবার পর প্রায় ছয় বৎসর পর্য্যন্ত রাখালের সঙ্গে

আমার যোগাযোগ ছিল না। যখন আমি প্রথম শ্রেণীতে পড়ি, তখন আমার এক পিসতুত ভাই, তিনি বহরমপুর থাকিতেন, মুঙ্গেরে আমাদের বাড়িতে আসেন। আমি পড়ার বই খুব অল্প পড়িতাম, কিন্তু সর্বদাই বাহিরের ইংরেজী ও বাংলা বহু বই পড়িতাম। এই স্বভাব সে-কালের প্রবীণেরা বিশেষ সুনজরে দেখিতেন না। আমার সেই বড় দাদা বলিতেন, “ঠিক রাখালের মত। সেও পড়ার বই পড়তেই চায় না, সব সময় বাইরের বই পড়ে।” এতদিন পরে রাখালের সম্বন্ধে আমি এই সংবাদ পাইলাম।

১৮৯৭ সনে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পর ছুটি পাইয়া আমি বহরমপুরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে তখন আমি ছিলাম রাখালদের পাড়ায়। একদিন রাখাল আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে, বন্ধু ত্রিভঙ্গমোহন সেন তাহাকে আমার কাছে আনিয়া বলিলেন, “তোমার সঙ্গে একটি বপু দেখা করতে এসেছে।” যতক্ষণ সে ছিল ততক্ষণ ত্রিভঙ্গ তাহার দেহের স্থূলতা লইয়া বারংবার বক্রোক্তি করিতে লাগিল। রাখালের সঙ্গে ত্রিভঙ্গের তখন প্রচুর হৃদ্যতা, কিন্তু আমার সঙ্গে তেমন অন্তরঙ্গতা ছিল না। তাই এই সমুদয় বক্রোক্তিতে আমি একটু অস্বস্তি অনুভব করিয়াছিলাম। এই হইল আমাদের পরিচয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়।

তারপর আমি কলিকাতায় পড়িতে আসিলাম। যখন আমি চতুর্থ কি পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি তখন একদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে দেখিলাম রাখালকে। সে যে এখানে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতে আসিবে সে-সংবাদ ত্রিভঙ্গের পত্রে পাইয়াছিলাম, তাই তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলাম। কিন্তু তখন তাহার চেহারার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। তাহার দেহের স্থূলতা তখন আর বেমানান ছিল না। স্থূলকায় সে ছিল, কিন্তু বিশেষ দীর্ঘকায়

হওয়ায় তাহার স্থূলতা দেহের সঙ্গে মানাইয়া গিয়াছিল। দেখিলাম, সে দেখিতে একটি রীতিমত সুপুরুষ হইয়া উঠিয়াছে।

তাহার পর তাহার সঙ্গে খুব বেশী মেলামেশা হইবার অবসর আমার হইত না। আমি তাহার পর অল্পকালই কলেজে ছিলাম এবং তাহার কিছুদিন পরই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ছাত্রনেতা হইয়া হৈ চৈ করিতে ব্যস্ত থাকিতাম। এই আন্দোলনের প্রতি রাখালের সহানুভূতি ছিল না। এবং আমার যতদূর মনে পড়ে, রাখালও পড়াশুনা ছাড়িয়া কিছুকাল কলেজে আসা বন্ধ করেন। শুনিয়াছিলাম, তিনি বখামি করিয়া বেড়ান। পরে খবর জানিয়াছিলাম যে,-তাঁহার জীবনের এই বখামির অবসর-কালে অনেকটা সময় তিনি মিউজিয়ামে কাটাইতেন। সেখানে তিনি ডাঃ ব্লক-এর সহিত কাজ করেন ও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আর্কিওলজি, বিশেষতঃ এপিগ্রাফিতে তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। কিন্তু তাঁহার অনুসন্ধিৎসার খুব দৃঢ় সীমা ছিল না। তিনি ভূতত্ত্ববিদ্ হল্যাণ্ড সাহেবের কাছেও প্যালিওণ্টলজিতে বিশেষ শিক্ষালাভ করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছেও তিনি প্রত্নতত্ত্বের শিক্ষা লাভ করেন।

ইহার পর কখন যে তিনি আবার কলেজের পাঠ আরম্ভ করিয়া শেষ করেন, সে-খবর আমি জানিতাম না। কয়েক বৎসর পরে যখন জানিলাম, তখন তিনি প্রত্নতত্ত্ববিদ্ হিসাবে প্রচুর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন এবং বহু বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন।

এই সময়ে আমি কলিকাতার তাঁহার বাড়ির কতকটা নিকটে আসিয়া বাসা লইয়াছিলাম। তাই তাঁহার সঙ্গে আমার খুব বেশী দেখাশোনা ও ঘনিষ্ঠতা হয়। আমাদের উভয়ের পরিবারের ভিতর

প্রচুর হৃদ্যতা জন্মে। আমার স্ত্রীর সঙ্গে তাঁহার স্ত্রীর, আমার বড় মেয়ের সঙ্গে তাঁহার বড় ছেলের খুব ভাব হয়। ইহারা দুইটিই ইহার কিছুকাল পরে মারা যায়।

এই সময়ে রাখাল একটা তর্কযুদ্ধে নিযুক্ত হন পার্জিটার সাহেবের সঙ্গে। ইহাব কিছু পূর্বে আবিষ্কৃত হয় একটি প্রত্নলেখ, হিটাইট ও মিঠানি রাজ্যের ভিতর একটি সন্ধিপত্র। তাহাতে ইন্দ্র, বরুণ, নাসত্য প্রভৃতি বৈদিক দেবতার নাম উল্লিখিত ছিল। পূর্বপণ্ডিতদের অনেকের মতে ঋগ্বেদের যে কাল নির্দ্দিষ্ট ছিল, এই লেখা তাহার বহু পূর্বে রচিত। তাই জ্যাকবি, ওলডেনবার্গ প্রভৃতি পণ্ডিতদের মধ্যে বেদের কাল লইয়া নূতন তর্ক চলিতেছিল। সে সম্বন্ধে পার্জিটার একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। রাখাল তাহার সুতীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। তারপর পার্জিটার রাখালের উত্তর দেন। রাখালের প্রত্নতত্ত্বালোচনার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি বিরুদ্ধ মতকে মোটে সহ্য করিতে পারিতেন না, তাহার প্রতি ভাষার তীব্রতায় কখনও খর্বতা দেখাইতেন না।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় রাখালের বাড়ি গেলে "কী করছ ?" এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন, "পার্জিটার আমাকে বড় জুতো মেরেছে।" তাঁহার সবচেয়ে বেশী খেদ হইল এই যে, পার্জিটার তাঁহার যে-সব ভুল দেখাইয়াছেন তাহার জবাব নাই। এ-কথা তিনি পরে কোনওখানে স্বীকার করিয়াছেন কিনা, কিংবা পরে কোনও নূতন যুক্তির দ্বারা তাঁহার প্রথম সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন কিনা তাহা আমি জানি না। কিন্তু তাঁহার স্বভাব আমি যতদূর জানি তাহাতে এইসব তর্কে তিনি পরাজয় স্বীকার কখনও সহজে করিতেন না।

এই সময়ে তিনি হঠাৎ উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন এবং

কিছুদিন পরে লিখিলেন বাংলার ইতিহাস। এই গ্রন্থে বাংলার ইতিহাসের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তিনি নিপুণভাবে দিয়াছেন। যত কিছু ঐতিহাসিক গবেষণা সে পর্য্যন্ত হইয়াছিল, শুধু তাহার ধারাবাহিক বিবরণ ছাড়াও নিজের নূতন সিদ্ধান্ত নৃতত্ত্ব ভূতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিজ্ঞান হইতে উপাদান ইহাতে ব্যবহার করিয়াছিলেন। আর প্রত্যেকটি তথ্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিচার করিয়া পুঞ্জীভূত প্রমাণের সহিত উপস্থিত করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষায় এমন তথ্যবহুল ইতিহাস তখনও পর্য্যন্ত কেহ লেখেন নাই। ইহা তাঁহার পাণ্ডিত্য ও গবেষণার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া সর্বজনস্বীকৃত হইয়াছিল।

তাঁহার উপন্যাসগুলি ঐতিহাসিক উপন্যাস। "শশাঙ্ক," "ধর্মপাল," ও "অসীম" বিভিন্ন যুগে বাংলার জীবনের চিত্র।

বাংলা উপন্যাসের আদিযুগ হইতে বহু ঐতিহাসিক উপন্যাস ও নাটক রচিত হইয়াছিল প্রধানত সার ওয়াল্টার স্কটের পন্থা অনুসরণ করিয়া। ইহাতে ইতিহাসের দুই একটি বিবরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করিয়া রচিত হইত সম্পূর্ণ কাল্পনিক কাহিনী। কিন্তু ঐসব গ্রন্থে ঐতিহাসিক তথ্যকে সম্পূর্ণ মর্য্যাদা দেওয়া হইত না এবং প্রাচীনকালের সমসাময়িক সমাজের গঠন ও মনোভাব ঠিক ঐতিহাসিকভাবে নির্ণয় করা হইত বলা যায় না। এবিষয়ে ইংরেজী সাহিত্যেও শেক্সপীয়ার, স্কট প্রভৃতিরও অনেক ত্রুটি ছিল। ইহাদের লক্ষ্য ছিল নিছক রসসৃষ্টি। তাহা করিতে গিয়া সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক বিষয়গুলি অনেক সময় বিকৃত হইত। এই সকল উপন্যাসের ঐতিহাসিক ত্রুটি-বিচ্যুতি লইয়া অনেকে অনুযোগ করিতেন।

রাখালদাসের লক্ষ্য ছিল উপন্যাসের ভিতর দিয়া অতীতের

বাংলার একটা সম্পূর্ণ সত্য চিত্র সৃষ্টি করা। তাই ঐতিহাসিক যে উপাদান তিনি উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা যথোচিতভাবে যাচাই করিয়া লইয়াছেন। ঐতিহাসিক প্রমাণে যাহা পাওয়া যায় তাহাকে বিকৃত করিয়া বা তাহার বিরুদ্ধ কিছু সৃষ্টি করিয়া তিনি উপন্যাসে অনুপ্রবিষ্ট করান নাই।

তাঁহার উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলে অনেকে বিস্ময় ও কেহ কেহ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমার এক বিশিষ্ট সুপণ্ডিত বন্ধুর সঙ্গে আমি তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলে বন্ধুটি ইহা লইয়া অনুযোগ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনার মত গবেষকের কাছে লোকে অনেক নূতন তথ্য প্রতিষ্ঠার আশা রাখে। আপনি আপনার সেই প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র ছাড়িয়া উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করিলেন, এটা পরিতাপের বিষয়। উপন্যাস লিখিবার ঝুড়ি ঝুড়ি লোক আছে, তাহার জন্য আপনার সময় ও শক্তির অপচয় করা অনুচিত।" ইহার পূর্বেই রাখালদাস প্রত্নতত্ত্ব, বিশেষত এপিগ্রাফি ও মুদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া বিশেষ যশ লাভ করিয়াছিলেন।

আমার বন্ধুর বিশ্বাস ছিল যে, উপন্যাস রাম-শ্যাম-যদু যে-কেউ লিখিতে পারে, তাহার জন্য বিশেষ প্রতিভার প্রয়োজন নাই। রাখাল কিন্তু তাঁহার এই অনুযোগ নির্বিবাদে হজম করিলেন না। দীপ্ত কণ্ঠে বলিলেন, "আপনি ম্যাসপেরোর বই পড়িয়াছেন? ইজিপ্টলজিতে তাঁহার তুল্য গবেষক নাই। কিন্তু তিনি তাঁহার গবেষণার ফল একদিকে যেমন ইতিহাস লিখিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তেমনি সে-কালের জীবন লইয়া বহু উপন্যাস লিখিয়াছেন।"

তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, ম্যাসপেরো যেমন ইজিপ্ট সম্বন্ধে

করিয়াছেন, তিনি বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে তেমনি করিবেন। ইতিহাসের অতি সংক্ষিপ্ত উপাদানের ভিত্তিতে কল্পনার সাহায্যে যুগে-যুগে বাংলার লোকজীবনের একটা সত্য প্রতিকৃতি আঁকিবেন।

প্রথমেই রাখালদাসের এই প্রচেষ্টা বাঙালী পাঠককে চমকিত করিয়াছিল। ঐতিহাসিক বহু তথ্যে, যাহার খবর বেশী লোকে জানিত না তাহাতে, উপন্যাসগুলি কতকটা কণ্টকিত হইলেও এই সব উপন্যাস পাঠক সমাজে প্রচুর সমাদর লাভ করিয়াছিল। কিন্তু কয়েক বৎসর পর দেখা গেল, পাঠকের উৎসাহ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। তাঁহার "অসীম" যখন "ভারতবর্ষ"-এ ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হইতেছে, তখন সাহিত্যের সুবিজ্ঞ পরিবেশক ও রাখালের পরম বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় পাঠকের ধৈর্য্যহানির ইঙ্গিত পাইয়া তাঁহাকে "অসীম" এর অসীম দৈর্ঘ্যে ছেদ টানিবার উপদেশ দিলেন।

বিদগ্ধ সমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির বাহিরে পাঠকদের রাখালদাসের উপন্যাস সম্বন্ধে হঠাৎ এই ঔদাসীন্য জন্মিবার এক হেতু হয়ত এই যে, ঐতিহাসিক তথ্যবহুল এই বইগুলি পাঠ করিবার জন্য বিদ্যা ও সংস্কৃতির যে উৎকর্ষ প্রয়োজন, তাহা অধিকাংশ পাঠকের ছিল না। হয়ত বা তাঁহার ভাষার আপেক্ষিক কাঠিন্যও তাহাদের রস গ্রহণে বাধা জন্মাইত। কিন্তু তাহার চেয়ে বড় কারণ হয়ত এই যে, বাঙালী পাঠকের রুচি ও আকাঙ্ক্ষা অতি দ্রুত পরিবর্তন-শীল। তাই আজ যে লেখককে সবাই মাথায় তুলিয়া স্তুতি করিয়া শেষ পায় না, দু'দিন যাইতে না যাইতেই তাহাকে ভুলিয়া যায়। পৃথিবীর সর্বত্রই এই দুর্লক্ষণ আজকাল দেখা যাইতেছে, কিন্তু বাংলা দেশে হয়ত ইহার বিস্তার অনেক বেশী।

এই উপলক্ষে আমার সহিত রাখালের সম্বন্ধের উপর একটু ছায়াপাত হয়।

আমি তখন ঢাকায় ছিলাম। আমার গল্প ও উপন্যাস প্রকাশ প্রায় এই সময় আরম্ভ হয়। সেগুলি আমার সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত-ভাবে জনপ্রিয় হইয়া ওঠে। "ভারতবর্ষ"-এ আমার একখানা উপন্যাস—বোধ হয় "মেঘনাদ"—প্রকাশিত হইবার পর আমি আর একখানি বই ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেই। ধারাবাহিক "অসীম" তখন চলিতেছে। সেটা শেষ হইবার প্রতীক্ষায় আমার বইখানার প্রকাশ কিছুদিন স্থগিত থাকে। হরিদাসবাবু তাই বোধ হয় রাখালকে "অসীম" শেষ করিবার তাড়া দেন।

"অসীম" বন্ধ হইয়া গেল, আমার একটির পর আর একটি উপন্যাস "ভারতবর্ষ"-এ প্রকাশ হইতে লাগিল এবং আমার বইয়ের চাহিদা বাড়িয়া গেল। রাখাল বুঝিলেন যে, আমার বই ছাপিবার তাড়ায় হরিদাসবাবু "অসীম" বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে রাখালের অভিমান আক্রোশে পরিণত হইল এবং প্রধানতঃ আমার উপর আসিয়া পড়িল। তিনি উঠিয়া পড়িয়া আমার লেখার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে লাগিলেন। ইহার পর তাঁহার সঙ্গে দেখা হইলে পর রাখাল বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার বই বন্ধ করিয়া "ভারতবর্ষ" আমার লেখা ছাপিতেছে। ইহার শোধ তিনি তুলিবেন।

এই ব্যাপারে এই সাহিত্যিক দ্বন্দ্বের বাহিরে আমাদের বন্ধুত্ব কিন্তু কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ইহার অনেক বৎসর পর আমারও জনপ্রিয়তা যে লুপ্তপ্রায় হইয়া গেল, সে-কথা জানিবার অবসর তাঁহার হয় নাই।

ইহার পর রাখাল কলিকাতা হইতে বদলী হইয়া পশ্চিমে

পুনায় যান। সেখানে তিনি কী করিতেছেন তাহার কোনও খবর আমি অনেকদিন পাই নাই। আমি ঠিক যখন ঢাকা হইতে ফিরি, তখনও তিনি পশ্চিমে। পরে জানিলাম, তাঁহার বৃহৎ কীর্তির কথা—মহেঞ্জোদাড়ো আবিষ্কার!

জগতের অনেক বৃহৎ আবিষ্কারেরই সূত্রপাত হয় আকস্মিক ঘটনায়। জেম্‌স ওয়াট একটি কেটলির নলে চামচ চাপিয়া ধরিয়া আবিষ্কার করিলেন বাষ্পের শক্তি, গ্যালভ্যানি, ভল্টা, ফ্যারাডে, ফ্রাঙ্কলিন বিদ্যুৎশক্তির যে-সব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সে-সবের সূত্রপাত হইয়াছিল আকস্মিক ঘটনা হইতে। রণ্টজেন এক্স-রে আবিষ্কার করিয়াছিলেন হঠাৎ। আবার, কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারও এক হিসাবে আকস্মিক। ভারতবর্ষে আসিবার নূতন পথ খুঁজিতে গিয়া তিনি পাইলেন আমেরিকা—একটা নূতন পৃথিবী।

সব আবিষ্কারই এক হিসাবে সৌভাগ্যের ফল। সৌভাগ্য আবিষ্কর্তার হাতে আবিষ্কারের সূত্র আনিয়া দেয়, কিন্তু সেই সূত্র ধরিয়া অনুসন্ধান ও আবিষ্কার সম্পূর্ণই প্রতিভা ও সাধনার ফল। রাখালের মহেঞ্জোদাড়ো আবিষ্কারের সুযোগও তেমনি সৌভাগ্যের ফলেই আকস্মিকভাবে তাঁহার হাতে আসিয়াছিল। সেই ভাগ্যদত্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া তিনি যে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণই তাঁহার প্রতিভা ও পরিশ্রমের পুরস্কার।

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা আবিষ্কারের প্রথম সূত্র রাখাল সেখানে যাওয়ার পূর্বেই আসিয়াছিল তাঁহার পূর্ববর্তীর হাতে, হারাপ্পা অঞ্চলে অনুসন্ধান করিবার ফলে। কিন্তু সে-ভদ্রলোক বা তাঁহার সহকর্মীরা সে-সূত্রের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। রাখাল তাঁহার কর্মক্ষেত্রে আসিলে সেইখানে তিনি

কতকগুলি ছোট বড় প্রস্তর দেখিতে পাইলেন। আরও অনুসন্ধানে সে-অঞ্চলে পাইলেন রাশি রাশি সেইরূপ প্রস্তর। তাঁহার পূর্ববর্তী সেগুলি চিনিতে বা তাহাদের ঐতিহাসিক মূল্য বুঝিতে পারেন নাই।

এককালে শুদ্ধ জ্ঞানানুসন্ধিৎসার কৌতূহলে রাখাল মিউজিয়ামে হল্যাণ্ড সাহেবের কাছে জিওলজি ও প্যালিওণ্টলজি শিক্ষা করিয়াছিলেন। সেই শিক্ষার ফলে রাখাল অনায়াসে বুঝিলেন যে, এই প্রস্তরগুলি যে-সে পাথর নয়, নবপ্রস্তর-যুগের মানবের অস্ত্রাদি। এইখানে এতগুলি প্রাগৈতিহাসিক অস্ত্র দেখিয়া তাঁহার কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইল। এস্থানে বহু বহু প্রাচীন যুগে যে মানবের বসতি ছিল, তাহা বুঝিয়া তাহাদের সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ক্রমে যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার স্থির বিশ্বাস হইল যে, শুধু নিওলিথিক মানব নয়, এখানে একটা অতি প্রাচীন সভ্য জাতির বাস ছিল। পরিশেষে মহেঞ্জোদাড়োয় একটা স্তূপ দেখিয়া চিন্তা করিলেন যে, এখানে খনন করিলে সম্ভবতঃ সেই সভ্যতার আরও পরিচয় পাওয়া যাইবে। মার্শাল সাহেব তখন ছিলেন আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে ডিপার্টমেণ্টের বড় কর্তা, তাঁহাকে বুঝাইয়া তিনি সেই ঢিবি কাটাইবার আদেশ লইলেন। খনন আরম্ভ হইল।

যাহা পাওয়া গেল, তাহা তাঁহার সুদূর কল্পনার অতীত। পাওয়া গেল বহু সহস্র বৎসর পুরাতন যুগের ভূয়সী অবিশ্বাস্য কীর্তির নিদর্শন!

তাহার পরে অনেক বৎসর ধরিয়া মহেঞ্জোদাড়োর অনুসন্ধান চলিয়াছে, এখনও চলিতেছে। স্তরে স্তরে ভিন্ন ভিন্ন যুগের

কয়েকটি স্বতন্ত্র গোটা নগর বাহির হইয়াছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইষ্টকনির্মিত গৃহ, স্নানাগার, শস্যের বিরাট গোলা, প্রাকার, পয়োনালী ও তাহার ভিতর নিত্যব্যবহৃত পোড়া মাটির পাত্র, মূর্তি, পাথর-বসান অলঙ্কার প্রভৃতি বাহির হইয়া আজ সহস্র সহস্র বৎসর পরে এই স্থানবাসী এক সমৃদ্ধ সুসভ্য জাতির অস্তিত্ব ও তাহাদের জীবন সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছে। সেই সব সাক্ষ্যের প্রকৃত মর্ম এখনও সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয় নাই, যে-সব প্রত্নলেখ পাওয়া গিয়াছে তাহার পাঠোদ্ধারও এখন পর্য্যন্ত হয় নাই, কিন্তু যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা বিশেষজ্ঞগণের পরম বিস্ময়ের বিষয়।

এ-পর্যন্ত যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহা সবটাই কিংবা অধিকাংশই অবশ্য রাখালদাসের নিজের আবিষ্কার নয়। কতটা যে তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কতটা পরে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা ঠিকভাবে আমার জানা নাই। কিন্তু যে যাহাই আবিষ্কার করিয়া থাকুন, তাহার মূল কৃতিত্ব রাখালদাসের। তাঁহার প্রতিভা ও কর্মকুশলতাই সবটার মূল ভিত্তি।

মহেঞ্জোদাড়োর বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আমার সাধ্যশক্তির অতীত। তাহার প্রয়োজনও নাই। তাহার বিশ্লেষণ স্যার জন মার্শাল রচিত বিরাট গ্রন্থ The Indus Valley Civilization গ্রন্থে আছে। তাহার পরেও অনেক ছোট বড় বই রচনা হইয়াছে। ইহা আবিষ্কারের ফলে প্রত্নভারতের দৃশ্যপটের একটা পর্দা উঠিয়া গিয়াছে; ভারতের অতীত ইতিহাসের কালের সীমা বহু সহস্র বৎসর পিছাইয়া গিয়াছে। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত ও তাহার তথ্যের জ্ঞান বহুপরিমাণে সমৃদ্ধ হইয়াছে। ফলতঃ সেই ইতিহাসের আদি পরিচ্ছেদ নূতন করিয়া লিখিতে হইতেছে। এই বিরাট কর্ম যে একজন বাঙালীর আবিষ্কার তাহাতে বাঙালীর

বিশেষ গর্বের অধিকার আছে। ইহার জন্য সমগ্র বিদ্বৎসমাজের সঙ্গে বাঙালী জাতির রাখালদাসের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতার ঋণ জন্মিয়াছে।

তাঁহার কৃতকর্মের গৌরব ও মর্যাদা সম্বন্ধে রাখালদাস মোটেই অচেতন ছিলেন না। প্রসঙ্গান্তরে কথা কহিতে কহিতে তিনি একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন যে এত বড় আবিষ্কার জগতে রোজ রোজ হয় না, It comes once in an age. কিন্তু সেই একদিন ছাড়া তাঁহাকে কোনওদিন তাঁহার এই বৃহৎ কীর্তির কথা বলিতে শুনি নাই, ইহা লইয়া দম্ভ করিতে কখনও শুনি নাই।

দর্পের তাঁহার অভাব ছিল না। অসামান্য শক্তি ছিল তাঁহার। সে-শক্তি সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন এবং তাহা নিয়তই প্রকাশ হইত তাঁর কর্মে, কথায়। কিন্তু তাহা লইয়া আত্মশ্লাঘা বা দম্ভ করিতে কখনও শুনি নাই।

তাঁর বিদ্যা ও জ্ঞান কেবল ইতিহাসের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ ছিল না। সকল বিষয়ে তাঁর বিপুল অনুসন্ধিৎসা ছিল। আর তাঁর চরিত্রে ছিল না তুষ্টি। কোনও কিছু করিয়াই তিনি মনে করিতেন না, যথেষ্ট করিয়াছি। নিউটনের মত তিনি মনে করিতেন, সম্মুখে বিস্তৃত জ্ঞানবিজ্ঞানের মহাসমুদ্রের কথা—তাহার ভিতর কয়েকটি উপল কুড়াইয়া পরিতৃপ্ত হইতেন না। সর্বদাই নূতন চেষ্টার জন্য আগ্রহশীল হইতেন।

তাঁর জীবনের পরবর্তী কাহিনী বড় মর্মন্তুদ। এত বড় কৃতী, বিদ্বান ও আজন্ম সৌভাগ্যের দুলাল শেষ জীবনে অদৃষ্টের কাছে বড় লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। তাঁর চাকুরি ঘুচাইয়া আর্থিক ও মানসিক দুর্গতি যতটা তিনি ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার চেয়ে বেশী পীড়িত হইয়াছিলেন ভবিষ্যতের কল্পনায়।

শরীর তাঁর একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। যৌবনকালেই তিনি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন, এখন তাহা ও তাহার আনুষঙ্গিক উপদ্রব তাঁহাকে জীর্ণ করিয়া দিল। অকালে তিনি হঠাৎ মারা গেলেন।

দীর্ঘকাল দারুণ রোগ বহন করিয়াও তিনি ছিলেন সদাপ্রফুল্ল ও অসাধারণ পরিশ্রমী। বন্ধুপ্রীতি তাঁর যেমন গভীর, তেমনি বিস্তীর্ণ ছিল। সর্বশ্রেণীর লোকের ভিতর তাঁর বন্ধু ছিল। তিনি ছিলেন, যাহাকে বলে, মজলিসী লোক। তাঁর মাধ্যমে আমার অনেক বন্ধু লাভ হইয়াছিল। তাঁর বাড়ীতে যখনই যাইতাম, তখনই প্রায় দেখিতাম, অনেকগুলি লোক লইয়া মজলিস করিয়া সদালাপে ব্যস্ত।

মাইকেল মধুসূদনের সম্বন্ধে শুনা যায়, তিনি তিন-চারিটি পণ্ডিত দ্বারা বেষ্টিত হইয়া একসঙ্গে তিন চারিখানি গ্রন্থ রচনা করিতেন। এক একজন এক একখানি গ্রন্থ লিখিয়া যাইতেন। এক সময়ে রাখালও তেমনি একাধিক লিপিকার বেষ্টিত হইয়া তাহাদিগকে দিয়া এক সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন বই লেখাইতেন দেখিয়াছি।

তাঁহার চরিত্রের প্রধান লক্ষণ ছিল বলিষ্ঠতা ও প্রদীপ্ত আত্ম-প্রত্যয়। আমার তাহা কখনও ছিল না। তাই একবার রাখাল আমাকে তিরস্কার করিয়া লিখিয়াছিলেন, "Remember, the world does not love a weak man". তাঁহার চরিত্রে ও কর্মে আর যে দোষই থাক, দুর্ব্বলতা কখনও ছিল না।

ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব ছিল সর্বজনস্বীকৃত। তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি যে সর্বদাই নির্ভুল হইত, এ-কথা কেহ বলিবে না, কিন্তু তাঁর মধ্যে একটি জিনিস কখনও ছিল না, গোঁজামিল দিবার চেষ্টা তিনি কখনও করিতেন না, বা রাগ

দ্বেষ দ্বারা তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টি তিনি কখনও সজ্ঞানে বিচলিত হইতে দিতেন না।

আজকাল আমাদের দেশে ইতিহাসকে বিকৃত করিবার একটা বিকট চেষ্টা দেখা দিয়াছে। ইতিহাসবিশারদ একাধিক ব্যক্তি ইতিহাসকে পলিটিক্সের সেবাদাসী করিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে ইতিহাসের নামে সত্য বিকৃত করিতেছেন দেখিতে পাই। তাই আজ মনে পড়ে এই নিদারুণ সত্য ও যুক্তিনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞের কথা। ভাবি, রাখালদাস যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে তিনি কী তীব্র ভর্ৎসনায় ইহাদিগকে কুণ্ঠিত করিতেন।

শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা—১৩৬৪

॥ আশুতোষ ॥

এমন একটা দুর্দ্দিন মানুষের জীবনে আসে যখন মনে হয় যে সব শেষ হইয়া গিয়াছে, আর কোন কিছুর মূল্য নাই ; তখন জীবনটা বহন করাই একটা দুর্ব্বিষহ বোঝা হইয়া দাঁড়ায়। যখন জীবন-সর্বস্ব পুত্র-কন্যা, বা স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যু হয় তখন মনে হয় না যে পৃথিবীতে আর কোনও কিছুর কোনও দরকার আছে বা জীবনটার কোন কিছু মূল্য আছে।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ যখন একটা আকস্মিক অশনিসম্পাতের মতো সমস্ত বঙ্গবাসীকে স্তব্ধ, আড়ষ্ট ও চমকিত করিয়া দিয়াছিল তখন এমনি ভাব হইয়াছিল শত সহস্র বাঙ্গালীর ; শুধু তাদের নয় যাহাদিগকে এই মহাপুরুষ স্থির আশ্রয়ে বঞ্চিত করিয়া অকূল সাগরে ভাসাইয়া গিয়াছেন, তাদেরও নয় যারা চিরদিন তাঁহাকে ছায়ার মত অনুগমন করিয়াই আনন্দ ও গৌরব অনুভব করিয়াছে—কিন্তু এমন হাজার হাজার লোকের মনে এমনই এক বৈরাগ্যের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল যাহারা কোন দিনই স্যার আশুতোষকে সকল ব্যাপারে নির্ব্বিচারে মানিয়া চলিতে পারে নাই, যাহারা তাঁর জীবিতকালে তাঁর সঙ্গে তর্ক ও বিতণ্ডা করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। ঠিক যখন প্রচণ্ড আঘাতের মত আসিয়া সংবাদটা পৌঁছিল তখন অনেকের মনেই এমনি একটা ভাব হইয়াছিল—এত বড় ভয়ানক, এত সর্বনেশে বাংলার এ ক্ষতি !

স্থূলদর্শীরা অনেক সময় বলে মরিলে সবাই সমান হয়। তাহারা চাহিয়া দেখে এ দেহের সমান পরিণতির দিকে। কিন্তু যেটা শ্মশানের চিতায় পুড়িয়া ছাই হইয়া যায় সেটা তো মানুষ নয়। তার পরিণতি দিয়া মানুষের ছোটবড়র বিচার তো কেউ

কোন দিন করে না। মানুষের মধ্যে ছোটবড় তো শরীর দিয়া হয় না—সে হয় তার আত্মার প্রসার দেখিয়া, তার আত্মার আত্মপ্রকাশের পরিমাণ ও বিস্তৃতি দিয়া। এ প্রভেদ মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে যতখানি থাকে, মানুষ মরিলে তার চেয়ে এক ফোঁটাও কম হইয়া যায় না। যে বড় সে জীবনে মরণে সমান বড়। এই যে মহাপুরুষ সেদিন হঠাৎ চিরনিদ্রা আশ্রয় করিয়া সমস্ত বাংলাদেশ ও সমগ্র ভারতময় একটা ব্যথার চমক লাগাইয়া গেলেন, যাঁর চির পরিচিত মুখ একবার শেষ দেখা দেখিবার জন্য সহস্র সহস্র লোক চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিল, অগ্নিতুল্য রাজপথে প্রলয়ের মত তপ্তসূর্য্য মাথায় করিয়া সারাদিন সেই দেহ অনুসরণ করিয়া সমস্ত সহরময় ঘুরিয়া বেড়াইল। ইঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সাধারণ লোকের মৃত্যুর তুলনা করাই চলে না। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় জীবনে যেমন বড় ছিলেন তেমনি বড় হইয়াই মরিয়াছেন।

স্যার আশুতোষের অমর আত্মা আজ কোন মহাসত্যের সম্মুখীন হইয়া কি অপূর্ব জ্ঞান বা শক্তি সঞ্চয় করিতেছে তাহা আমরা জানি না। কিন্তু এই জগতে সে আত্মা যে আজও আমাদের চারিদিক দিয়া আমাদিগকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে ও অভ্রান্ত নির্দ্দেশে আমাদের জাতিকে চরম মঙ্গলের পথে টানিয়া লইয়া চলিতেছে একথা আজ আমাদের শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবার প্রয়োজন আছে। ক্ষুদ্রতম মানুষও বিনা প্রয়োজনে জগতে আসে না। অতি সাধারণ ব্যক্তি তার জীবনের দ্বারা জগতের জীবনের উপর ছোট ছোট ছাপ মারিয়া রাখিয়া যায়। কিন্তু স্যার আশুতোষের মত মহাপুরুষ জীবনের প্রতিদিন জাতীয় জীবনের ভিতর এমনভাবে ব্যাপ্ত হইয়া পড়েন যে সমস্ত জাতি

তাঁর জীবন ও আত্মার ছায়ায় অনুপ্রাণিত হইয়া অগ্রসর হয়। তাঁর আদর্শ, তাঁর প্রেরণা, তাঁর আকাঙ্খা, তাঁর কর্ম ও বাক্যের ভিতর দিয়া আজ সমগ্র জাতির ভিতর অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। স্থূলশরীর ত্যাগ করিয়া তাঁর আত্মা আজ বিরাটরূপে সমস্ত জাতিতে আক্রান্ত হইয়াছে। যতদিন বাঙ্গালী থাকিবে, কালের সহিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, পরিপুষ্ট ও প্রসারিত হইয়া ঐ আত্মা সমস্ত জাতির ভিতর সঞ্চারিত থাকিবে যেমন আজিকার প্রত্যেক বাঙ্গালীর অন্তরের ভিতর জাগ্রত ও ক্রিয়াবান হইয়া রহিয়াছে রাজা রামমোহন রায় বা বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মা।

প্রায় গত বিশবৎসর কাল হইল স্যার আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি ভাইসচ্যান্সেলার থাকুন বা না থাকুন বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই ছিলেন আত্মা, তিনিই ছিলেন প্রাণ, তিনিই ছিলেন বাহু এবং তিনিই ছিলেন বাক্। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইয়াছে বাঙ্গালী জাতির সমগ্র শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়; তারা সকলেই স্যার আশুতোষের শিষ্য, তাঁর আত্মার শক্তিতে তাদের আত্মা উদ্ভাসিত, তাঁর কল্পিত আদর্শেই তাদের জীবন অল্পবিস্তর অনুপ্রাণিত। তাদের যে জীবন তাই আজিকার ও ভবিষ্যতের বাঙ্গালী জীবন—সে জীবনের উপর আশুতোষের অমর আত্মার ছাপ চিরদিন বর্ত্তিবে।

তাহা ছাড়া ভগবানের ইচ্ছায় তিনি যে বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া তুলিয়াছেন তার উপরও তাঁর আত্মার ছাপ পড়িবে। যতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান জীবনধারা বহিতে থাকিবে ততদিন তিনি তার ভিতর জীবিত থাকিবেন। এখনও দীর্ঘকাল ধরিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া তিনি বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ বংশীয়দের

জীবন গড়িয়া তুলিবেন, তাদের ভিতর মহত্তর বৃহত্তর জীবন সৃষ্টি করিতে থাকিবেন।

তাই বলিতেছিলাম স্যার আশুতোষের স্থূলদেহ পঞ্চভূতে মিশিয়াছে কিন্তু তাঁর আত্মা এক বিরাট শরীর ধারণ করিয়া সমগ্র জাতির ভিতর পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে—বাঙ্গালী আজ শ্রদ্ধার সহিত সে আত্মার সান্নিধ্য অনুভব করিয়া তাঁর নির্দেশে জীবন নিয়মিত করিলে চিরকাল জয়যুক্ত হইবে।

(২)

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যখন কলেজে পড়িতেন তখন অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন ও অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া তাঁর খ্যাতি ছিল। পড়া তাঁর বাতিক ছিল এবং তিনি পড়িয়াছিলেন এত বেশী যে অনেক অধ্যাপকের চেয়েও তিনি বেশী জানেন বলিয়া সবার বিশ্বাস ছিল। তখন পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী মৌলিক গবেষণার দ্বারা, জগতের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি বোধহয় এবিষয়ে প্রথম পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রের জটিল নূতন সমস্যাসমূহের সমাধানের চেষ্টা করিয়া পাঠ সমাপ্তির অব্যবহিত পরে তিনি যে সব প্রবন্ধ বিলাতী কাগজে লিখিয়াছিলেন সেই অভ্যাস যদি তিনি বরাবর অনন্যমনা হইয়া চালাইতে পারিতেন তবে তিনি জগতের পণ্ডিত সমাজে যে প্রকাণ্ড একটা স্থায়ী নাম রাখিয়া যাইতে পারিতেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তখনকার ডিরেক্টর স্যার অ্যালফ্রেড ক্রফ্ট তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া শিক্ষা বিভাগে একটি চাকুরী দিতে চাহিলেন। তখন শিক্ষাবিভাগে সাদা কালোর জাতিভেদ পাকা রকমে হইয়া

গিয়াছে। আশুতোষ চাহিলেন সাহেবদের গ্রেডের চাকুরী। স্যার অ্যালফ্রেড্ বলিলেন ভবিষ্যতে তিনি তাহা পাইতে পারেন কিন্তু প্রথমে তাঁহাকে আরম্ভ করিতে হইবে বাঙ্গালীর গ্রেডে। আশুতোষ তাঁর ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্বন্ধে একটা সন্তোষজনক প্রতিশ্রুতি চাহিলেন, কিন্তু ক্রফ্‌ট সাহেব কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারিলেন না। আশুতোষের এক মুহূর্ত্তও ভাবিতে হইল না, তিনি অসঙ্কোচে ক্রফ্‌ট সাহেবকে বলিয়া আসিলেন—"এ চাকুরী আমি করিব না।" ক্রফ্‌ট সাহেব অবাক হইলেন। তাঁহাকে যে সর্ত্তে চাকুরী দেওয়ার প্রস্তাব তিনি করিয়া ছিলেন সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আগত যে কোনও যুবক তাহাতে সম্মানিত ও অনুগৃহীত হইবে বলিয়া তাঁর বিশ্বাস ছিল। অথচ এ যুবক ভাবিল না, চিন্তা করিল না, কাহারও কাছে পরামর্শ চাহিল না, অনায়াসে সে অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া আসিল।

শিক্ষক হইয়াই আশুতোষ জন্মিয়াছিলেন। শিক্ষাদানের অসাধারণ শক্তি তাঁর ছিল। কিন্তু কেবল সাদা-কালোর অলঙ্ঘ্য প্রভেদের জন্য আশুতোষ তাঁর এই সহজ শক্তি ও আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ ব্যবসায় গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তাঁর ভিতর যে অনমনীয় তেজ ছিল তাহা এই বর্ণের কৌলিন্য স্বীকার করিতে পারিল না। কাজেই তিনি হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করিলেন। তবু চিরদিন জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে জাগরুক ছিল। তাই ওকালতি করিয়াও তিনি মৌলিক গবেষণা ও অধ্যয়ন বজায় রাখিয়াছিলেন। যতই পসার বাড়িয়া গেল ততই গবেষণার শক্তি ও অবসর কমিয়া আসিতে লাগিল। এবং শেষে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে এতবড় বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রের সন্ধান পাইলেন, তাঁর চোখের সম্মুখে

সমস্ত জাতির অভ্যুদয়ের জন্য এতবড় একটা কাজের দায়িত্ব তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল যে গবেষণার দ্বারা কৃতিত্ব লাভের সমস্ত চেষ্টা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া তিনি তাঁর দেশবাসীর জন্য চিরকালের জন্য উন্নত প্রণালীর গবেষণার স্থায়ী অবসর সৃষ্টি করিতে আত্মনিয়োগ করিলেন। এ কার্য্যে যে তিনি কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছেন তাহা আজ আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। বঙ্গদেশে যে আজ শত শত ব্যক্তি মৌলিক গবেষণার উপযুক্ত অবসর পাইয়া নিত্য নূতন আবিষ্কারের দ্বারা বিজ্ঞান জগতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে পরিচিত ও গৌরবান্বিত করিতেছেন তার কৃতিত্বের একটা প্রকাণ্ড অংশ যে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের তা কে না জানে।

এই সব পণ্ডিতদিগকে গবেষণার অবসর দিবার জন্য যে স্যার আশুতোষকে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, কতরকম উপায় উদ্ভাবন করিয়া টাকার যোগাড় করিতে হইয়াছে, সেই বাহ্যিক ইতিহাস আজ সকলের কাছে পরিচিত। কিন্তু ইহার ভিতরে যে স্যার আশুতোষের কতবড় একটা বেদনা, কতবড় প্রকাণ্ড একটা স্বার্থত্যাগ আছে, সেকথা খুব অল্পলোকেই অনুমান করিতে পারে। তাঁর নিজের বিদ্যানু-শীলনের যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল এমন কাহারও থাকে না, মৌলিক গবেষণার দ্বারা নানা বিষয়ে স্থায়ী কৃতিত্বলাভ করিবার শক্তিও তাঁর মত কম লোকেরই হইয়া থাকে। স্যার আশুতোষ যদি দেশবাসীর এই সুযোগ সৃষ্টি করিবার বিরাট আয়োজনে মনোনিবেশ না করিয়া, কেবল নিজের আশ মিটাইবার গবেষণা করিয়া যাইতেন তবে তার প্রাণের একটা বড় আকাঙ্ক্ষা মিটিত। দেশের সুধীবৃন্দের একটা স্থায়ী উপকার করিবার চেষ্টায় তাঁর এই

আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করিয়া তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বিভাগ পরিস্ফুট করিবার জন্য অক্লান্তভাবে লাগিতে হইয়াছিল। এজন্য যে তাঁর মনে একটা ব্যথা ছিল, আর ইহা যে তাঁর একটা বিরাট ত্যাগ স্বীকারের ফল সেকথা তিনি একবার মাত্র বড় দুঃখে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। তার সমালোচকদের উত্তরে তিনি একবার বলিয়াছিলেন ঃ—

Plans and Schemes to heighten the efficiency of the university have been the subject of my day-dreams··············They have haunted me in the hours of nightly rest. To university concerns I have sacrificed all chances of study and research, possibly, to some extent, the interests of my family and friends and certainly, I regret to say, good part of my health and vitality.

অক্লান্তকর্ম্মী আশুতোষ, তেজস্বী মহাপণ্ডিত আশুতোষ, অশেষ কীর্ত্তিমান আশুতোষের নানা অদ্ভুত কীর্ত্তির কথা চিরদিনই লোকে নানা ছন্দে গাহিবে। কিন্তু বিশ্বের পণ্ডিত সমাজে নিজের চিরস্থায়ী যশের নিশ্চয় সম্ভাবনা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া তাঁর দেশবাসীর সকল পণ্ডিতের সেই যশ অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করিবার জন্য অক্লান্ত অধ্যবসায়ের ভিতর যে সুমহান সুকরুণ ত্যাগ ও আত্মবিলুপ্তি আছে এই ত্যাগের স্মৃতিই আমার চিত্তে তাঁর সকল মহীয়সী স্মৃতির শিরোমণি হইয়া থাকিবে। দধিচি আপনার অস্থি দিয়া দেবগণকে অজেয় করিয়া গিয়াছিলেন, স্যার আশুতোষ তাঁর প্রিয় জন্মভূমির অক্ষয় যশের জন্য আপনার পঞ্জরাস্থির চেয়ে অধিক প্রিয় বিশ্ব বিজ্ঞান পরিষদে অক্ষয় যশের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। স্যার আশুতোষকে বিশ্বের

বিজ্ঞান পরিষদে কেহ বেশীদিন স্মরণ করিবেন না, কিন্তু বাঙালীর অন্তরমন্দিরে তাঁর এই ত্যাগ চিরদিন অক্ষয় প্রীতির এক মহা সৌধ গড়িয়া তুলিবে।

(৩)

যখন আশুতোষ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন তখন তিনি পলিটিক্সে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন। সে ছিল বাঙ্গালীর জাতীয় জাগরণের প্রথম উচ্ছ্বাসের দিন। তখন সুরেন্দ্রনাথ তাঁর তরুণ জীবনের অপূর্ব্ব উন্মাদনাময়ী বাগ্মিতার দ্বারা বাংলার ও কতক অংশে সমগ্র ভারতের যুবক সম্প্রদায়কে তাড়াইয়া মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া দলে দলে যুবকগণ দেশের সেবার জন্য আত্মনিয়োগ করিতে সঙ্কল্প করিতেছিল। যে সকল দেশবিশ্রুত-কীর্ত্তি-ব্যক্তি সুরেন্দ্রনাথের পদপ্রান্তে দেশ সেবার মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন তার মধ্যে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেয়ে অধিক কৃতী ও অধিক শক্তি সম্পন্ন কেহই ছিলেন না। এই সময়ে হঠাৎ সুরেন্দ্রনাথকে হাইকোর্টে একটা মামলায় ফেলিয়া জেলে পাঠান হয়। সুরেন্দ্রনাথের সেই স্মরণীয় বিচার ও শাস্তির সময় যুবক সমাজে এক প্রচণ্ড আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। ছাত্রের দল ভয়ানক ভীড় করিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে হাইকোর্টে বিচারের প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহাদের চিরপ্রিয় সুরেন্দ্রনাথের নির্য্যাতন আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত যুবকগণ কোনও কিছুই গ্রাহ্য করে নাই, হাইকোর্টে পুলিশ সার্জ্জেণ্টের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষেও কুণ্ঠিত হয় নাই।

যাহারা তাহাদের দেশপ্রিয় নায়কের নির্য্যাতনে ব্যথিত হইয়া নিজেদের সুখশান্তির চিন্তা পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছিল, সেই

মহাপ্রাণ যুবকদের মধ্যে একজন অগ্রণী ছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

ইহার পর একদিকে আইন ব্যবসায় ও অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের চাপে পড়িয়া আশুতোষ অনেকদিন পলিটিক্সের ক্ষেত্রে কার্য্য করিবার অবসর পান নাই। কংগ্রেস কনফারেন্সে তিনি কখনও যাইতেন না, কোন রাজনৈতিক সভার বক্তৃতমঞ্চে তাঁহাকে দেখা যায় নাই কিন্তু যখন লর্ড কার্জ্জন ভারতের ভাগ্য নিয়ন্তা সেই সময় হঠাৎ আবার আশুতোষ রাজনীতিক্ষেত্রে অল্পকালের জন্য দেখা দিয়াছিলেন। অনায়াসে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করিয়া তিনি ভারতবর্ষ ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। সেই সময় মহামতি গোখলে বোম্বাই প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া আসেন। গোখলের তখন যশ সুপ্রতিষ্ঠিত। আশুতোষ হঠাৎ পলিটিক্সের আসরে অবতীর্ণ হইয়া এই প্রধান মহারথীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সে সময়ের কাউন্সিলে গোখলে ব্যতীত আর কেহই তাঁহার তুল্য কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই তাহা সকলেই জানে।

এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত লর্ড কার্জনের সুবিখ্যাত বিধি ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করা হয়। এই বিধি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার প্রতিকূল এবং ইহার দ্বারা উচ্চশিক্ষা সঙ্কুচিত করিবার আয়োজন হইবে বলিয়া অনেকে সন্দেহ করেন। মহামতি গোখলের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আশুতোষ এই বিধির অনিষ্টকর প্রস্তাবগুলির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং সেসব সংশোধনের জন্য প্রবল চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার অসামান্য কৃতিত্ব এত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল যে গুণগ্রাহী লর্ড কার্জন সে কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই এবং কতকটা এই সভায় তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়াতেই তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। তাঁর মত গভর্ণমেণ্টের তীব্র সমালোচককে এই উচ্চপদে নিয়োগ করিয়াছেন বলিয়া লর্ড কার্জন ইহার পর এক বক্তৃতায় তাঁর নিরপেক্ষতার জন্য প্রশংসার দাবী করিয়াছিলেন।

আজ বাংলার পলিটিক্সের মহাসন্ধির দিনে তিনি বিচারকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সহজ নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে বঙ্গবাসীকে পরিচালনা করিবেন এমনি আশা বঙ্গবাসী করিয়াছিল—সে আশায় হঠাৎ ছাই পড়িয়া গিয়াছে।

(৪)

বিচারক সূক্ষ্মদর্শী ব্যবহারজ্ঞ বলিয়া স্যার আশুতোষ যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন তাহা এত সুপরিচিত যে সে সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার অবসর নাই। দীর্ঘকাল, তিনি বাংলার প্রধান ধর্মাধিকরণে ব্যবহার দর্শন করিয়া এই সে দিন অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি যে অসাধারণ খ্যাতি প্রতিপত্তি ও ব্যবহারজীবী সকলের কাছে যে শ্রদ্ধা ও প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন তাহা খুব অল্প বিচারকের ভাগ্যেই ঘটে।

স্যার আশুতোষ যে সময়ে বিচারক নিযুক্ত হইয়াছিলেন সে সময়ে দেশের আইনকানুন নানা ব্যবহার বিধিতে এবং নানা নজীরে লিপিবদ্ধ হইয়া এত সুনিরূপিত হইয়া গিয়াছিল যে কেবল মাত্র সেই সুনির্দ্দিষ্ট আইন উপস্থিত ব্যবহারে প্রয়োগ করা ভিন্ন আইনের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নূতন বিধি প্রণয়নের অবসর বিচারকদের বড় ছিল না। তাই বিলাতের লর্ড ম্যান্সফিল্ড বা

লর্ড হোস্টের মত কিম্বা আমাদের দেশের দ্বারকানাথ মিত্র বা মুখুস্বামী আইয়ার প্রভৃতির মত আইনের মৌলিক বিধি আলোচনা করিয়া তার সুনিপুণ প্রয়োগ দ্বারা চিরস্থায়ী খ্যাতি বা প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিবার অবসর তাঁর খুব বিস্তীর্ণ ছিল না। কিন্তু তাঁর অসাধারণ শক্তি এত আইন নজীরের বাড়াবাড়ির ভিতরেও আপনাকে প্রকাশ করিবার ক্ষেত্র খুঁজিয়া পাইয়াছিল।

প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্যার আশুতোষ কোনও দিন কেবলমাত্র মোকদ্দমার নিষ্পত্তির দিকে নজর রাখিয়া রায় লেখেন নাই। আইনের তর্ক উপস্থিত হইলে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া এমন ভাবে তিনি রায় লিখিতে চেষ্টা করিতেন যাহাতে সে আইনের তর্কের চিরদিনের মত নিষ্পত্তি হইয়া যায়। মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে তাঁর অসাধারণ শক্তি ছিল, কিন্তু তিনি আইনের তর্কের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও বিচারের অবসর পাইলে তাহাতে তাঁর অসাধারণ ধী-শক্তি প্রয়োগের অবসর লাভে ঠিক তেমনই আনন্দ লাভ করিতেন যেমন আনন্দ তিনি পাইতেন অঙ্ক শাস্ত্রের কোন জটিল সমস্যার সমাধানে।

এক সময়ে আমি আইন সংক্রান্ত সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরে কাজ করিতাম। তখন আমরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ স্যার আশুতোষের অনন্য দুইটি করিয়া রায় ছাপিতাম। অনেকে ইহাতে আমাদিগকে স্যার আশুতোষের প্রতি অন্যায় পক্ষপাতের অভিযোগ করিতেন। কিন্তু আমরা জানি যে স্যার আশুতোষ যে বিপুল পরিমাণে ভাল ভাল নজীরের সৃষ্টি করিতেছিলেন তাহাতে সপ্তাহে দুইটি নজীর ছাপিয়াও আমরা সবগুলি নিঃশেষ করিয়া উঠিতে পারিতাম না।

ইহা হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে যে স্যার আশুতোষ

তাঁর দীর্ঘকাল জজিয়তীতে যে সব নজীর সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যে যে ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ আইন জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন তার খুব সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গেলেও একটি মহাভারত লিখিতে হইবে। গত বিশ বৎসরের মধ্যে প্রিভিকাউন্সিল ও ভারতের সকল হাইকোর্টের যতগুলি নজীর প্রকাশিত হইয়াছে তার মধ্যে পরিমাণের দিক দিয়াই দেখ আর উৎকর্ষের দিক দিয়াই দেখ, স্যার আশুতোষের প্রণীত নজীর অন্য সকল নজীরের অন্ততঃ সমান দেখিতে পাওয়া যাইবে, আর তার মধ্যে খুব বেশীর ভাগ রায়ই আইনের নানা প্রশ্নের বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা পূর্ণ এক বিরাট প্রবন্ধ বিশেষ। স্যার আশুতোষের রায়ের প্রধান বিশেষত্ব এই যে তিনিও কখনও কেবলমাত্র পুরাতন নজীর অনুসরণ করিয়া যাইতেন না। কোন আইনঘটিত সমস্যা উপস্থিত হইলে তিনি মৌলিক তথ্যগুলি অনুশীলন করিয়া তাহা হইতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার বিশিষ্ট তথ্য নিষ্পন্ন করিবার চেষ্টা করিতেন।

নজীর অনুসারে বিচার করা বৃটিশ বিচার পদ্ধতির বিশেষত্ব। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় নজীরই আইনের প্রধান মূল। সেখানকার ইতিহাসে ইতিপূর্বে এমন এক সময় আসিয়াছিল যখন বিচারকেরা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে পূর্ব্ব প্রণীত নজীরের অনুসরণ করিয়া মোকদ্দমার বিচার করিতেন। পক্ষান্তরে ফ্রান্স জার্মাণী প্রভৃতি দেশে বিচারকেরা নজীর মানিতে বাধ্য নন। তাঁরা প্রত্যেকে মোকদ্দমার বিচার করেন আইনের মূল সূত্রগুলির বৈজ্ঞানিক আলোচনার দ্বারা। নজীরের ভারে পীড়িত ইংল্যাণ্ডীয় ব্যবহার শাস্ত্রে সেইজন্য কোনদিনই মূলতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক অনুশীলন ফ্রান্স জার্মাণীর মত বেশী পরিমাণে হয় নাই। কিন্তু কিছু-দিন হইল ইংল্যাণ্ডে নজীরের চেয়ে শাস্ত্রের আলোচনা বেশী

আরম্ভ হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বিচারকেরাও নজীরের দাসত্ব কতক পরিমাণে পরিত্যাগ করিয়া মূল তত্ত্বের অনুশীলনে অধিক মনোযোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমেরিকা এই বিষয়ে ইংল্যাণ্ডের চেয়ে অনেকটা বেশী অগ্রসর হইয়াছে। আমেরিকার বিচারকদের আধুনিক রায়গুলি দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁরা নজীরের ভিতর মৌলিক তত্ত্বগুলির বিশ্লেষণ ও তাহাদের গুরুত্ব নিরূপণ করিবার প্রয়োগেই অধিক যত্নবান, নজীরের কথা-গুলি মাছিমারা কেরাণীর মত নকল করিয়া যাইবার আগ্রহ তাঁদের তত নাই। আমাদের দেশে স্যার আশুতোষই সর্বপ্রথমে আমেরিকার নজীর আমদানী করেন। উকীল থাকিতে তিনি আমেরিকার নজীর পাঠ করিতে আরম্ভ করেন এবং বিচারক হইয়া তিনি আমেরিকার নজীরে তার রায় বোঝাই করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমেরিকার নজীরের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিশেষ ভাবে পাইয়াছিলেন আমেরিকার বর্ত্তমান যুগের বিচারকের মত নজীরের প্রতি এই বিশেষ ভাবটা। তিনি নজীরের কথার ভিতর দিয়া তার অন্তর্নিহিত তথ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেন এবং সেই তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া অনেক সময় নজীরের কথাগুলি পাশ কাটাইযা যাইতেন।

যেখানে স্যার আশুতোষের মনে হইয়াছে যে আইনের মৌলিকবিধি অনুসারে একরূপ সিদ্ধান্ত হওয়া উচিৎ সেখানে কোনও দিনই তিনি বিরুদ্ধ নজীর আছে বলিয়া বিচলিত হন নাই। আমার একটি মোকদ্দমায় আমি যে কথা বলিতেছিলাম তার বিরুদ্ধে তিনটি নজীর ছিল, আমার স্বপক্ষে একটি নজীরও ছিল না। আমি আমার বক্তৃতার আরম্ভের সময়েই সেই কথা বলিয়া লইয়াছিলাম। মামলাটি ছিল অত্যন্ত ছোট, ভায়েদাদ, বোধ

হয় পঞ্চাশ ষাট টাকার অধিক হইবে না। অনেক বিচারক হয়তো এস্থলে আর বিচার না করিয়াই নির্ব্বিবাদে পূর্ব্ব নজীর অনুসারে নিষ্পত্তি করিয়া হাঙ্গামার হাত হইতে উদ্ধার পাইতেন। কিন্তু আমি যখন বলিলাম যে নজীর আমার বিপক্ষে হইলেও যুক্তি আমার স্বপক্ষে এবং মূল সূত্র অবলম্বন করিয়া তর্ক উপস্থিত করিলাম। তখন স্যার আশুতোষ তৎক্ষণাৎ উৎকীর্ণ হইয়া আমার যুক্তির আলোচনা শুনিলেন। আমি তখন সামান্য জুনিয়র, অপর পক্ষে ছিলেন বিচক্ষণ বহুদর্শী একজন স্বনামখ্যাত উকীল। তথাপি স্যার আশুতোষ আমার যুক্তিমূলে পূর্ব্বনজীরগুলি উপেক্ষা করিয়া আমার স্বপক্ষে রায় দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিলেন না।

এই ঘটনাটি একাধিক বিষয়ে স্যার আশুতোষের বিচার পদ্ধতির নমুনা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তাঁর সর্বদা আগ্রহ ছিল আইন ও নজীরকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার ; সেইজন্য তিনি principle কে বরাবর নজীরের উপরে স্থান দিতেন। আর একটা বিশেষত্ব তার এই ছিল যে যুক্তির সারবত্বাই তাঁর কাছে বিবেচ্য ছিল ; উকীলের খ্যাতির তারতম্যে যুক্তির ওজন তাঁর কাছে বাড়িত কমিত না। সেইজন্য স্যার আশুতোষের কাছে নূতন উকীলেরা চিরদিনই সাহস ও প্রতিপত্তির সহিত কাজ করিতে পারিয়াছে।

স্যার আশুতোষ একদিনের জন্যও বিস্মৃত হন নাই, যে বৃটিশ পদ্ধতিতে বিচারককে শুধু বিচার করিতে হয় না। অবস্থা বিশেষে তাঁহাকে নূতন আইন প্রণয়ণ করিতে হয়। নজীরের মধ্য দিয়া তিনি অনেক নূতন আইন বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যে সব বিধি তিনি প্রণয়ণ করিয়াছেন তার সবগুলিই যে অভ্রান্ত বা পরিপূর্ণরূপে বিচারসহ এমন অন্যায় দাবী কেউ কোনদিন করিবে

না। কিন্তু একথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে এই সব বিধি প্রণয়ণ করিতে তিনি সর্বথা সকল সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া বর্ত্তমান যুগের আবেষ্টন ও প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিধির ব্যবস্থা করিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা তাঁর এই উদার দৃষ্টির পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব। তাঁর তিনটি সুপরিচিত নজীরের দ্বারা তিনি ইহা স্থির করিয়া গিয়াছেন যে আবশ্যকীয় ধর্মকার্য্যের জন্য পুরোহিত নিয়োগে প্রত্যেক হিন্দুর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। আমি এ স্থানের বা এ গ্রামের পুরোহিত, সুতরাং আমার দ্বারাই তোমার এখানকার পূজাকার্য্য করিতে হইবে, কোনও পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ বা পতিত ব্রাহ্মণের এ দাবী আইনসঙ্গত নয় বলিয়া তিনি নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রের কথার মারপ্যাঁচ ধরিয়া একথা বলা যাইতে পারে যে নিবন্ধ গ্রন্থেতে হয়তো এর বিপরীত ব্যবস্থা আছে—যদি, সে ব্যবস্থা খুব পরিষ্কাররূপে দেখা যায় না। কিন্তু নিবন্ধগ্রন্থে যদি এমন কথা থাকেও তথাপি তাহা বর্ত্তমান সমাজের উপযোগী নয় এবং আজকালকার সমাজ সে বিধি অতিক্রম করিয়াছে। এই সত্য স্মরণ করিয়া স্যার আশুতোষ এ আইন বিধিবদ্ধ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

বিচার কার্য্যে তিনি বহুস্থানে তাঁর নির্ভীকতা ও স্বাধীন-চিত্তের পরিচয় দিয়াছেন। তাহার অনেক দৃষ্টান্তই আছে। কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে সুপ্রসিদ্ধ ডুমরাওন রাজের ডিক্রীজারীদের মামলা। মহারাজ কেশো-প্রসাদ নিম্ন আদালতে ডিক্রী পাইলে সেই ডিক্রীর বিরুদ্ধে অপর পক্ষ হাইকোর্টে আপীল করেন এবং আপীলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ডিক্রীজারী রদ করিবার প্রার্থনা করেন। আদালতের চিরন্তন প্রথানুসারে ডিক্রীজারী রদ করিতে হইলে দরখাস্তকারীর

জামীন দিতে হয়। এই মোকদ্দমায় অপরপক্ষের অন্য সম্পত্তি না থাকায় জামীনের কথা সঙ্গীন হইয়া উঠে। "কোর্ট অব ওয়ার্ডস" এর অধীনে এই সম্পত্তি তখন ছিল। "কোর্ট অব ওয়ার্ডস" এর পক্ষ হইতে "সেক্রেটারী অফ স্টেটের" জামানত নামা দাখিল করিবার প্রস্তাব হয় যে আবশ্যক হইলে ডিক্রীর খরচার টাকা ভারত সরকারের নিকট হইতে আদায় করা যাইবে। কেশোপ্রসাদের পক্ষ বলেন যে –"সেক্রেটারী অফ স্টেটের" এমন কোন জামানতনামা দিবার অধিকার নাই এবং সেজন্য এমন জামানত নামার কোন মূল্যই নাই। সরকার অথবা "কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের" পক্ষ হইতে ভারত সচিবের পক্ষে এমন অসম্মানকর কথায় ভয়ানক আপত্তি করা হয়। কিন্তু স্যার আশুতোষ পরিপূর্ণ ও প্রশান্ত নির্ভয়ের সহিত রায় দিলেন যে "সেক্রেটারী অফ স্টেটের" এমন জামানত নামা দিবার ক্ষমতা না থাকায় সে জামানত নামার কোনও মূল্যই নাই এবং পরে "সেক্রেটারী অফ স্টেটের দায়িত্ব" অনায়াসে অস্বীকার করিতে পারেন এবং একাধিকস্থলে করিয়াছেন। এ ব্যাপার লইয়া গভর্ণমেণ্টের এতটা জিদ প্রকাশ পাইয়াছিল যে স্যার আশুতোষের পক্ষে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে প্রভূত পরিমাণে সাহসের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু স্যার আশুতোষ এমন একটা আধটা নয় বহু মোকদ্দমায় এমনি স্বাধীনচিত্ত ও নির্ভয়ের পরিচয় দিয়াছেন।

হাইকোর্টের গৌরব স্যার আশুতোষের কাছে বড় মূল্যবান ছিল। কতদিন তাঁর কাছে কলিকাতা হাইকোর্টের পুরাতন tradition এর কথা শুনিয়াছি। বলিতে বলিতে তিনি উৎসাহিত হইয়া উঠিতেন। তাঁর চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। প্রবল উত্তেজনার সহিত হাইকোর্টের বিচারক ও ব্যবহারজীবীদের

ন্যায়নিষ্ঠা, নিরপেক্ষতা ও নির্ভীকতার গল্প করিয়া যাইতেন। শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া যাইতাম। স্যার আশুতোষের ভিতর এই হাইকোর্টের পূর্ব গৌরব অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য একটা প্রবল আকাঙ্খা ছিল। এবং কোনদিনই তিনি নিজে সে গৌরব ক্ষুন্ন হইতে দেন নাই। যাঁহারা তাঁহার কাছে যাইত তাঁহাদিগের ভিতর তিনি সেই সব কথা বলিয়া সেই সব আদর্শ জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন এবং যেখানে অপর কেহ গৌরব ক্ষুন্ন করিতে চেষ্টা করিত সেখানে তিনি সিংহবিক্রমে সে চেষ্টার প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিতেন। স্যার আশুতোষ ছিলেন হাইকোর্টের সেই অতীত গৌরবের যুগের একটি শেষ নিদর্শন—তাঁর হাতে বাহিত হইয়া সে ধ্বজা বর্ত্তমান যুগের বিচারক ও ব্যবহারজীবীদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। জগদীশ্বর করুন যে বর্ত্তমানকালে যাঁহাদের উপর সে ধ্বজা বহন করিবার ভার তাঁহারা তাহার গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়া যেন ভবিষ্যৎবংশীয়দের হাতে দিয়া যান।

(৫)

স্যার আশুতোষের চরিত্রের সম্বন্ধে সাধারণভাবে সামান্য দুই একটি কথা বলিয়া আমি আমার বক্তব্য সমাপ্ত করিব। অনেকের তাঁহাকে আমার চেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তাঁহারা হয়তো তাঁহাকে আমার চেয়ে অনেক ভাল করিয়া জানেন। কিন্তু হয়তো আমি এক হিসাবে তাঁদের চেয়ে সৌভাগ্যবান। আমি তাঁহাকে যতটুকু ঘনিষ্টভাবে জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম তাহাতে তাঁহার চরিত্রের গৌরবের দিকটাই আমার কাছে খুব বেশী রকম ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁর

দোষের দিক আমার কাছে কোনদিনই প্রকাশ পাইবার সুযোগ হয় নাই। মানুষ মাত্রেরই দোষ গুণ থাকে। কিন্তু যাঁরা বড়লোক তাঁদের দোষের দিক যারা জানে তাদের চেয়ে যারা কেবল তাঁর গুণের দিকটাই দেখিতে পাইয়াছে তারা অনেক বেশী সৌভাগ্যবান। কেননা তারাই লোকটির ভিতর যেটুকু বড়-তার সন্ধান পাইয়াছে।

আমার কাছে স্যার আশুতোষের চরিত্রের যে দিকটা সবচেয়ে বেশী উজ্জ্বল ও সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল সেটা তাঁর উচ্চ আদর্শানুরুক্তি, তাঁর Idealism. তিনি যাহা করিতেন তাহাকে খুব বড় করিয়া, খুব একটা উচ্চ আদর্শের আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া দেখিতেন। শিক্ষার সম্বন্ধে তাঁর আদর্শ যে কত উচ্চ ছিল তাহা তাঁর সঙ্গে যে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছে সেই জানে। বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে তাঁর দারুণ অতৃপ্তি ছিল। পৃথিবীর নানা দেশে শিক্ষার যে সব নূতন নূতন প্রণালী ও আয়োজন হইয়াছে সে সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল এবং অন্য সকল দেশ শিক্ষায় যতটা উন্নতিলাভ করিয়াছে বাংলাদেশও ঠিক সেই পরিমাণে উন্নতিলাভ করিয়া বিশ্বের অগ্রসর জাতিদের সঙ্গে সমকক্ষতা লাভ করুক এ বিষয়ে তাঁর বরাববই একটা তীব্র আকাঙ্খা ছিল। এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তিনি অগ্রসর হইয়াছিলেন। আর তাঁর কৃতকার্য্যের ফলে যদিও বাংলার শিক্ষাপদ্ধতি অনেকটা উন্নত হইয়াছিল, তবু তিনি সেই উন্নতিতে তৃপ্ত হইয়া কোনও-দিনই বসিয়া থাকিতেন না। তাঁর আদর্শের তুলনায় এ উন্নতি যে কত ছোট তাঁর মনের ভিতর যে কত উচ্চ বিচিত্র কল্পনা নিরন্তর জাগ্রত থাকিত তার তুলনায় যে এ উন্নতি কত নগন্য সে কথা তাঁর চেয়ে বেশী কেহই বুঝিত না। তিনি সর্বদা অতৃপ্ত

থাকিতেন আর সর্বদাই নূতন নূতন অভ্যুদয়ের উপায় উদ্ভাবনে যত্নশীল হইতেন।

কিন্তু তাঁর আদর্শবাদের এই বিশেষত্ব ছিল যে ইহাতে কোনও দিন তাঁর কর্মজীবনের উপর এক ফোঁটা নৈরাশ্যের ছায়াপাত হইতে পারে নাই। স্যার আশুতোষ জ্ঞানী ছিলেন, ভাবুক ছিলেন, কিন্তু সবচেয়ে বেশী ছিলেন তিনি কর্ম্মী। তাঁর আদর্শ নিরন্তর তাঁহাকে কর্মে উৎসাহিত করিত। কাজ করিতে সে আদর্শ তাঁহাকে প্রেরণা দিত। আর দারুণ দুঃখ ও বিপদের ভিতরও এই আদর্শ-বাদ তাঁহার অন্তরকে আশায় ভরিয়া রাখিত। আমাদের দেশে এক হিসাবে শিক্ষায় আদর্শবাদীর অভাব নাই। সকলের মনেই অল্পবিস্তর একটা উন্নততর শিক্ষাপ্রণালীর আদর্শ সম্পর্কে অস্পষ্ট ভাব আছে বোধ হয়। কিন্তু খুব বেশীর ভাগ স্থলে ইহাদের আদর্শ কেবলমাত্র কর্মে নিরুৎসাহ সৃষ্টি করিয়া ইহাদিগকে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির সমালোচক মাত্রে পর্য্যবসিত করে। কর্মী আশুতোষ শিক্ষা পদ্ধতির দোষ আর কারও চেয়ে কম বুঝিতেন না, কিন্তু তিনি নিরর্থক নিন্দা বা সমালোচনায় তাঁর অতৃপ্তিকে পর্য্যবসিত হইতে দিতেন না। সেই দুর্লভ আদর্শ যে কোনও দিন আয়ত্ত করিতে পারিবেন না সে কথা চিন্তা করিয়া তিনি হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে প্রস্তুত ছিলেন না। যতটুকু সম্ভব যতটুকু তাঁর সাধ্য ততটুকু কাজ অন্ততঃ করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর ছিলেন। আর কি উপায়ে সেই সাধ্য ও শক্তি পরিবর্দ্ধিত করা যায় তার জন্য উপায় উদ্ভাবনে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁর এই তীব্র কর্মপ্রবণতা ও উদ্ভাবনী শক্তির ফল আজিকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

এই আদর্শ খুব প্রবল ভাবে অনুভব করা স্যার আশুতোষের

সহজ অভ্যাস ছিল। কোনও কোনও দার্শনিকের মতে প্রত্যেক ছোট ছোট জিনিষকে বিশ্বব্যাপী "সত্তার" অংশ বিশিষ্ট প্রকাশ-রূপে (sub-speciletuitatis). দেখিতে পারিলেই আধ্যাত্মিক অভ্যুদয় লাভ করিতে পারা যায়। তাতে ছোট ছোট জিনিষ বড় হইয়া উঠে। স্যার আশুতোষের জীবনে এ সত্যের পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁর হাতে সামান্য সামান্য কাজও বৃহৎ হইয়া উঠিত।

ওকালতি ব্যবসাটাকে তুচ্ছ করা একটা ফ্যাসান। আর বাহিরের লোকেরা যে পরিমাণে ইহাকে তুচ্ছ করে, উকীলেরা তার চেয়ে শতগুণ বেশী করে। এই তো সেদিন একজন প্রতিষ্ঠা-বান ব্যবহারজীবী হইয়াও মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ উকীল-দিগকে licensed free-booter বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। একদিন আমিও খুব ক্ষোভের সহিত আশুতোষের কাছে ঐ ব্যবসায়ের নিকৃষ্টতার কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। সেই দিন তাঁর একটা উচ্ছাস দেখিয়াছিলাম। তিনি উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষায় আমাকে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন তাহাতে আমি খুব স্পষ্টভাবে বুঝিয়া-ছিলাম যে ওকালতি ব্যবসায়কে তিনি কতটা বড় করিয়া দেখিয়া ছিলেন। আর দশজনের মত তিনি গতানুগতিক ভাবে ওকালতি করিতে যান নাই। ওকালতিকে তিনি একটা বড় ও মহৎ কাজ বলিয়া দেখিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি ইহা গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। ইহার ভিতর চরিত্র মাহাত্ম্য বিকাশের যথেষ্ট অবসর আছে বলিয়াই তিনি এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি পরিশেষে বলিয়াছিলেন যে আমরা আমাদের নিজেদের চরিত্রের দোষ ব্যবসায়ের ঘাড়ে চাপাই।—আসলে ব্যবসায়ের ভিতর কিছুই অগৌরবের নাই। অগৌরব হয় ব্যবসায়ীর চরিত্রগুণে।

এমনি সকল বিষয়েই স্যার আশুতোষ নিজের জীবনটাকে আদর্শের দ্বারা অণুপ্রাণিত ও নিয়মিত করিতেন। তাই তাঁর হাতে কোনও কাজই তুচ্ছ বা ছোট হইয়া যায় নাই।

উচ্চ আদর্শের সঙ্গে কর্মকুশলতা প্রায় একই সঙ্গে দেখা যায় না। কিন্তু স্যার আশুতোষের ভিতর উভয় গুণের অপূর্ব্ব সমাবেশ ছিল। বড় বড় কথা ভাবিতেন বলিয়া স্যার আশুতোষের কাণ্ডজ্ঞানের কখনই অভাব হয় নাই। বরং তাঁর মত কাজ হাসিল করিবার ক্ষমতা বাংলাদেশে আর কারও আছে কিনা জানি না। যখন তিনি একটা কাজ করিবেন স্থির করিতেন, তখন তিনি সে কাজ করিবার ছোট বড় নানা উপায় উদ্ভাবন কবিতে খুব পটু ছিলেন। যে সব বাধা দেখিয়া অন্য লোকে হয়তো হতাশ হইয়া কাজ ছাড়িয়া দিয়াছে সেখানে তিনি দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত বাধা অতিক্রম করিবার সংক্ষিপ্ত পন্থা আবিষ্কার কয়িয়া ফেলিতেন। তিনি যে পরিমাণে আদর্শময় ছিলেন ঠিক সেই পরিমাণেই তিনি কর্মকুশল ও ভয়ানক practical ছিলেন।

মহা শক্তিমান অপূর্ব কর্মকুশলতা সম্পন্ন আশুতোষ নিজের কাজে বাধা পাইলে—অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়া উঠিতেন। তিনি কখনো বিরোধ সহ্য করিতে পারিতেন না একথা অনেকে বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন, সে সব বিষয়ে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কিছুই নাই। কিন্তু আমার যে অভিজ্ঞতা আছে তাহাতে আমি ইহা দেখিয়াছি যে বিরোধে তিনি যতই বিরক্ত হউন, বিরুদ্ধ ব্যক্তির প্রতি তিনি অনুদার ছিলেন না। এক সময়ে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ Archbold সাহেবের সঙ্গে স্যার আশুতোষের গুরুতর বিরোধ উপস্থিত

হইয়াছিল। Archbold সাহেব দল বাধিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার আশুতোষকে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পর আমি ঢাকায় চাকুরী লইয়া যাই। তখন আমি তাঁহার কাছে Archbold সাহেবের সম্বন্ধে তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তখন এবং তারপরে একাধিকবার তিনি Archbold সাহেবের গুণের যে প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার অসীম ঔদার্য্যের পরিচায়ক। আমি স্বয়ং তাঁর কার্য্যের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়া বা তাঁর অনভিমতে কার্য্য করিয়া তাঁর বিরক্তভাজন হইয়াছিলাম। কিন্তু যখন যে তাঁকে আমার সম্বন্ধে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে তখন তিনি আমার সম্বন্ধে যে উদার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার জন্য আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

যখন Indian world পত্রিকা সাপ্তাহিক ভাবে প্রকাশিত হইত আমি তাহাতে নিয়মিতরূপে লিখিতাম। সে সময়ে স্যার আশুতোষের কতকগুলি কার্য্য অনেকে অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া বিবেচনা করিত, কিন্তু বাংলার কোনও কাগজে তাঁর এই সব কার্য্যের সমালোচনা ছাপিতে সাহস করিত না। সেই সময়ে Indian worldএ আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি কাজের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়াছিলাম, সে কথা সকলেই জানিত। তখন আমি University Law College এ চাকুরী করিতাম। ইহার পর ঐ পত্রিকায় স্যার আশুতোষের বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কার্য্যকলাপের একটা খুব তীব্র শ্লেষপূর্ণ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। সে প্রবন্ধ আমি লিখি নাই এবং তাহা সম্পূর্ণ আমার মত বিরুদ্ধ ছিল। এই প্রবন্ধগুলি স্যার আশুতোষের বিশেষ ক্ষোভের কারণ হইয়াছিল।

এই শেষোক্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর একদিন দ্বারভাঙ্গা সৌধের lift এ স্যার আশুতোষের সঙ্গে আমি এক সঙ্গে উঠিতেছিলাম। স্যার আশুতোষ গম্ভীরভাবে আমাকে বলিলেন "ওহে নরেশ তোমার বড় বদনাম।" আমি একটু চমকিত হইয়া বলিলাম "কেন"? তিনি বলিলেন, "লোকে বলছে তুমি Universityর নিমক খাও আর Universityর নিন্দা কর!" বলিয়া তিনি হাসিলেন। আমি বলিলাম "আপনি Indian worldএর Articleটার কথা বলছেন? এ প্রবন্ধ আমার লেখা নয়। ইহা আমার মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।" স্যার আশুতোষ বলিলেন, "যাই হোক, গাল দেও তাতে ক্ষতি নেই কিন্তু factsগুলো জেনে শুনে গাল দিও। সব ভুল কথার উপর গাল দিও না।" আমি বলিলাম, "আমি প্রকৃত ঘটনা জানি, তাতেই বুঝছেন যে আমার পক্ষে এ প্রবন্ধ লেখা একেবারে অসম্ভব।"

বস্ এইটুকু। যে প্রবন্ধ তিনি আমার লেখা বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ভাবে খুব তীব্র শ্লেষ ও নিন্দা ছিল। তাহা সত্ত্বেও তিনি আমাকে এই কথা বলা ছাড়া কোনওদিন কোনও তিরস্কার করেন নাই। অনিষ্টের চেষ্টাও করেন নাই।

তাঁর মতামতের বিরুদ্ধে আমি অনেক দিন অনেক কথা লিখিয়াছি কিন্তু তার জন্য তিনি মাঝে মাঝে বিদ্রূপ করা ছাড়া আমার প্রতি কোনও বিরুদ্ধ মত কোনওদিন প্রকাশ করেন নাই। অথচ আমি তাঁর কাছে যত সহৃদয়তা ও যত উপকার পাইয়াছি, জীবনে কোনও লোকের কাছে তত পাই নাই।

স্যার আশুতোষ সমস্ত বাংলাদেশকে কাঁদাইয়া গিয়াছেন, অনেককে নিরাশ্রয় নিরবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। সমগ্র দেশ

তাঁহার অভাবে আজ দরিদ্র। আমার ক্ষুদ্র ক্ষতি এ দারুণ শোক সাগরের পাশে উল্লেখের যোগ্য নয়। তবু তাঁর স্মৃতির আলোচনা করিতে গিয়া এ কথা আমি কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারিব না যে তাঁহাকে হারাইয়া আমি আমার নিজের জীবনের একটা প্রধান আশ্রয় হারাইয়াছি। উচ্চ আদর্শের অনুশীলনের উৎসাহের এক চিরন্তন উৎস হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। আশা ও উদ্দীপনায় এক নিত্য নির্ঝরের অভাব অনুভব করিতেছি। জীবনের একটা প্রকাণ্ড অংশ আমার শূন্য হইয়া গিয়াছে।

অনেক বড় লোকের সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে, কিন্তু কেবলমাত্র তুই ব্যক্তির কাছে আমার মাথা নিঃশেষরূপে নত হইয়া পরিয়াছে। এই তুইজনের কাছেই আমি যাহা পাইয়াছি তাহা আর কাহারও কাছে পাই নাই। সেই তুইজন—গোখলে ও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। গোখলে বহুদিন পূর্বে গিয়াছেন; স্যার আশুতোষও চলিয়া গেলেন। ভারতের মহত্বের এই তুইটি উচ্চ চূড়া একদিন ইহার আকাশ এক সঙ্গে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। সে চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—ভারতের গৌরব বাংলার গৌরব আর কবে সেই তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করিবে কে জানে?